ওহাবী আন্দোলন

আবদুল মওদুদ

www.icsbook.info

ওহাবী আন্দোলন

আবদুল মওদুদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সপ্তম মুদ্রণ | অক্টোবর ২০১১
আশ্বিন ১৪১৮

প্রচ্ছদ | কালাম মাহমুদ

বর্ণ বিন্যাস | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | বেলাল অফসেট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৭নং পি, কে, রায় লেন, (বাবুবাজার) ঢাকা-১১০০

মূল্য | **একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র**

WAHABI ANDOLON—by Abdul Moudud Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. 7th Edition : October 2011
Price : ***Tk. 150.00 only.***

ISBN 984-11-0431-5

বাল্যবন্ধু
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্-কে

ভূমিকা

Calcutta review নামাংকিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের C. C I ও C II সংখ্যায় 'Wahabis in India' শীর্ষক পর পর তিনটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ লেখক ইংরেজ, কিন্তু ইচ্ছা করেই নিজের নাম গোপন রেখেছেন 'Anonymous' ছদ্মনামের আবরণে। কিন্তু এই বেনামা-লেখক যিনিই হোন, ওহাবী, ফারাজী ও তিতুমীরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি সম্যক ওয়াকিফহাল এবং সরকারী নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহেও ছিল তাঁর অবাধ স্বাধীনতা। সম্ভবতঃ ভারতে ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে এটিই ছিল ইংরেজিতে লেখা সর্বপ্রথম তথ্যবহুল সুবিস্তৃত আলোচনা—যার দৃষ্টিভংগি ছিল সমকালীন শাসক সম্প্রদায় ইংরেজদের ও তাঁদের অনুগ্রহ-নির্ভর হিন্দুদের স্বার্থগন্ধী। এজন্যে প্রবন্ধগুলির আগাগোড়াই মুসলমান আজাদী যোদ্ধাদের কার্যকলাপ আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন কি ধর্মীয় বিশ্বাসকেও বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হয়েছে, স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে বিকৃত করা হয়েছে এবং সে সবের তীব্র নিন্দাও করা হয়েছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক উগ্র মুসলমান-বিদ্বেষী ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় একটি বৃহৎ মন্তব্য প্রকাশিত হয় ফারাজী, ওহাবী প্রভৃতি মুসলমান মজহাবগুলির আন্দোলনকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। সেগুলিকে বলা হয় বিপজ্জনক সংস্থা, এমনকি বর্বরতা ও ধর্মান্ধতাহেতু তৎকালীন ভারতের ও 'ন্যায়পরায়ণ' 'স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরেজ বাহাদুরের' প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। অতএব তাদের 'যদি আমাদের বুকের উপর শক্তি সঞ্চয় করতে দেওয়া হয় তাহলে রাষ্ট্রের সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। এজন্যে সরকারের উচিত হচ্ছে, ফারাজী ও ওহাবীদের সম্বন্ধে এবং আরও যেসব সম্প্রদায় ভারতের ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক উচ্চাশা পোষণ করে, সে সবের তন্নতন্নভাবে তদন্ত করা।' আলোচ্য তিনটি প্রবন্ধে উপস্থাপিত এই প্রশ্নগুলির জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বার্থগন্ধী দৃষ্টি দিয়ে। প্রথম প্রবন্ধটি ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত, দ্বিতীয়টিতে তিতুমীরের ভূমিকা ও সৈয়দ আহমদের পরবর্তী নেতাদের কার্যকলাপ এবং তৃতীয় প্রবন্ধে বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলীর উদ্যম, কর্মপ্রবাহ ও তাঁদের মৃত্যু এবং সিত্তানার ঘাটি ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত মুজাহিদদের কর্মময় জীবনের আলোচনা আছে।

বলা বাহুল্য, উইলিয়াম হান্টার সাহেব 'Indian Musalmans' বা 'ভারতীয় মুসলমান' নামক গ্রন্থ রচনাকালে এই প্রবন্ধগুলি থেকে প্রচুর তথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আর সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হতে হলে এগুলির ঐতিহাসিক তথ্যের মূল্যও অনেক বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও গবেষকদের নিকট প্রবন্ধগুলিও সহজলভ্য নয়। এজন্যে তাঁদের সুবিধার্থে প্রবন্ধগুলি বহু আয়াসে সংগ্রহ করে বাংলা তর্জমা প্রকাশ করা হলো। এতে যা কিছু মতামত ব্যক্ত রয়েছে, সবই প্রবন্ধ

লেখকের। নোটে আমার নিজস্ব মতামত (অ) উল্লেখে চিহ্নিত হয়েছে। পরিশিষ্টভাগে আমার লিখিত চারটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হলো। প্রথম প্রবন্ধে প্রামাণ্য তথ্যাদি থেকে 'ওহাবী'-চিহ্নিত আন্দোলনের প্রকৃত রূপরেখা চিত্রণের প্রয়াস করা হয়েছে এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, পাক-ভারতীয় আন্দোলনটিকে 'জেহাদী' আন্দোলন বলাই প্রশস্ত, কিন্তু কিছুতেই 'ওহাবী' নামাংকিত করা চলে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'জেহাদী' আন্দোলনের সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রথম নায়ক সৈয়দ আহমদ শহীদের তথ্যনির্ভর চরিত্র চিত্রণের প্রয়াস পেয়েছি এবং তাঁর স্বরূপটা পাঠক সমাজের নিকট তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তৃতীয় প্রবন্ধে বালাকোটের যুদ্ধের তথ্যনির্ভর ইতিহাস বিস্তৃতভাবে উন্মোচিত হয়েছে। চতুর্থ প্রবন্ধে 'আহমদউল্লাহ'র বিপ্লব ভূমিকাটি বর্ণিত হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁর মতো দায়িত্বশীল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও কিরূপ অসংকোচে 'জেহাদী' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জেহাদীদের বিচারকর্মের ধারাও এই প্রবন্ধ থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

এই গ্রন্থটিকে হান্টারের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থের সহগামী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এজন্যে পরিশিষ্টে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হলো এই উদ্দেশ্যে যে, পাঠক নিজেও তুলনামূলকভাবে হান্টারের ও তাঁর অনামা বন্ধুর মতামতগুলির সত্যতা বিচার করতে সক্ষম হবেন।

ঝিলিমিলি, ঢাকা
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

আবদুল মওদুদ

ওহাবী আন্দোলন

প্রথম প্রবন্ধ

[১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত]

কিছুকাল ধরে বাংলার মুসলমানরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার প্রবন্ধগুলো 'ইংলিশম্যান' নামক ইংরেজি পত্রিকায় ও 'দূরবীন' নামক ফারসী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। 'দূরবীন'ই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে কলিকাতায় প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা। আবার 'দূরবীনে' জওয়াব হিসেবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো 'পাইওনিয়ার' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মারফত ইউরোপীয় সাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসছে।

কিন্তু একদিকে 'ইংলিশম্যান' ও মুসলমান পত্রিকাগুলো সরকারকে যেমন চাপ দিচ্ছে মুসলমানদের বর্তমান অবনত অবস্থার উন্নয়নের জন্যে ও দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজ-সরকারে তাদের ন্যায়সংগত অংশ দেওয়ার জন্যে, তেমনই অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ও এগিয়ে আসছে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে যে, মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর সুচিহ্নিত বিদ্রোহী লোক আছে; আর তারা সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের কতোখানি সহানুভূতি ভোগ করে আজও তা অজানা রয়ে গেছে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় (দুসরা আগষ্ট, ১৮৭০) এই রকম মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে :

"ফারাজী ও ওহাবী মজহাবগুলো নিজেরা বড়ো রকমের আন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তিশালী না হলেও (আমরা অবশ্য তাও বিশ্বাস করিনে) সদাপ্রস্তুত মূলকেন্দ্র হিসেবে ভয়ংকর প্রতিষ্ঠান, কারণ সেগুলোকে কেন্দ্র করে যতো সব অসন্তোষ, ঘৃণা ও উচ্চাশা পুঞ্জীভূত হয়। আর অনুকূল অবস্থায় সে সবকে এই বিশাল ও বিভিন্ন সম্প্রদায়সংকুল সাম্রাজ্যের হরেক রকম পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বীদের থেকে পৃথক করা শক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার যতোই পারদর্শী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হোক, ততোটা বুদ্ধিমান নয় বলেই এসবের সংখ্যাও খুবই বেড়ে গেছে। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, নানারকম নীরব চেষ্টায় তারা বিদেশীকে এদেশে ডেকে আনতে পারে, কিংবা তাদের আসার পথও সুগম করে দিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের উদ্বেগটা হয়তো বাড়াবাড়ি হতে পারে, কিন্তু আমরা কেমন করে ভুলবো যে, বাংলাদেশে উদ্ভূত হয়েও ফারাজী মজহাবের নাম শোনা যাচ্ছে এমন সব দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও, যেখানে তাদের দেখা পাওয়া মোটেই চিন্তা করা যায়নি; অথচ সে-সব রাজ্যেও তারা নিজেদের আওতায় ও প্রভাবে পতিত বাশিন্দাদের নিজেদের মতে দীক্ষিত করে নিচ্ছে। আর ওহাবীরা তো ছড়িয়ে আছে সারা ভারতময়; আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও হায়দরাবাদের মতো শক্তিশালী ও সদা উত্তপ্ত মুলসমান রাজ্যেও তাদের সংখ্যা খুবই বেশি। অথচ আমরা আজও জানিনে, তাদের সংখ্যা কতো, অবস্থাই বা কি, সম্ভাবনা কি, প্রভাবই বা কতোখানি এবং কারাই বা তাদের নেতা। বাংলাদেশে বিস্তর ফারাজী পল্লী আছে; কিন্তু তাদের সংখ্যা, সংগঠন, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আমরা ও সরকার আজও তিমিয়ে রয়ে গেছি। এতে দারুণ শৈথিল্যই প্রকাশ পায়। ওহাবীরা খুবই বিপজ্জনক সম্প্রদায় এবং সারা ইসলামিস্তানে বিস্তৃত, অথচ ফারাজী হলো স্থানীয় সম্প্রদায়। ওহাবী আন্দোলন জন্ম

নিয়েছিল ইসলামের উৎস-মূল আরব দেশে এবং বর্তমানে সমগ্র মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। ওহাবী প্রচার করা খৃষ্টান মিশনারীর মতোই অসংখ্য ও তেমনই স্বধর্মনিষ্ঠ, আবার তাদের শিক্ষাও জেসুটদের[1] মতোই বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন। অতএব জেসুটদের মতোই ওহাবীরা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে সক্ষম! বিরুদ্ধবাদী হলেও ওহাবীরা গোঁড়া মতবাদীদের চোখে কঠোর সংযমশীলতার জন্যে শ্রদ্ধার পাত্র এবং ওহাবীদের উগ্র ধর্মান্ধতার দরুন নিজেরা ধর্মীয় সব অনুশাসন পালনে অক্ষমতা-হেতু কিছুটা ধর্মীয় শিথিলতার জন্যেও যেন ওহাবীদের সম্মুখে লজ্জিত। জেসুটদের মতোই ওহাবীদের নিজস্ব সংগঠন আছে; তাদের প্রচারকদিগকেও রীতিমতো টাকা-পয়সা দেওয়া হয় এবং এ-সব টাকা-পয়সা আসে সংসারী লোকদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থসঞ্জাত সাধারণ মূলধন থেকে। ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকেরা একটা সুনির্দিষ্ট পথ ঠিক করে নিয়ে সাধারণ জনগণের সংগে মিশে নীরবে কাজ করে যায়; কেউ কেউ দৈনন্দিন বেচাকেনার কাজ করে, কেউবা কখন কাফেরদের আদালতে কেরানিগিরি কাজও করে। কিন্তু কখনও তারা নিজেদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য কিংবা রাজনৈতিক লক্ষ্য ভুলে না। তারা অলক্ষ্যে আরও সুচারুভাবে এসব উদ্দেশ্যে কাজ করে যায়, টাকা-পয়সার সাহায্য দিয়ে নতুন মতাবলম্বী সংগ্রহ করে এবং দূরের ও নিকটের সহকর্মীদের সংগে নিবিড় সংযোগ রেখে ভারতে কিংবা আরবেই হোক জেহাদ পরিচালনা করে। এই আন্দোলনটা নিঃসন্দেহে সবদিকে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, পৃথিবীতে ইসলামের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা আর এ উদ্দেশ্যে ইসলামের অনুসারীদের আদিম ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবিত করা। আমরা হয়তো এরকম কোনও কর্মসূচীর সম্ভাবনাও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারি। কিন্তু আমাদের কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় ইতিহাসের এই প্রধান ও দুঃখজনক শিক্ষা যে, কোনোও বিস্তৃত ও বড়ো বর্বরতার হাতে সভ্যতা চিরস্থায়ী হতে পারে না; আর তার চেয়ে বেশি না হলেও ধর্মান্ধতা হচ্ছে সমান বিপজ্জনক। আমাদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমান ধর্মের এই দুটিই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা আছে। বর্তমানে জগতের ভবিষ্যৎ প্রগতি বিষয়ে যদিও আমরা নিরাশ না হতে পারি, তাহলেও আমাদের এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, ওহাবী আন্দোলনকে যদি আমাদের বুকের উপর শক্তি সঞ্চয় করতে দেওয়া হয়, তাহলে উপযুক্ত সময়ে সীমান্তের ও বাহিরের বিরুদ্ধ শক্তিগুলির সংগে হাত মিলিয়ে সেটা রাষ্ট্রের সমূহ বিপদ ঘটাতে পারে। অতএব সরকারের উচিত কাজ হচ্ছে ফারাজী ও ওহাবীদের সম্বন্ধে এবং আরও যে-সব সম্প্রদায় ভারতের ভিতরে ও বাহিরে রাজনৈতিক উচ্চাশা পোষণ করে, সে সবের তন্নতন্নভাবে তদন্ত করা। কারণ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের বাঁধনেই রাজনৈতিক সম্বন্ধ গজায়, অথচ অন্যান্য জাতির মধ্যে গোত্রীয় সম্বন্ধ হলো বড়ো কথা। ফারাজী ও ওহাবীরা বাকী মুসলমানদের কতোখানি সহানুভূতি ভোগ করে, সঠিকভাবে বলা শক্ত। হয়তো তাদের কতকগুলি ধর্মীয় নীতি গোঁড়া মুসলমানদের খুবই

---

[1] ইগনেসাস লয়োলা কর্তৃক ১৫৩৪ সালে 'সোসাইটি-অব জেসাস' নামাংকিত ইউরোপে এই ধর্মীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহ, বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র করাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য—(অ)।

অপ্রীতিকর, কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে রয়েছে একই ধর্মীয় বন্ধন। তাছাড়া এই সম্প্রদায় দু'টির রাজনৈতিক লক্ষ্য তো সকল মুসলমানদের নিকট পরম আদরণীয়। আর মানুষ হিসেবে তারা সদ্য রাজ্যহারা হয়ে শোকান্বিত এবং একটা আক্রমণাত্মক ধর্মের অনুসারী হয়ে তারা খৃষ্টান, হিন্দু, ইহুদী ও বৌদ্ধ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে।" এখানে যে-সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে সে সবের আংশিক জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। তবে ওহাবী ও গোঁড়া সুন্নীদের মধ্যে যে-সব বিষয়ে পার্থক্য আছে, সে সবের খুঁটিনাটি আলোচনা যথাসম্ভব বাদ দেওয়া যাবে।

ভারতীয় মুসলমানদের দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায় : সুন্নী ও শিয়া। সুন্নীরা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাস করে সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে আর শিয়ারা একই ধর্মে বিশ্বাস করে জ্ঞানের তথা যুক্তির ভিত্তি-মূলে।

শিয়ারা আনন্দ পায় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় শোভাযাত্রা প্রভৃতি ধর্মীয় বাহ্যিক আড়ম্বর প্রদর্শনে। সুন্নীরা এ-সব আড়ম্বর-অনুষ্ঠানকে তাদের ধর্মের বিপরীত হিসেবেই মনে করে এবং ইসলামের আদিম সহজ সরল রূপেই চলতে চেষ্টা করে। শিয়ারা আরও গভীর বিশ্বাস করে যে, তীর্থপথে যাওয়ায় ও মৃত ওলী-দরবেশদের মাজার জিয়ারতে অশেষ পুণ্যলাভ হয়; অথচ সুন্নীরা কম বিশ্বাস করে যে, এরকম তীর্থযাত্রায় কোনও পুণ্য সঞ্চয় হয়, কিংবা ওলী-দরবেশদের মাজারে এভাবে ধন্না দিয়ে কোনও কিছু পার্থিব সুফল পাওয়া যায়। এই দুটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি আবার বহু মজহাবে বিভক্ত এবং প্রত্যেক মজহাবের আবার নীতিগত ও আচার-আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যও আছে। তবে সমস্ত শিয়া সম্প্রদায় সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মজহাবের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন, আবার সুন্নীরাও শিয়া সম্প্রদায়ের সব মজহাবকেই একই বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এরকম ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য হেতু বিদ্বেষ ভাবটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে তাদের পয়গম্বরের জামাতা আলীর সংগে অন্য প্রথম খলীফাদের রাজনৈতিক বিরোধটা স্মৃতিতে উদয় হলেই। আর তার অভিব্যক্তি হয় প্রায়ই প্রকাশ্য ঝগড়া-ফ্যাসাদে, অত্যাচার-উৎপীড়নে এবং দুই সম্প্রদায়ের বাহাসে বক্তৃতায়। ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষটা বেশি করে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পাটনা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও আরও যেসব জায়গায় শিয়া সংখ্যাবহুল, সে সবখানেই মুহররম মাসের প্রথম দশ দিন শিয়ারা খুবই জাঁকজমকের সংগে মুহররম উৎসব পালন করে। আর তখন শান্তিভংগ যাতে না হয়, তার জন্যে বড়ো ব্যস্ত থাকতে হয় সরকারকে।

মুসলমান ধর্মের মৌল ভিত্তি হচ্ছে, কুরআন, মুহম্মদের বাণী ইত্যাদি অর্থাৎ সুন্নী মুসলমান ধর্মতাত্ত্বিকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ইজমা এবং কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত মীমাংসা বা কিয়াস্।

মুহম্মদের জীবদ্দশায় কুরআন ছিল একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ, যার নির্দেশানুসারে সব রকম সমস্যার সমাধান হতো এবং প্রত্যেক নয়া সমস্যার জন্যে পূর্বে বিধান না থাকলে নয়া ওহী নাজেল হতো। আল্লাহ্র বাণী একমাত্র মুহম্মদের নিকট পৌঁছাতো, অতএব তাঁরই গোচরীভূত বিষয়সমূহের মধ্যেই ওহীর দ্বারা মীমাংসা পাওয়া যেতো। এই অসুবিধাটা প্রথম লক্ষ্য করা গেলো, যখন নিকটবর্তী গোত্রসমূহে নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য

দূত পাঠানো হতে লাগলো এবং তারাও একে একে নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা যখন বিভিন্ন দেশে শাসন বিস্তার করতে লাগলো তখন তাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার আরবদের থেকে পার্থক্যহেতু তাদের সংগে ব্যবহার সম্বন্ধে কুরআনের বিধানসমূহের ন্যূনতা আরও বেশী করেই দেখা দিলো। আর এজন্যে পয়গম্বরের বাণী ও কাজ-কর্ম ও এ-সব সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় দিশা হয়ে উঠলো।

পয়গম্বরের বাণী ও কাজের সংগ্রহ-কর্ম দ্বিতীয় শতকের পূর্বে শুরু হয়নি। আর এ কর্ম চলেছিলো তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলাকালে। সংগ্রহকারীরা ছিলেন নিঃসন্দেহে সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং সুন্নার বিশুদ্ধতা নিরূপণকালে তাঁরা কথকের চরিত্র দ্বারা ও নিজের ঐশী প্রেরণা দ্বারা চালিত হতেন। কোনো হাদীসের সত্যাসত্য নিরুপণের জন্যে গোপন সাক্ষ্য কখনও গৃহীত হতো না এবং সমকালীন লোকদের নিকট এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণও অধর্মের কাজ না হলেও প্রগল্‌ভতা হিসেবে বিবেচিত হতো। ধর্মভীরু লোকদের কথিত প্রত্যেক হাদীসই খাঁটি হিসেবে গৃহীত হতো, তা যতই অসম্ভব হোক না। আবার যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দুর্বল, তাদের কথিত সব হাদীসই পরিত্যক্ত হতো। কিন্তু এটা যাচাই করে দেখা হতো না, হাদীসটির কতোটুকু মুহম্মদের নিজস্ব আর কতোটুকু বা কথকের অসাবধানতাকৃত সংযোগ; কিংবা এটাও অনুসন্ধান করে দেখা হতো না যে, প্রত্যেক হাদীসের উৎপত্তির সময় ও পরবর্তীকালের বর্ণনাকারীদের সময়ের মধ্যে অবস্থার সামঞ্জস্য কি রয়েছে।

এরকম মুখে মুখে প্রচারিত পুঞ্জীকৃত হাদীস থেকে যা আশা করা উচিত, সেই রকমই রচিত কাহিনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে, অথচ সেগুলি খাঁটি হিসেবে স্বীকৃত হলেও অনেকস্থলে পরিষ্কারভাবে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু এ-সব অসংগতি ও অনৈক্য সত্ত্বেও তাদের সত্যতা নিয়ে কোনও সন্দেহ হওয়া দূরে থাক, ইসলামে বিশ্বাসীদের দৃঢ়তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এ-সব অনৈক্যকে ধরা হয় মুহম্মদের সুদূরপ্রসারী জ্ঞান; কারণ তিনি নিজের অনুসারীদের মুক্তির জন্যে শুধু একটিমাত্র সংকীর্ণ পথ খোলা রাখেননি। আর পরিষ্কার পরস্পর-বিরোধীগুলোকে বলা হতো—এসব হচ্ছে ইসলামের প্রথম অবস্থার নিয়ম, কিন্তু পরে মুহম্মদ কর্তৃক সংশোধিত কিংবা নাকচ করা রূপ। এজন্যেই দেখা যায়, মুহম্মদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নামাজ পড়ছেন। কখনও একবার মাত্র তিনি কান পর্যন্ত হাত উঠিয়েছেন, কখনও উঠিয়েছেন একাধিক বার। কখনও তিনি নামাজ শুরু করেছেন জোরে 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করে, আবার অন্য সময় বলেছেন মনে মনে। তাঁর সাহাবারা তাঁকে অনুকরণ করবার আগ্রহে তাঁকে যেভাবেই নামাজ পড়তে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই নামাজ আদায় করে গেছেন, আর তার দরুন পরবর্তীকালের জন্যেও রেখে গেছেন অনৈক্য।

হিজরীর প্রথম শতকের শেষ ভাগ থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চারজন মশহুর মুসলমানী আইনের ব্যাখ্যাতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকটি হাদীসের সভ্যতার মান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামের এক-একটি মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রথম—আবু হানিফা : তাঁর জন্ম ৮০ হিজরীতে ও মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। তিনি হানাফী মজহাবের স্রষ্টা, আর ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সমস্তই হচ্ছে এ মজহাবের অন্তর্ভুক্ত[২]।

দ্বিতীয়—আবু আবদুল্লাহ্ শাফী : প্রায় ১৫০ হিজরীতে তাঁর জন্ম ও ২০৪ হিজরীতে মৃত্যু। তিনি শাফী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

তৃতীয়—মালিক : ৯৫ হিজরীতে তাঁর জন্ম ও ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যু। তাঁর অনুসারীরা 'মালিকী' নামে কথিত।

চতুর্থ—ইব্‌নে হাম্‌বল : ১৪৪ হিজরীতে তাঁর জন্ম ও ২৪১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু। তিনি 'হাম্‌বলী' মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। আরবে এই মজহাবীদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

এই চার মজহাবের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং স্বধর্মের আইন-কানুন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল সুগভীর। প্রত্যেকেই প্রচুর গবেষণা করে মত নির্ধারণ করেন যে, আইনের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাখ্যার দরকার এবং কতকগুলি হাদীস অন্যগুলির চেয়ে জোরালো, আর এজন্যেই তাঁরা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে মত প্রচার করে গেছেন। তার ফলাফল এই হয়েছে যে, বহু তুচ্ছ ও বহু দরকারী বিষয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে আবু হানিফা মত প্রচার করেছেন : হাদীসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, নামাজে প্রথমে চুপে চুপে 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করা উচিত, নামাজের প্রথমে হাত দুটি কান পর্যন্ত উঠানো উচিত এবং নামাজ পড়াকালে হাত দুটি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা উচিত। অন্য দিকে শাফী বলেছেন : 'বিস্‌মিল্লাহ্' জোরে উচ্চারণ করতে হবে নামাজের কালে মাঝে মাঝে হাত দুখানা কান পর্যন্ত উঠাতে হবে এবং নামাজ পড়ার সময় হাত দুটি বুকের উপর জড়ানো থাকবে। আবার আবু হানিফা বলেন যে, কোনও মানুষ নিরুদ্দেশ হলে নব্বই বছর গত না হলে তাকে মৃত ধরা যাবে না এবং এই সময়ের মধ্যে তার স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ নাজায়েজ হবে; অন্য দিকে মালিকী মজহাবের মতানুসারীর পক্ষে মাত্র চার বছর পরেই দ্বিতীয় বিবাহ জায়েজ হবে।[৩]

সুন্নী সম্প্রদায়ের এই চারটি মজহাবকে পৃথক ধর্মমত ধরা সংগত হবে না, সেগুলি বরং খাঁটি মুসলমান ধর্মের চারটি শাখা মাত্র। প্রত্যেক মজহাবপন্থীরা তাদের প্রতিষ্ঠাতার বিধিবিধান ও আচার-অনুষ্ঠান অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য এবং আরও বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, এ-সব পালনেই তা নাজাত বা মুক্তিলাভ সম্ভব। প্রত্যেক মজহাবেরই আইন-কানুন তার জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক মজহাব থেকে অন্য মজহাবে পরিবর্তন প্রায় হয় না, আর যদিই বা হয়, তাহলে সেটা নিন্দার চোখে দেখা হয়। এই পুনর্দীক্ষাও খুবই বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আর তাও হয় যখন তাদের মধ্যে খুবই কম পার্থক্য দেখা যায়।

---

[২] এসব বিশেষভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো যে, পরে দেখানো যাবে, ওহাবীরা হানাফী মজহাব থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। (আবু হানিফা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার লিখিত 'মুসলিম মনীষা,' পৃঃ ১—৪ দেখুন—অ)

[৩] ১৯৩৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে কোনও মুসলিম বিবাহিতা নারী ৪ বছর স্বামীর সন্ধান না পেলে আদালতে তালাকের ডিক্রী পাওয়ার হকদার—(অ)।

এসব থেকে স্বতই লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত যুক্তি-বিচারের স্বাধীনতা নেই। তারা অবশ্যই কুরআন বা হাদীস গ্রন্থ পড়বে, কিন্তু তার বেশি তারা অগ্রসর হতে পারে না, কিংবা আপন মজহাবের মত বিরোধী কোনও স্বাধীন ব্যাখ্যা গ্রহণের অধিকার নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, মজহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এই অধিকার ভোগ করেছেন এবং এ জন্যে পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা তার শিক্ষা মেনে চলেন নি। অথচ কার্যত মুসলমান জনসাধারণ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করতে পারবে না এবং চার ইমামে কোনও একজনের মতাবলম্বী হতে বাধ্য।[৪] আমরা পরে দেখাবো যে, ওহাবীরা এটাকেই অন্য সব বিষয়ের মতো প্রথমেই অস্বীকার করেছিলো।

'ওহ্হাবী শব্দে প্রথমে যথার্থভাবে একদল আরব মুসলমানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর শব্দটার উৎপত্তি হচ্ছে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম শেখ আবদুল ওহাব থেকে।[৫] তিনি গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরব দেশের নজদ্ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বসরার মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে ভ্রাম্যমাণ সওদাগর হিসেবে দামশ্ক্, পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী মশহুর শহরগুলোতে এবং পারস্যেও সফর করেন। বহু বছর সফরের পর তিনি আরবে প্রত্যাগমন করেন এবং নিজ প্রদেশের রাজধানী দারিয়ায় বসবাস কায়েম করেন। সেখানে তিনি সংস্কার কাজ শুরু করেন এবং নিজের বিশেষ মতবাদও প্রচার করতে থাকেন। তিনি শিক্ষা দেন যে, মুসলমানদের উচিত হযরতের জীবদ্দশায় ও তাঁর পরের খেলাফতের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, তারই অনুসারী হওয়া; প্রত্যেক মুসলমানের উচিত একমাত্র আল্লাহ্র উপর এবং তাঁরই উপর অকুণ্ঠ নির্ভর করা, হযরত মুহম্মদ কিংবা কোনও ওলী-দরবেশের মর্যাদা অযথা এভাবে বাড়িয়ে না তোলা, যাতে আল্লাহ্র মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়; হযরতের পর থেকে যে-সব অনুষ্ঠান, উৎসব ও নিয়ম উদ্ভূত হয়েছে যে-সব একেবারে পরিহার করা এবং সর্বোপরি ইসলামের শৈশাবস্থায় ইসলাম যেমন তরবারির মুখে প্রচারিত হয়েছিল, তেমনইভাবে ইসলাম জারী করা।[৬]

---

৪. এই অনুসরণ করাকে বলে 'তকলিদ করনা' (অনুকরণ কর)। আর অনুসারীকে বলে 'মুকাল্লাদ' (অনুকারী) আর যারা মুকাল্লেদ তারা 'পথভ্রষ্টদের অর্থাৎ যারা চার ইমামের কারও অনুসারী নয় তাদের আখ্যা দেয় 'গয়ের মুকাল্লদ,' যেমন—ওহাবীরা। এ কথায় সন্দেহ নেই যে, বহু হাদীস জাল করা হয়েছে। বুখারী সাহেব ষাট হাজার হাদীস সংগ্রহ করেন, কিন্তু মাত্র চার হাজারকে খাঁটি হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন। আবু দাউদও কতকটা এই মত পোষণ করতেন।

'তকলিদ' অর্থে বুঝায় অনুসরণ করা আর বিশেষ অর্থে বুঝায় কুরআন ও হাদীস 'মুকাল্লাদ' অর্থে বুঝায়, কুরআন ও হাদীস ছাড়াও চার ইমামের কারও ইজমা ও কিয়াস্কে ইসলামের মৌলভিত্তি মানা। 'মুকাল্লাদ' অর্থে বুঝায়, কুরআন ও হাসীসে যেখানে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই, সেখানে কোনও ইমামের ইজমা ও কিয়াস্কে ইসলামের মৌলভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস করা। 'গয়ের মুকাল্লদ' অর্থে যে ইজমা ও কিয়াস্কে ইসলামের মৌলভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস করে না এবং কেবল কুরআন ও হাদীসকেই মেনে চলে—(অ)।

৫. ১১১৫-১২০১ হিজরী—১৭০৭—১৭৮৭ খৃঃ (অ)।

৬. এ মতটি সর্বৈব মিথ্যা। ইসলাম শৈশবে বা কোনও অবস্থায় তরবারিমুখে প্রচারিত হয়নি। আর এরকম কোন শিক্ষা বা কর্মসূচী আবদুল ওহ্হাবেরও ছিল না—(অ)।

তাঁর শিক্ষা দারিয়ার সরদার শেখ মুহম্মদ ইব্‌ন সউদ গ্রহণ করেন এবং তাঁর মুরীদ হন। তাঁর কন্যাকেও ইব্‌ন সউদ শাদী করেন। গত শতকের মধ্যভাগে আবদুল ওহ্‌হাবের মৃত্যু হয়।[৭] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহম্মদ ইব্‌নে সউদের মুরুব্বিয়ানায় মধ্য আরবের শাসক হয়ে ওঠেন। তারপর ওহ্‌াবী রাজ্য বহু ভাগ্য-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু আমাদের বর্তমান আরোচনার পক্ষে সেসবের কোন প্রয়োজন নেই।

দেখা যায় যে, বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে ওহ্‌াবী মতবাদ আরব প্রত্যাগত বহু হাজীর দ্বারা ভারতে আমদানী করা হয়েছে। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ফরিদপুরের বাশিন্দা ও মশহুর দুদু মিয়ার পিতা হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌ কর্তৃক এই ধরনের মতবাদ নিম্নবংগে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর অনুসারীদের বলা হয় ফারাজী। নানা কারণে ভারতে ফারাজীদের প্রভাব যৎসামান্যই। কিন্তু শরীয়তউল্লাহ্‌র শিক্ষার ফল এই দাঁড়ায় যে, লোকে হিন্দুস্থানের বাশিন্দা সৈয়দ আহমদের মতবাদ গ্রহণ করবার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। এসব মতবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতো বেশি যে, এখানে সেসবের বিস্তৃত আলোচনার দরকার আছে।

সৈয়দ আহমদের জন্ম হয় ১২০১ হিজরীর মুহররম মাসে, আউধের রায়বেরেলীতে। তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা যায়। তবে মনে হয়, ছেলেবেলাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন ও আমীর খান পিণ্ডারীর ফৌজে প্রবেশ করেন। এই আমীর খান পরবর্তীকালে টংকের নওয়াব হন। ফৌজে সৈয়দ আহমদের পদবী কি ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে তাঁর অনুগামীদের এ সম্বন্ধে মৌনভাব দেখে মনে হয়, তিনি কোনও নামকরা দায়িত্বভার পাননি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে[৮] আমীর খানের ফৌজ ভেঙে দেওয়া হলে পর সৈয়দ আহমদ দিল্লীতে গমন করেন এবং মশহুর শাহ্‌ আবদুল আজীজের মুরীদ হন।

এই সময়ে শাহ্‌ আবদুল আজীজ হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠতম আলেম হিসেবে গণ্য হতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি হিন্দুস্থানের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিলো।

এবং আরবের পণ্ডিত সম্রাজ তাঁকে 'শামসুল হিন্দ' খেতাব দান করেন। ভারতীয় মুসলমানদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। শরীয়তের জটিল প্রশ্নে তাঁর ফতোয়া আজও অভ্রান্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়। আর তাঁর নাম যে কোনও দলের শক্তিস্তম্ভ হিসেবে গণ্য হওয়ার দরুন ওহ্‌াবীরা ও হানাফীরা তাঁকে নিজ নিজ মজহাবের সমর্থনকারী হিসেবে নিজেদের দলে টানাটানি করে থাকে। প্রত্যেক মজহাবই নিজের সুবিধার জন্যে তাঁর ফতোয়া স্বপক্ষে উদ্ধৃত করে থাকে। তবে মনে হয়, তিনি মোটের উপর কোনো দলেরই চরম মতানুসারী ছিলেন না এবং অনেকটা উদার সনাতন পন্থী (যদি এমন কথা বলা চলে) ছিলেন। তিনি ছিলেন মুকাল্লদ, আর এজন্যে চার ইমামের মর্যাদা সর্বদাই রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন।

---

[৭] এ উক্তিও ভুল। আবদুল ওহ্‌হাব ১২০১ হিজরী—১৭৮৭ খৃঃ জান্নাতবাসী হন—(অ)।

[৮] সঠিক সময় নির্ণয় করা দুষ্কর। সৈয়দ আহমদের বাণীসমূহ যে 'সিরাতুল মুস্তাকিমে সংগৃহীত হয়, তার কিয়দংশ লেখা হয় ১২৩৩ হিজরী অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। অতএব নিশ্চয়ই তিনি ইমাম হিসেবে ইতিমধ্যে কিছুটা প্রসিদ্ধি অর্জন করে থাকবেন।

আরবের ওহাবী আন্দোলন ও তার মতবাদ তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। আর হয়তো সে সবের প্রভাবে তিনিও স্বীকার করতেন যে, তাঁর সুন্নী সম্প্রদায়ের কিছুটা সংস্কার দরকার। তাঁর চেষ্টাও ছিল যে, শিয়া ও হিন্দুদের সংশ্রবে থাকার দরুন যে-সব রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সুন্নীদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেসবের রদ-রহিত হওয়া উচিত। কিন্তু তার বেশি দূর সংস্কার তিনি চাননি এবং তাঁর শেষ জীবনের দিকে সৈয়দ আহমদের মতামত যখন খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিলো, তখন তিনি সেসবের অস্বীকার করেন; আর তাঁর যে-সব আত্মীয় এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলো, তাদের বঞ্চিত করে তিনি এক অনাত্মীয়কে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যান। সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি ইংরেজ সরকারের প্রতি উদার মতই পোষণ করতেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষা করার ও নয়া বিজেতাদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করার উপযোগিতা স্বীকার করতেন। বর্তমানকালের বহু মুসলমানের মনোভাব বিবেচনা করলে তাঁর এ-সব মতবাদ নিশ্চয়ই প্রগতিমূলক ছিল।[৯]

সৈয়দ আহমদ কয়েক বছর দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং শাহ্ আবদুল আজীজের পরিবারে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তাঁর সবচেয়ে অন্তরংগ হয়ে ওঠেন শাহ্ আবদুল আজীজের ভাইপো মওলবী মুহম্মদ ইসমাইল ও তাঁর জামাতা মওলবী আবদুল হাই। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন মশহুর আলেম এবং সৈয়দ আহমদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত মুরীদ এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সহচর ছিলেন।[১০]

এই দুই মহাপণ্ডিতের মধ্যে মুহম্মদ ইসমাইল 'সিরাতুল মুসতাকীম' রচনা করেন ১২৩৩ হিজরীতে (১৮১৮ খৃঃ)। এখানি ভারতীয় মুসলমানদের নিকট কুরআনের মতোই শ্রদ্ধার বস্তু। তাতে দেখা যায় যে, সৈয়দ আহমদ যেন স্বপ্নাদেশ পেয়ে মুরশিদের স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং নিজের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মুরীদ করতে থাকেন। মওলবী আবদুল হাই ও মওলবী মুহম্মদ ইসমাইল হন তাঁর প্রথম মুরীদ। তাঁদের প্রভাবে ও ব্যক্তিত্বে অন্য বহু লোক সৈয়দ আহমদের মুরীদ হয়ে যায় এবং তিনি একজন ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। বহু মশহুর আলিম তাঁর খাদিম হয়ে তাঁকে অসম্ভব সম্মান দেখাতে থাকেন এবং তাঁরই শিক্ষার বরখেলাপ হলেও[১১] কখনও তাঁরা তাঁর পালকি বহন করতেন, আবার কখনও বা তাঁর পালকির দু'পাশে খালি পায়ে ছুটাছুটি করতেন। তাঁরা তাঁকে সম্বোধন করতেন 'আমীরুল মুমেনিন', 'ইমাম হানাফী' 'ইমাম মেহেদী' বলে এবং প্রচার করতেন যে, তিনি ইমাম ও পয়গম্বরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। ১২৩৫ হিজরীতে (১৮২০ খৃঃ) তিনি মওলবী আবদুল হাই ও মওলবী মুহম্মদ

---

[৯] শাহ্ আবদুল আজীজের বিস্তৃত জীবনী ও এই দুটি বিষয়ে তাঁর ফতোয়া উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখুন, অক্টোবর সংখ্যার মাহে-না, ১৯৬১—(অ)।

[১০] আব্দুল হাই ছিলেন মুকাল্লদ হানাফী। তিনি চাচা শাহ্ আবদুল আজীজের স্বীকৃত গণ্ডির মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার সাধনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু মুহম্মদ ইসমাইল ছিলেন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম আলেম; আর তিনি আমূল ধর্মীয় সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী। ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের ব্যাখ্যার অধিকারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং মাঝামাঝি পন্থার অনুসারী হিসেবে হানাফী ও শাফেয়ী উভয় মতবাদে আংশিক বিশ্বাস করতেন। শেষ জীবনে তিনি ঔদ্ধত্যের জন্যে অনুতাপ করেন ও গোঁড়াভাবে হানাফী মজহাবের অনুসারী হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সৈয়দ আহমদের শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ জন্মেছিল এবং অবস্থা তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। মুহম্মদ ইসমাইলের বিখ্যাত পুস্তক 'সিরাতুল মুসতাকীম' হচ্ছে ভারতীয় ওহাবীদের কুরআনের সমতুল।

[১১] ওহাবী মতে কাউকে অযথা সম্মান প্রদর্শন অপরাধ, কারণ সকলেই ভাই ভাই।

ইসমাইলকে সংগে নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেন এবং সারা ভারতে সফর করতে বের হয়ে পড়েন ধর্মীয় সংস্কার আনয়নের জন্যে এবং শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধ ঘোষণা করতে উত্তেজিত করার জন্যে। কারণ, শিখরা তখন পাঞ্জাবের মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করতো এবং স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম পালনে বাধা দিতো। বিশেষ করে শিখরা আজান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো, আর এটাই ছিল মুসলমানদের বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সপক্ষে উপযুক্ত কারণ। তিনি প্রথমে গমন করেন সাহারানপুরে, সেখান থেকে যান রামপুরে ও বহু পাঠানের সরদার ফয়জুল্লাহ খানের সংগে কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি কলিকাতার পথে রওয়ানা হন গোরখপুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়ে এবং পথে বহু মুরীদকে দীক্ষা দান করেন।

তিনি পাটনায় হাজির হন এক বিশাল নৌবহর ও পাঁচশো লোকের উপর উৎসাহী মুরীদানকে সংগে নিয়ে এবং এখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন। তিনি প্রথমে থাকেন মীর আশরাফের মাজারে এবং পরে থাকেন মাদ্দপা মসজিদে। সাদিকপুরের মওলবী বেলায়েত আলী, মওলবী ইনায়েত আলী, মওলবী ফরহাত হোসেন, মওলবী ইলাহী বখশ ও তাঁর পুত্র মওলবী আহমদ উল্লাহ[১২] তাঁর মুরীদ হন। পাটনার বহু বাশিন্দাও তাঁর শিষ্য হয়ে যায়। অতঃপর তিনি কলিকাতা রওয়ানা হন। কিন্তু তার পূর্বে তিনি শাহ মুহম্মদ হোসেন, বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলীকে পাটনায় তাঁর খলিফা নিযুক্ত করে যান এবং তাঁর হয়ে মুরীদ করতে ও শিখদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত জেহাদের জন্যে রসদ সংগ্রহ করতেও ভার দিয়ে যান। পাটনা থেকে তিনি কলিকাতায় নৌবহর নিয়ে সফর করেন এবং গংগা নদীর দু'পাশের বহু জায়গায় তাঁর মত প্রচার করতে করতে যান। কলিকাতায় তিনি হাজির হন ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এবং এখানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেন। কলিকাতা ও বারাসতের বাসিন্দারা দলে দলে তাঁর নিকট জমায়েত হতে থাকে। তাদের মধ্যে তিতুমীরও তাঁর মুরিদ হন।[১৩] এই তিতুমীর পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বারাসতে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিলেন। এই সময়ে সৈয়দ আহমদ অসংখ্য অনুগামী ও জাকাত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর বিশেষ শিক্ষা—আদিম ও সহজ সরল ইসলামে আমদানীকৃত সব রকম বেদাত বর্জন করতে হবে এবং এ শিক্ষাটি মুসলমানদের মনে দৃঢ়মুল হয়ে যায়। এবং যে-সব টাকা-পয়সা পূর্বে উৎসবে ব্যয়িত হতো, এখন থেকে সে-সব একটি মাত্র খাতে—শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে সঞ্চিত হতে লাগলো।

১৮২২ সালের প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ বহু মুরীদ নিয়ে মক্কায় গমন করেন এবং তথায় হজ পালন করে মদীনায় উপস্থিত হন। এখানে তুর্কী কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধতা করে এবং তাঁর মতবাদীরা যে-সব মতবাদ প্রচার করতো, সেসব সহ্য করতেও অস্বীকার করে। তারা পূর্বেই আরবের ওহাবীদের নিকট বহু নির্যাতন সহ্য করেছিলো। এখন যে-সব মওলবী ধর্মীয় সংস্কারের কথা প্রচার করতেন, অনেকেই আটক হয়ে পড়েন।

---

[১২] আহমদউল্লাহ্ পরবর্তীকালে রাজদ্রোহের জন্যে দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। তিনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত জীবনী আমার প্রবন্ধ বিদ্রোহী আহমদউল্লাহ', মাহে-না, বিপ্লব-সংখ্যা, ১৯৫৭ দেখুন। পরিশিষ্ট ঘ-তে পুনর্মুদ্রিত—অ।

[১৩] এ কথা ঠিক নয়। তিতুমীরের সাথে তাঁর মক্কায় সাক্ষাৎ হয়—অ।

১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসে সৈয়দ আহমদ কলিকাতায় ফিরে আসেন। পথে বোম্বাই-এ তিনি কয়েক দিন অবস্থান করেন ও বহু মুরীদ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি জন্মস্থান রায়বেরেলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পথে পাটনা ও গোয়ালিয়ারে অবস্থান করেন।

পাটনায় শাহ মুহম্মদ হোসেন এক বিশাল মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাঁর সংগে মিলিত হন। তাঁর খলিফাদের এক মজলিস হয় এবং বহু পূর্বে পরিকল্পিত কাজের জন্যে মানুষ ও টাকা-পয়সা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এটা মনে করা হয়েছিলো যে, সৈয়দ আহমদের ও তাঁর সহকর্মীদের এসব কার্যকলাপ হয়তো সরকারকে ভীতিগ্রস্ত করবে, অন্ততঃ সরকারের হস্তক্ষেপের দরকার হবে। এটা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে যে, কয়েক বছর পূর্বে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক যাজকতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা হলে সাধারণ্যে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং একটা নিষেধাজ্ঞামূলক দণ্ডবিষয়ক আইন প্রবর্তনের দরকার হয়েছিলো। অথচ তখন রোম ও-দেশে কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তি স্থাপনের ইচ্ছা করেনি, কিংবা ইংরেজ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের রাজভক্তিতে সন্দেহ হওয়ার এতটুকু কারণ উপস্থিত হয়নি। আর ভারতে সারা দেশটা সৈয়দ আহমেদর খলীফাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলো এবং ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের প্রতিকূলে একটা সরকারও বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো; কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে চল্লিশ বছর ধরে কিছুই জানতে পারলো না—এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, তারা শাসিত জাতির সম্বন্ধে কতখানি অজ্ঞ ছিল। সৈয়দ আহমদ অতঃপর টংকে উপস্থিত হন এবং পুরানো নায়ক আমীর খাঁর সংগে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। আমীর খাঁর পুত্র তাঁর মুরীদ হন। টংক থেকে তিনি মরুভূমি অতিক্রম করে সিন্ধুতে উপস্থিত হন ও খয়েরপুরের মীর রুস্তম খাঁর অতিথি হন। এখানে বহু মুজাহিদ তাঁর সংগে যোগদান করে। অতঃপর তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং কাবুলে কান্দাহারের পার্বত্যবাসীদের মধ্যে জেহাদ প্রচার করতে থাকেন শিখদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনও বিশেষ ফল না হওয়ায় তিনি খিলজীদের অঞ্চলে গমন করেন এবং ১৮২৬ সালের শেষের দিকে পেশোয়ার ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী ইউসুফজাই পাহাড়ে প্রবেশ করেন।

ইউসুফজাই আদিবাসীরা বহু বছর ধরে লক্ষ্য করেছিলো যে, শিখরা একের পর এক প্রদেশ আফগানদের হাত থেকে নিছিয়ে নিচ্ছিলো, আর তার দরুন তারা নিজেদের আজাদী সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। ১৮২৩ সালে পেশোয়ারের শাসনকর্তা ইয়ার মুহম্মদ খাঁ রণজিৎ সিংহকে কর দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু এটা তাঁর ভাই মুহম্মদ আজিম খাঁর মনঃপূত হলো না। তিনি ইয়ার মুহম্মদ খাঁকে পেশোয়ার থেকে বিতাড়িত করে দেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। মার্চ মাসে শিখদের ও পাহাড়িয়া আদি জাতিদের মধ্যে নওশেরায় একটা যুদ্ধ হয় কিন্তু কোনও ফল হয় না। শেষে আদিজাতিরা তাদের সরদার মুহম্মদ আজীম খাঁ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। শিখরা পেশোয়ার দখল করে ফেলে ও লুটপাট করে খাইবার পর্যন্ত হাজির হয়, কিন্তু পেশোয়ার নিজেদের কর্তৃত্বে রাখা শক্ত বিবেচনা করে ইয়ার মুহম্মদকে জায়গীর হিসেবে দান করে।

এই পরিস্থিতিতে ইউসুফজাই আদিজাতিরা নিজেদের আজাদী রক্ষার উদ্বেগে ও শিখদের শায়েস্তা করবার মতলবে সৈয়দ আহমদকে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলো এবং

তাঁর কর্তৃত্বও মেনে নিলো। তখন তিনি তাদের সাহায্য নিয়ে শিখদের থাকোরায় আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হয়েও অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন। ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন এবং ইয়ার মুহম্মদও তাঁর সংগে চুক্তি করতে বাধ্য হলেন ও ইউসুফজাই আদিজাতিদের আজাদী স্বীকার করলেন। অবস্থা এভাবেই রয়ে গেল ১৮২৯ পর্যন্ত; কিন্তু তখন সৈয়দ আহমদ পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ইয়ার মুহম্মদ তাঁকে বিষপ্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। একটা যুদ্ধ হলো, ইয়ার মুহম্মদ নিহত হলেন এবং তাঁর অনুগামীরা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। পেশোয়ার কোন রকমে রক্ষা পেলো—শের সিংহ ও জেনারেল ভেন্তুরার একদল শিখ বাহিনী নিয়ে উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হওয়ার দরুন। ১৮৩০ সালের জুন মাসে সৈয়দ আহমদ জেনারেল আলার্ডের অধীন একদল শিখবাহিনীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারও পরাজিত হন। শীঘ্রই তিনি ইয়ার মুহম্মদ খাঁর উত্তরাধিকারী সুলতান খাঁর বিরুদ্ধে পেশোয়ারে হামলা করেন, এবং সুলতান মুহম্মদকে বিতাড়িত করে পেশোয়ার দখল করতে সক্ষম হন। তাঁর এই সামরিক জয় পরোক্ষে শিখদের পক্ষে মংগলকরই হয়েছিলো। সৈয়দ আহমদ আক্রমক হিসেবে জয়ী হয়ে পেশোয়ারের শাসক হয়ে উঠলেন, কিন্তু শাসন বিষয়ে তাঁর ধর্মান্ধতা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রথম সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আশা-ভরসা নষ্ট করে দিলো। তাঁর প্রথম কাজ হলো খলিফা খেতাব ধারণ করা ও নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করা এবং নিজের নামাংকিত তংকা জারী করা—'আহমদ ইসলামের রক্ষক' যাঁর তরবারির ঔজ্জ্বল্যে কাফেরদের ধ্বংস সাধিত হয়।' আরও তিনি আরবের ওহাবীদের পদাংক অনুসরণ করে দাবী করলেন। তাঁর প্রজারা মুহম্মদ ও তাঁর খলিফাদের আমলে নির্ধারিত দেয় জাকাত ফেতরা আদায় দেবে। এই সময় আরও চেষ্টা করা হয় পেশোয়ারের গোঁড়া হানাফী মুসলমানদের তাঁর দলভুক্ত করতে। এজন্যে শিক্ষিত মুসলমানদের এক বিরাট জলসা ডাকা হয় এবং পারস্পরিক অনেক ছাড়-রিয়াতও করা হয়। মওলবী ইসমাইল ত্যাগ করলেন ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা করার অধিকার ও 'রাফিয়াদান' করা এবং একজন মুকাল্লদ হানাফী হিসেবে স্বীকৃত হলেন। আর হানাফীরা সৈয়দ আহমদের প্রচারিত বেদাত ও শিরক্ সম্বন্ধ মতবাদ স্বীকার করলো এবং জেহাদের সাহায্যার্থে জাকাত প্রভৃতি আদায় দিতেও স্বীকৃত হলো। ধর্মান্ধদের আবেগের আতিশয্য শীঘ্রই প্রকট হয়ে উঠলো। আবদুল ওহ্হাবের উত্তরাধিকারীরা মদিনায় পয়গম্বরের মাজার ভেঙে দিয়েছিলো, আর সৈয়দ আহমদের অনুগামীরা পেশোয়ারের মাজারগুলিও ভেঙে ফেলতে লাগলো এবং ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তরবারির সাহায্যে যেমন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, সেইরকম তারাও পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যের সংগে শান্তির বাস করতে অস্বীকার করলো। অতএব এই মতবাদটাই জোরেশোরে প্রচারিত হতে লাগলা যে, যারা পুতুল পূজকদের সংগে বিরোধ করতে চায় না তারা নিজেরাই পুতুলপূজক হয়ে গেছে। পাঞ্জাবকে দারুল হরব বা দুশমনের দেশ আখ্যা দিয়ে জয় করার জন্যে জেহাদ ঘোষণা করা হলো।[১৪]

---

[১৪] এই সময়ে তিনি বাংলাদেশের মুরীদানকে তাঁর সংগে যোগ ও জেহাদে শরীক হতে আহ্বান করেন। বাংলা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী থেকে বহু লোক তাঁর সাহায্যার্থে গমন করে ও বালাকোটে মিলিত হয়।

প্রথমাবস্থা থেকেই ধর্মান্ধদের সরকারের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুবই অল্প। কারণ 'এটার লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বারো বছর মুছে ফেলে দেওয়া এবং একটা বিদেশী জাতকে মুহম্মদের সমকালীন আরববাসীদের স্বভাব, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের অনুসারী হতে বাধ্য করা। ধর্মীয় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও শীঘ্রই স্থানীয় বাসিন্দারা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো এবং সৈয়দ আহমদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে লাগলো যে, তিনি পাহাড়ী আদি জাতিদের মেয়েদের সংগে তাঁর ভারতীয় অনুচরদের শাদী দিচ্ছেন। ১৮৩০ সালে নভেম্বর মাসে তিনি বাধ্য হলেন সুলতান মুহম্মদ খাঁর হাতে পেশোয়ার ছেড়ে দিতে, তবে সুলতান মুহম্মদ খাঁ তাঁকে কর দিতে রাজী হলেন।[১৫] অতঃপর সৈয়দ আহমদ সিন্ধুনদ অতিক্রম করে পূর্ব তীরে উপস্থিত হলেন শিখদের জয় করতে। কিছুকাল তিনি খণ্ডযুদ্ধ চালাতে লাগলেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। ১৮৩৯ সালের মে মাসে বালাকোটে একদল শিখ বাহিনী অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করে এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। সৈয়দ আহমদ ও মুহম্মদ ইসমাইল শহীদ হন।

অন্য কিছু বলার পূর্বে এখানে সৈয়দ আহমদের ব্যক্তিগত বর্ণনা, তাঁর মতবাদ ও সেগুলি লোকপ্রিয় হওয়ার কারণগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন মাঝারি গঠনের ব্যক্তিত্বশালী মানুষ, আর সারা বুক ছেয়ে দাড়ি থাকার দরুন তাঁকে আরও ভারিক্কি মানুষ মনে হতো। ১৮২০ সালে যখন তিনি নিম্নবংগ সফর করেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ছত্রিশ বছর। তাঁর পোশাক ছিল মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি, বুক পর্যন্ত খোলা কুর্তা ও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো সাদা চোস্ত পায়জামা। সবগুলোই ছিলো সুতী কাপড়ের। সমকালীন উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি হিন্দুস্থানে প্রচলিত চার তরিকার ফকিরীতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিলো গম্ভীর, শান্ত ও সংবেদনশীল। মুরীদানের সংগে 'বয়েত' বা দীক্ষা দেওয়াকালীন সময় ব্যতীত তিনি খুবই কম আলাপ করতেন। বারাসতে মুরীদানের সংখ্যা এতো বেড়ে ওঠে যে, তিনি পাগড়ী খুলে দিয়ে তাই ছুঁইয়ে মুরীদ করার রেওয়াজ অবলম্বন করেন। তিনি স্বভাবতই মৌন থাকতেন এবং মুসলমান আইনে অজ্ঞতার ধরুন ধর্মীয় আলোচনা পরিহার করতেন। এজন্যে যখনই কোনো বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত হতো, তখন তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন আর তাঁর দুই মহাপণ্ডিত শিষ্য মওলবী আবদুল হাই ও মওলবী মুহম্মদ ইসমাইল বিপক্ষ দলের সংগে বাকযুদ্ধ চালাতেন। তাঁর অনুগামীদের এবং তাঁরও বিশ্বাস ছিলো যে, আকৃতিতে ও স্বভাবে তিনি ছিলেন পয়গম্বর সাহেবের সমান। তাঁর প্রায়ই ভাবাবেশ বা মূর্চ্ছা হতো (তা যে কী বলা শক্ত) এবং তিনি ও তাঁর মুরীদান বিশ্বাস করতেন যে, পয়গম্বর সাহেবের মতোই তখন আল্লাহ্‌র সংগে তাঁর সাক্ষাৎ-সংযোগ ঘটতো। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি দরদী, শান্ত ও অশিক্ষিত ছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর স্নায়ুবিকার ঘটতো। তিনি নিজেকে পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের ইমাম হিসেবে দাবী করতেন এবং তার সমর্থনে অদ্ভুত যুক্তিও খাড়া করতেন : কোনো মানুষই

---

[১৫] পেশোয়ারের উযিরবেগ ছিল সুতলান দুররানীর বাসস্থান। তিনি তিলাই খা বা 'সোনার সরদার' হিসেবেই পরিচিত। তিনি ছিলেন নিমকহারাম ও মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু যে শিখদের তিনি সাহায্য করেছিলেন মুসলমানদের সর্বনাশ করে, তারাই তাকে ও তার সব অনুচরকে পেশোয়ার থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল—(অ)।

কোনো দেশে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, যদি তাঁর অনুপ্রেরণার সংগে কিছুটা পাগলামী মেশানো না থাকে।

ধর্মীয় আলোচনায় কিছুতেই অংশগ্রহণ না করার নীতি গ্রহণ করার দরুন সৈয়দ আহমদ বাস্তবপক্ষে কিসে বিশ্বাসী ছিলেন, ধারণা করা শক্ত। গোঁড়া সুন্নীরা এবং তাঁর নিকট-অনুগামীরা বিশ্বাস করতো যে, তিনি আদর্শিক মানুষ; তবে সুন্নীরা আরও বলতো যে, তিনি ভিন্নজাতীয় মতবাদ পোষণ করতেন না, তাঁর খাদিম মওলবীরা যাই বলুক না কেন; অথচ তাঁর মুরীদান কিছুতেই একথা স্বীকার করতেন না। তাঁর বাণীসমূহের সংগ্রহ হিসাবে 'সিরাতুল মুসতাকিমের' উল্লেখ করা হয়। এখানি মওলবী ইসমাইলের রচনা, তবে এতে তাঁর মুরশিদের সঠিক বাণীগুলিই উদ্ধৃত হয়েছে, বলা হয়ে থাকে। নিম্নবংগের মুসলমানরা কেতাবখানি খাঁটি নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে এবং বলে যে, মওলবী মুহম্মদ ইসমাইল নিজের মতবাদ প্রচার করবার আগ্রহাতিশয্যে সেগুলিই কেতাবখানিতে তাঁর মুরশিদের বাণী সিহেবে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বইখানার বিষয়বস্তু থেকে ও সৈয়দ আহমদের মুরীদানের সাক্ষ্য থেকে ধারণা হয়, বইখানা খাঁটি হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছে। একজন ফকিরের নিকট যেমন আশা করা যায়, তেমনই তাঁর শিক্ষার বহুলাংশ সেই দিকটা খুলে দেখায়, কিভাবে একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ওলীর (সন্ত পুরুষ) মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন। তাঁর শিক্ষার মৌল ভিত্তি হচ্ছে, চরম অদৃষ্টবাদ ও এক আল্লাহে অকুণ্ঠ বিশ্বাস। মানুষের কিছুই করবার যোগ্যতা নেই নিজের প্রচেষ্টায়; তাকে একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে আল্লাহ্‌র উপরেই এবং মানুষের জন্মের বহু পূর্বেই তিনি এ জগতে তার সব কর্মধারা ও মরজগতে তার পরিণতি অমোঘ বিধানে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আসলে মানুষ স্বাধীন সত্তা নয়; কিন্তু তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা নিজ নিজ কর্মফলের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে আল্লাহ্ করুণা করে মানুষের জন্যে ইমাম বা নেতা পাঠিয়ে থাকেন। তাঁদের দায়িত্ব হলো, মানুষকে মুক্তির পথে চালনা করা। গত যুগের পয়গম্বররা—ঈসা, মুহম্মদ, সকলেই এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। কিন্তু মুহম্মদের ওফাতের পর থেকে নবুয়তের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী যে-ইমাম আসেন তাঁর মর্যাদা ওলীর উপরে কখনও উঠতে পারে না। এসব অবশ্য ততো দরকারী বিষয় নয়। তবে ওলী হচ্ছেন পয়গম্বরের পরবর্তী মর্যাদার মানুষ, ঠিক যেন ছোট ভাইয়ের মতো। ইমাম ধাপে ধাপে মুহম্মদের শেখানো তরিকায় নাজাতের পথে অগ্রসর হন। তবে ইমাম সময়ে সময়ে আল্লাহ্‌র সংগে মিশে যান, তখন ঐশী গুণ তাঁর মধ্যে এসে যায়; আর তখন তিনি হয়ে ওঠেন সর্বদর্শী এবং কেরামত দেখাবার অধিকারী হন; এরকম ইমাম চেনার কতকগুলি নির্দিষ্ট চিহ্ন আছে। তিনি সৈয়দ হবেন এবং নীচ অবস্থায় জন্ম হবে। প্রথমে ইমাম হিসেবে তাঁর মর্যাদা স্বীকৃত হবে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইমামতের চিহ্ন প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং শেষে তিনি ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। তখন সব মুসলমানই তাঁকে দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খলিফারূপে গ্রহণ করবে এবং তাঁর কাজ হবে তাদের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করা ও তাদের ঈমান রক্ষা করা।

শাস্ত্রীয় বচনের দিক থেকে এসব বিবেচনা করলে সৈয়দ আহমদের ইমামত এতোই চিহ্নিত যে, সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তিনি জন্মেছেন সৈয়দকুলে ও অখ্যাত অবস্থায়। মুহম্মদ যেমন বেহেশতে মুসার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তেমনি সৈয়দ আহমদ

সেই দুই তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ফকিরের সাক্ষাৎ পান, যাঁদের তরিকায় তিনি বিশ্বাসী। আর খোদ আল্লাহ্ যেমন মুহম্মদের কাঁধে হাত রেখে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেন, সেই রকম মুহম্মদও তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়েছেন; অতএব সৈয়দ আহমদ নিশ্চয়ই যুগের ইমাম, কিংবা তার চেয়েও বেশি ইমাম হুমাম অর্থাৎ ইমামকুলের শিরোমণি। আর মুহম্মদ যেমন ছিলেন শেষ নবী, তেমনি সৈয়দ আহমদের সংগে ইমামের ধারাও শেষ হয়ে যায়। [১৬]

মুসলমানদের মধ্যে একটি সর্ববাদিসম্মত কাহিনী চলিত আছে যে, মুহম্মদের মৃত্যুর পর থেকে রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত বারো জন খলিফা ইসলামের শাসক হবেন। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়ে গেছে, এ পর্যন্ত কতোজন খলিফা উদিত হয়েছেন। শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, এগারো জন ইমাম গত হয়েছেন এবং দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ আবুল কাসিম ২৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিয়ারা বিশ্বাস করে না যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে; বরং তাদের ধারণা যে, তিনি কোনো গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে আছেন এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলেই তিনি পুনরায় উদিত হবেন ও মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে চালনা করবেন। সুন্নীদের মধ্যে বিভিন্ন মত বর্তমান আছে : কোনো দল বলে, ছয় জন খলিফা গত হয়েছেন, কোনো দল বলে চারজন; তবে এটা নিশ্চিত যে, রোজ-কেয়ামতের আগে ছয়জন খলিফার উদয় হবে; কিন্তু সেকাল কখন আসবে, সেটা অজ্ঞাত। সৈয়দ আহমদ দাবী করতেন যে, তিনি এইরকম একজন খলিফা এবং এ দাবীর সমর্থনে এসব যুক্তি খাড়া করতেন; তিনি কি সৈয়দ নন এবং সে হিসেবে মুহম্মদের সাক্ষাৎ বংশধর নন? তাঁর জামাতা হযরত আলীর ও কন্যা ফাতেমার বংশধর নন? এই দুজন কি স্বপ্নে তাঁকে দেখা দেন নি ও সন্তান হিসাবে আদর করেন কি? একজন তাঁকে গোসল দিয়েছেন, অন্যজন তাঁকে লেবাস পরিয়েছেন। এরপর আর কি বেশী প্রমাণের দরকার যে, তিনি ইমাম ও খলিফাদের আসনের অধিকারী? এতেই তো তাঁর অধিকার স্বীকৃত যে, তিনি আমিরুল মুমেনীন অর্থাৎ মোমেন মুসলমানদের চালক। তাঁর পূর্বে তো সুন্নীদের মধ্যে আর কোনও ইমাম এ খেতাব গ্রহণ করেননি, এবং এ খেতাব তো একমাত্র খলিফাদের ও অন্য মুসলমান স্বাধীন শাসকদের দ্বারাই গৃহীত হতো। এভাবে খলিফার ভূমিকা সৈয়দ আহমদের মনে গেঁথে গেল এবং এভাবেই চালিত হয়ে তিনি ভারতকে বিভক্ত করে নিজের খলিফা নিযুক্ত করলেন জাকাত প্রভৃতি ধর্মীয় কর আদায় করতে এবং শেষে তিনি পেশোয়ারে আযাদীও ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু সব মানুষই সমান নয়, আর সকলেই ইমামের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার স্পর্ধাও করতে পারে না। এজন্যে সাধারণ লোকের ঈমান ও ধর্ম পালনের জন্যে কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম নির্দেশিত হওয়ার দরকার। সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় নীতিগুলো ছিলো একজন ফকীরের মতো, যাঁর বিশ্বাস ছিলো যে, তিনি মুহম্মদেরই জীবনধারা সর্বাংশে

---

১৬. ইমাম শব্দটা একেবারে ধর্মীয়। এ থেকে এটা বোঝায় না যে, তাঁর পার্থিব কিছু ক্ষমতা থাকবে। চারটি গোঁড়া মজহাবের প্রতিষ্ঠাতাদেরকেও ইমাম বলা হয়। মুসলমান দেশগুলির প্রত্যেক মসজিদে একজন ইমাম থাকেন, তাঁর কাজ হলো সব নামাজে ইমামতি বা নেতৃত্ব করা। প্রত্যেক নামাজের নেতাকে বলা হয় ইমাম। প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুগামীরা ইমাম শব্দে শিক্ষক ছাড়া অন্য কিছু বোঝাতে চাননি, কিন্তু শীঘ্রই শব্দটার ভিন্ন বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন। সুন্নীদের মতোই ধর্মীয় মৌল ভিত্তিগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি নির্দেশ দেন যে, এই মৌল ভিত্তিগুলোর মধ্যে একমাত্র কুরআনই অভ্রান্ত; আর হাদীস তো ওহীর মতো নাযেল হয়নি, অতএব মুহম্মদের সাহাবাদের মতামতের বা আলেমদের সিদ্ধান্তের মতো তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, তবে মাত্রায় হয়তো কম হতে পারে। এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা কি করে এড়ানো যায়? মুহম্মদ তাদিগকেই মাত্র নাজাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা পরবর্তী-কুরআন বা হাদীসের দ্বারাই চালিত হবে। অতএব সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে তাঁর উম্মতদের সিদ্ধান্ত পরিহার করা, তা তাঁরা যতই ধর্মনিষ্ঠ হোন। আবার কামালিয়ত হাসিল করতে হলে আরও কিছু বর্জন করা দরকার। যদিও মুহম্মদ এ যুগের মুসলমানদিগকে কুরআন ও হাদীস ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে নিষেধ করেছেন, তবুও এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, হাদীস মানতেই হবে। ঈমানের মৌল ভিত্তি হিসেবে হাদীস দরকারী বটে, তবু আজকাল লক্ষ্য করা যায় যে, লোকে হাদীসকে কুরআনের তুল্যমূল্য হিসেবেই বিবেচনা করে। অতএব সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে হাদীসকে ত্যাগ করে কুরআনকেই আঁকড়ে ধরা। সৈয়দ আহমদ যখন পাটনার মুহম্মদ হোসেনকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেন, সেই সনদ থেকে তাঁর শিক্ষার অসম্পূর্ণ হলেও মোটামুটি যথার্থ পরিচয় নীচে দেওয়া চলে :

"করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে বলছি : যারা সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র রাহে চলতে চায় এবং বিশেষ করে সৈয়দ আহমদের যেসব বন্ধু উপস্থিত আছে বা অনুপস্থিত আছে, তারা সকলেই জানুক যে, ধর্মনিষ্ঠ ওলীদের হাতে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধন করা, আর তার উপায় হচ্ছে তাঁর পয়গম্বরদের হুকুম বা বিধান মেনে চলা। যে কেউ মনে করে যে, তাঁর রসূলের হুকুম না মেনেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান করা চলে, সে মিথ্যুক ও প্রতারিত, তার দাবীও মিথ্যা এবং গ্রহণের অযোগ্য। রসূলের হুকুম দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

প্রথম, কোনো সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র গুণ আরোপিত না করা (শিরক)।

দ্বিতীয়, রসূলের সময় কিংবা তাঁর পরবর্তী খলিফাদের[১৭] সময় যেসব নীতি বা আচার-অনুষ্ঠান ছিলো না, সেসব আমদানী ও অনুসরণ না করা (বেদাত)।

প্রথমটি হচ্ছে এরকম বিশ্বাস না করা যে, ফেরেশতা, জ্বীন, মুরশিদ, ওস্তাদ, শাগরেদ, পয়গম্বর বা পীর কারও মুসিবত বা বিপদ দূর করতে পারেন। এরূপ কোনো সৃষ্টির নিকট নিজের ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য ধরা না দেওয়া; তাঁদের কারো ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা আছে, এটা অস্বীকার করা; আল্লাহ্‌র ক্ষমতার নিকট তাঁদের প্রত্যেককেই নিজের মতো অসহায় মনে করা, বরং তাঁদের আল্লাহ্‌র প্রিয়জন মনে করা। জীবনের ঘটন-অঘটন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁদের আছে কিংবা আল্লাহ্‌র গুণ-জ্ঞান তাঁরা অবহিত আছেন, এরকম বিশ্বাস করাই হলো চরম ধর্ম বিগর্হিত (কুফর) কেনো সত্য-সন্ধ মুসলমান এরূপ কোনো মতবাদে জড়িত হতে পারেন না।

"দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলা যায় যে, ধর্মে নূতনত্ব বা বেদাত আমদানী না করা হচ্ছে, রসূলের জীবদ্দশায় যেভাবে এবাদত-বন্দেগী করা হতো ও তাঁর জীবনে যে সব রীতি-নীতি চলিত ছিল সেগুলি আঁকড়ে ধরে থাকা; সব রকম বেদাত বর্জন করা, যেমন বিয়ে-

---

[১৭] খোলাফায়ে রাশেদীন—(অ)।

শাদীতে, আনন্দ-উৎসব, শোকোৎসব, মাজার সাজানো, কবরে স্মৃতিসৌধ তোলা, মৃত্যু-বার্ষিকীতে কিংবা ফাতেহায় অঢেল খরচ করা, তাজিয়া তৈরী করা প্রভৃতি এবং এসব রেওয়াজ একেবারে বন্ধ করে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা। একজন মুসলমান প্রথমে এসব রেওয়াজ ত্যাগ করবে এবং তারপর অন্যসব মুসলমানকে শেখাবে যে, তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে রসূলের হুকুম ও আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলা; যা করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাই পালন করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন সে সব থেকে দূরে থাকা। এসব আমার মনে বিশেষভাবে গেঁথে গেছে; অতএব যারা আল্লাহ্‌র সন্ধান করে, তাদের চোখের সামনে এসব তুলে ধরা দরকার এবং পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে এসব আঁকড়ে থাকা উচিত; আর বিশেষভাবে উচিত শেখ মুহম্মদ হোসেনের হাতে হাত মিলিয়ে থাকা, কারণ তিনি আমার হাতে হাত মিলিয়ে এসব পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন; আমিও তাঁকে তোমাদের কাছে সুপারিশ করছি যে, তিনি আমার হয়ে তোমাদিগকে হেদায়েত বা সৎশিক্ষা দেবেন। শেখ মুহম্মদ হোসেনের উচিত উপরোক্ত বিধি মেনে চলা, এসব বিধান সম্যকভাবে পালনকাজে আল্লাহ্‌র দিকে তনুমন নিয়োজিত করা; শিরক ও বেদাতের যে সব মালিন্য দেহে জমে আছে, সেসব একেবারে মুছে ফেলা এবং তার হাতে হাত মিলিয়ে একযোগে কাজ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণে সকলকে আহ্বান করতে চেষ্টা করা।"

শিরক্ ও বেদাতের প্রতিই ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিষেধ করেছিলেন, যারা এর কোন একটিতে অনুরক্ত, তাকে বিবাহ্ না করতে। তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করা; কারণ আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা সাবধান করে যাও, যেহেতু হেদায়েত করলে মোমেন বান্দার উপকার হয়"।[১৮] আল্লাহ্ আরও বলেছেন, "তোমরা মানুষকে হেদায়েত করে যাও, যেন তার দ্বারা তাদের উপকার হয়। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদের সতর্ক করা উচিত; কিন্তু কট্টর কাফেররা এসব থেকে পালিয়ে যাবে, আর তারা দোযখের ভীষণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে তারা মরবেও না, বাঁচবেও না[১৯]।" যেখানে অনুরোধে কাজ হয় না, সেখানে তো তরবারি আছেই, যার ব্যবহার শুধু উপযুক্ত নয়, দরকারী বলে মনে করা হতো। আর এসব মতবাদ শুধু ফাঁকা আওয়াজ হিসেবে মনে হতো না। আমরা দেখেছি, সৈয়দ আহমদ তাঁর কর্মজীবনের শেষের দিকে পেশোয়ারের একটা বড়ো মাজার ভেঙে দিয়েছিলেন, আর তাঁর অনুগামীরা পাটনায় তলোয়ার হাতে নিয়ে একটা মুহররমের মিছিল আক্রমণ করেছিল ও তাজিয়া নষ্ট করে দিয়েছিল।[২০]

---

[১৮] সেল সাহেবের অনূদিত কুরআন—৪২৪ পৃঃ।

[১৯] সেল সাহেবের অনূদিত কুরআন—৪৮৭ পৃঃ।

[২০] মি, টেইলর বর্ণিত ওহাবীদের অন্ধ নেতা মওলবী ইলাহীবখশ, পরবর্তীকালে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত মওলবী আহমদউল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদের নিযুক্ত প্রধান খলিফা শাহ মুহমদ হোসেনকে সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়, অনেকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ের মারামারিটা ভীষণ হয়েছিলো, এমনকি স্ত্রীলোকেরাও তাতে যোগ দিয়েছিল।

সব মুসলমানই স্বীকার করে যে, শিরক্ মহাপাপ, অতএব সৈয়দ আহ্‌মদের মতবাদ এমন কিছু নতুন শিক্ষা দেয়নি। কিন্তু তাঁর শিক্ষার ধরনটা ছিল আপত্তিকর। হানাফীরা বিশ্বাস করে যে, তখনই শিরক্ মহাপাপ করা হয়, যখন কেউ সজ্ঞানে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপর ইলাহীগুণ আরোপ করে। কিন্তু নয়া সংস্কার-পন্থীরা আরও বেশি দূর গিয়েছিল এবং অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপারকেও তার সংগে সংযুক্ত করে ফেলেছিল। যেমন, আল্লাহ্‌কে বলা হয় সবকিছুর দাতা (বখশ দেনেওয়ালা); অতএব যদি কারও নামের একাংশ হয় 'বখশ' তাহলে তার অন্য অংশটা আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটা নামের একটা হতেই হবে। ইলাহী বখশ বেশ শুদ্ধ নাম, কিন্তু ছেলের নাম মুহম্মদ বখশ রাখা হলে আল্লহ্‌র সিফ্‌ত বাগু মুহম্মদের উপর আরোপ করা হয়, এবং তার ফলে নামদাতা এ দুনিয়া থেকে কাফের হিসেবে মরণ বরণ করে এবং পরকালে অনন্ত শাস্তি ভোগ করে। এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বেদাত আমদানী সম্বন্ধে রসূলের একটি হাদীসের নজীর দেওয়া হয় যে, তিনি বলে গেছেন, যে কেউ ইসলামে নতুনত্ব (বেদাত) আমদানী করবে, সে হবে অভিশপ্ত। মুসলমান আলেমদের মতানুযায়ী এই হাদীসটির কতকটা আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁরা মনে করেন যে, মুহম্মদের জীবদ্দশায় আরবে যেসব রীতি-নীতি ছিল, এই হাদীসটির দ্বারা তার রদবদল একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে; অতএব তাঁদের সিদ্ধান্ত যে, ধর্মের বিপরীত কোনো পরিবর্তন করা চলে না। সভ্যতার উন্নতির জন্যে কিংবা ইসলামের মহিমার জন্যে নতুনত্বের আমদানী নিষিদ্ধ নয়। যেমন, এক ধরনের নতুনত্ব হচ্ছে, আরবী ব্যাকরণ পড়া এবং আরবী অভিধান সম্পাদনা করা কিংবা তার ব্যবহার করা, কিন্তু কুরআনের মর্মার্থ গ্রহণে তা অত্যন্ত দরকারী। আর এক রকম হচ্ছে, স্কুল-কলেজ স্থাপন করা ধর্মীয় শিক্ষার জন্যে, এটা বাধ্যতামূলক না হলেও অনুসরণ করা উচিত। আরও এক প্রকার বেদাত দূষণীয় নয়, যেমন মুহম্মদের চেয়ে ভালো খাওয়া ও পরা। কিন্তু এক রকম বেদাত, যেমন মসজিদে ছবি টাঙ্গানো নিষিদ্ধ। কিন্তু সৈয়দ আহমদ বেদাত শব্দের এই ব্যাখ্যা দেননি। তিনি মনে করতেন, তিনি রসূলের কদমে কদম মিলিয়ে চলেছেন, আর এজন্যে চেষ্টা করতেন যে, হিজরীর প্রথম শতকের রীতি-নীতি তের শতকের মানুষের দিশারী হবে।[২১] যে-সব রেওয়াজ, যতোই নির্দোষ হোক না কেন, ধর্মের সংগে সংশ্লিষ্ট হলেই তা মুহম্মদ বা তাঁর পরবর্তী খলিফাদের আমলে চলিত না থাকলে তিনি সোজাসুজি বর্জন করতেন। মোমেন মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হলো, উপরোক্ত যুগের লোকের জীবন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা। ধর্মের জন্যে মাত্রাধিক উৎসাহ, তা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও দূষণীয়; আবার তেমনি ধর্মের জন্যে উৎসাহ না থাকাও পাপ। যতোই তুচ্ছ হোক, কোনও বেদাতই নিষেধাজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হতো না। শোকের চিহ্ন হিসেবে কালো, সবুজ কিংবা নীল বস্ত্র পরা; পাকা কবর তোলা; উট, খচ্চর কিংবা গাধায় চড়তে লজ্জাবোধ করা; কাউকে অত্যধিক সম্মান দেখানো, কিংবা তা না পাওয়ার জন্যে বিরক্তিবোধ করা এ সমস্তই ধর্মের বড়ো রকম বিরুদ্ধতা হিসেবে গণ্য করা হতো এবং অনুরোধে বা বল প্রয়োগে বন্ধ করে দেওয়া হতো।

---

[২১] রসূল একবার একটা রেখা টেনে বলেছিলেন : এইটি হলো আল্লাহ্‌র পথ। তারপর তিনি ডাইনে ও বামে কয়েকটি রেখা টেনে বলেছিলেন, এগুলি পথ, কিন্তু তার প্রত্যেকটিতে শয়তান বসে তোমাদের ডাকছে ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

এসব ছাড়াও কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল, যেগুলি পালন করলে নাজাত পাওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, হিন্দুস্তানের কোনো-না-কোনো ফকিরী তরীকার সভ্য হওয়া; আল্লাহ্‌র এই বাণী স্মরণ রাখা ঃ "হে সত্য-বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাহলে তোমরা সুখী হবে"।[২২] এই নির্দেশকে দিশারী হিসেবে গ্রহণ করলে, এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক মানুষের সাধনা করা উচিত—আল্লাহ্‌কে ভয় করা, ঈমানে শক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা (এটা একমাত্র সম্ভব যুগের ইমাম সাহেবের, কিংবা কোনো পীরের মুরীদ হয়ে), আর কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা।[২৩] প্রত্যেকটি নির্দেশে প্রথানুসারে পালন করতে হবে। আল্লাহ্‌কে ভয় না করলে ঈমান শক্ত হয় না, আর মুরশিদের সাক্ষাৎ না পেলে তার জেহাদ করাও হয় না। সৈয়দ আহ্‌মদ বিশেষভাবে জোর দেন নামাজ আদায় করতে, জাকাত প্রভৃতি ধর্মীয় কর আদায় করতে ও জেহাদে যোগদান করতে।[২৪] সৈয়দ আহ্‌মদ নিজে ছিলেন পেশাদার সৈনিক, আর মালবের আমীর খান পিণ্ডারীর নেতৃত্বে তিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এজন্যে তিনি জেহাদের গৌরব সম্বন্ধে আলোচনা করতে আনন্দ অনুভব করতেন। জেহাদ কাফের ও মোমেন মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীর তুলে দেয়, আর মুসলমানরা কাফেরদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে যেয়ে হৃদয়ে পবিত্র হয়ে ওঠে ও দ্রুতগতিতে দরবেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়। তিনি মুজাহিদের প্রশংসা কীর্তনে কখনও ক্লান্তি অনুভব করতেন না। তারা তো আল্লাহ্‌র নায়েব; তিনি নিজের জীবদ্দশায় জেহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেন এবং তাঁর মুরীদান ও বংশধরদের জন্যে এই চরম নির্দেশ দিয়ে যান যে, তারা যেন রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত জেহাদ চালাতে কখনও বিরত না হয়। 'সিরাতুল মুসতাকিমের' নীচের উদ্ধৃতি থেকে জেহাদের পক্ষে যুক্তির মোটামুটি এই পরিচয় মেলে :

> "জেহাদ হচ্ছে অসীম সুফলের কাজ। বৃষ্টি যেমন মঙ্গল করে মানব জাতির, প্রাণীর ও উদ্ভিদ্‌-জগতের, সেই রকম জেহাদে সকল মানুষ উপকৃত হয়। এই উপকার সাধিত হয় দু'রকমে—সাধারণভাবে, যার দরুন সব মানুষ, এমনকি পৌত্তলিকরাও এবং বিধর্মীরাও, আর প্রাণী-জগৎ ও বৃক্ষলতা উপকৃত হয়; আর বিশেষভাবে, যার দরুন কয়েক শ্রেণী মাত্র উপকৃত হয় এবং বিভিন্ন অনুপাতে হয়। সাধারণ উপকার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এসব হলো স্বর্গীয় আশিসধারা, যেমন যথাসময়ে প্রচুর বর্ষণ, সব্‌জি ও শস্যের প্রচুর আমদানী এবং সুখের সময়; এসবের ফলে মানুষ অভাবমুক্ত ও দৈবদুর্বিপাক থেকে নিশ্চিত হয়, অথচ তার ধনসম্পদ উথলে ওঠে। আর শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, বিচারকের ন্যায়বিচার হয়, মামলাকারীদের বিবেকজ্ঞান বর্ধিত হয় এবং ধনবানরা আরও দানশীল হয়।

---

[২২] সেল্ সাহেবের অনুদিত কুরআন...৮৮ পৃঃ (সূরা মায়দা)।

[২৩] এই নির্দেশটি দেওয়া হয় মুহম্মদের একটি হাদীসের উপর নির্ভর করে; জেহাদ দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে।

[২৪] কথিত আছে যে, এ ছাড়াও সৈয়দ আহ্‌মদ জেহাদে যোগদানের পূর্বে মক্কাশরীফে হজ্ব করার উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। এ কথা সত্য যে, তিনি নিজেও হজ্ব করেছিলেন এবং তাঁর বহু মুরীদ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণও করেছিলেন। তবে তিনি এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট হুকুম দিয়েছিলেন কিনা উপযুক্ত সাক্ষ্য নেই।

আবার এসব আশিসধরা শতগুণে বেড়ে ওঠে যখন ইসলামের মহিমা স্বীকৃত হয়, শক্তিশালী বাহিনীর অধিকারী মুসলমান শাসকদের গৌরব বৃদ্ধি হয় এবং তাঁরা সকল দেশে শরীয়তী আইন বলবৎ ও ঘোষণা করেন। কিন্তু একবার এই দেশটার (ভারতের) দিকে তাকাও এবং স্বর্গীয় আশিসধারা সম্বন্ধে তার ভাগ্যের সংগে তুরস্ক বা তুর্কীস্তানের তুলনা কর। শুধু তাই নয় ১২৩৩ হিজরীর (১৮১৮ খৃঃ) হিন্দুস্তানের বর্তমান বিবেচনা করো, যখন তার বেশির ভাগই দারুল হরব হয়ে গেছে, আর তার সংগে দু'তিন শতক পূর্বের ভারতের তুলনা করে দেখ এবং তার সে আমলের সংগে এ আমলের স্বর্গীয় আশিসধারা ও শিক্ষিতের সংখ্যার বৈষম্যটা লক্ষ্য করো।"

জেহাদের বিশেষ সুফলের সংখ্যা এতো বেশি যে, প্রত্যেকটির উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সেগুলির বেশীর ভাগই হচ্ছে সে-সব পুরস্কার, যা ধর্মার্থে নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের ইসলাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। একটির অবশ্য বিশেষ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন, কারণ যাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালানো হয়, তাদের সম্বন্ধে তার বৈশিষ্ট্য আছে। এরকম হয়তো ধারণা করা যেতে পারে যে, মুসলমানদের পক্ষে জেহাদের সাফল্য নিঃসন্দেহে উপকারজনক হলেও, যাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হয়, তাদের উপকার হয় কি না, তা খুবই সন্দেহজনক। এরকম ধারণা করা ভুল। কাফের হওয়ার দরুন তারা বরাবরই পাপের মধ্যে জীবন যাপন করে এবং ক্রমাগত আল্লাহ্র বিরোধিতা করে। তারা যতো বেশি দিন এ দুনিয়ায় বাস করবে, ততো ভীষণ শাস্তি তাদের পরকালে ভোগ করতে হবে। অতএব, তাদের আয়ু কমিয়ে দিলে ভবিষ্যতের শাস্তি থেকে একেবারে নিষ্কৃতি না পেলেও তার তীব্রতা কমানো হবে।

কুরআনে দান করার প্রয়োজনীয়তা সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। দান দু'রকমের—বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক দান, মুসলমানী আইনানুসারে অবশ্য দেয় এবং তার পরিমাণ, কোন্ কোন্ সম্পত্তির উপর দেয়, কোন্ শ্রেণীর লোককে আদায় দিতে হবে, সবই আইনে সুনির্দিষ্ট। জাকাত ইউরোপের 'টাইথের[২৫] মতো, তবে তার পরিমাণ ও কোন্ সম্পত্তির উপর দেয়, সবই ভিন্ন রকমের। সাধারণভাবে বলা যায় যে, জাকাত দিতে হয় চান্দ্র বছরের উদ্বৃত্ত সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে। জাকাত দেওয়ার নিয়ম মুহম্মদ বিশেষভাবে প্রবর্তন করেন এবং যখনই কোন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতো, তখনই তারা একজন ধর্মীয় শিক্ষক ও মাশুল আদায়কারী এক সংগে গ্রহণ করতো। আবু বকরের সময় জাকাত না দেওয়া রাজদ্রোহের তুল্য অপরাধ গণ্য হতো এবং আপত্তিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত কারণ বিবেচিত হতো। এসব ধর্মীয় কর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব হিসেবে বিবেচিত হতো এবং অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের ও ধর্মীয় যুদ্ধে যোগদানকারীদের সাহায্যেই ব্যয় করা হতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুসলমান রাজ্য-বিস্তৃতির ফলে অন্যান্য যেসব মাশুল ও করাদি আদায় করা হতো, তা-ই রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহে যথেষ্ট বিবেচিত হতো। এজন্য জাকাত ইত্যাদি ধর্মীয় কর সরকার কর্তৃক আদায়ের ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং সেসব আদায় দেওয়ার দায় লোকের বিবেক জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সৈয়দ আহমদের কর্মজীবনের বহু পূর্বেই এসব

---

[২৫] Tithe হচ্ছে চার্চকে দেয় আদায়ের দশমাংশ।

ধর্মীয় কর আদায়ের সরকারী ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় এবং ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানরা এসব দ্বারা ফকীর, গরীব ছাত্র ও মুসাফিরদের সাহায্য করতে থাকেন। কিন্তু সৈয়দ আহ্মদের নীতি অনুসারে এই নিয়ম আপত্তিজনক বিবেচিত হয়। এসব ধর্মীয় কর আল্লাহ্র রাহে দেয়, অতএব মুসলমান রাষ্ট্রে শাসন-কর্তৃপক্ষকে দেওয়া বিধেয়। কিন্তু মুসলমানেরা যখন অমুসলমান রাষ্ট্রে বাস করে, তখন সেসব কর সমকালীন ইমাম বা ধর্ম নেতাকে আদায় দেওয়া উচিত, কারণ তিনি হচ্ছেন দুনিয়ায় আল্লাহ্র খলিফা। সৈয়দ আহ্মদ নিজেকে হিজরী তের শতকের ইমাম মনে করতেন এবং ন্যায্য অধিকার হিসেবে সেসব কর দাবী করতেন।[২৬]

সৈয়দ আহ্মদ যখন বাংলাদেশ সফর করেন, তখন আমাদের ধারণায় এসব ছিল তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রচারিত মতবাদ।

তিনি যখন উত্তর-পশ্চিমে সফর করতে থাকেন, তখন বাংলাদেশে তাঁর খলিফারা তাঁর সাহায্যার্থে প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। পাটনা হয় তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র এবং শাহ মুহম্মদ হোসেন স্থানীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। অসংখ্য পুস্তক ও ইস্তাহার মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এভাবে সুরক্ষিত হয়ে এই ধর্মান্ধ গোষ্ঠি ভারতীয় মুসলমানদের একত্রিত ও ভারত উদ্ধার করতে শিক্ষা দিতে থাকে। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে থাকে এবং সৈয়দ আহমদের ইমাম মেহ্দী দাবীটা প্রতিষ্ঠিত করতেও চেষ্টা করতে থাকে।

জৌনপুরের মওলবী কেরামত আলী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশাল জিলায় সফর করতে লাগলেন। পাটনার মৌলভী ইনায়েত আলী মধ্য বাংলায় তাঁর কর্মব্যবস্থা নিয়োজিত করলেন এবং পাবনা, ফরিদপুর, রাজশাহী, মালদহ ও বগুড়ায় প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন। তাঁর ভাই বেলায়েত আলী কিছুকাল বাংলাদেশে তাঁর সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল মধ্য-ভারত, হায়দরাবাদ ও বোম্বাই।

সকল মুসলমানই স্বীকার করেন যে, রোজ-কেয়ামত কখন হবে, একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। তবে সেদিন ঘনিয়ে আসার কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন আছে এবং বহু মশহুর আলেম ইসলাম ধর্মের দিক দিয়ে সেগুলির নির্দেশ দিতে চেষ্টা করেছেন, যেমন চেষ্টা করেছেন ডক্টর কিউমিং সাহেব খৃষ্টানদের জন্যে। এসব চিহ্নকে আবার ছোট ও বড় হিসেবে বিভাগ করা হয়। ছোট চিহ্ন হলো, মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হওয়া, ছোট জাতের বড়ো বড়ো পদ ও মর্যাদা লাভ করা, মানুষ রিপুর পরবশ হওয়া, সংগ্রাম-সংঘাত ও রাজদ্রোহ বৃদ্ধি পাওয়া, তুর্কীদের সংগে যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের আধিক্য। আর বড়ো চিহ্ন হলো, ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব। তিনি হবেন হযরত মুহম্মদের বংশধর এবং তাঁর নাম ও পিতার নাম হবে হযরত মুহম্মদের নাম ও তাঁর পিতার নাম। তিনি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁর প্রথম কর্মজীবন মানবচক্ষুর অন্তরালে থাকবে। শেষে তিনি মদিনায় উদিত হবেন এবং সমগ্র আরব দেশের শাসক হবেন। অতঃপর

---

[২৬] ন্যায়ের খাতিরে একথা স্বীকার করা উচিত যে, তিনি এসব অর্থ গরীরের ও তাঁর অনুগামীদের সাহায্যার্থেই ব্যয় করতেন, নিজের জন্যে নয় : কিন্তু তাঁর খলিফারা এ নিয়ম খুবই কম মেনে চলতেন।

তিনি কনস্টান্টিনোপল পুনর্দখল করবেন, কারণ তাঁর পূর্বেই সেটা নাসারাদের কর্তৃত্বে চলে যাবে। কিন্তু নববিজিত রাজ্যসমূহের স্থিতিস্থাপকতা সাধনের পূর্বেই খৃষ্টশত্রু ও তাঁর অনুচরদের আবির্ভাব হবে এবং ইমাম মেহ্‌দী এ সংবাদ পেয়ে দামেশ্‌কে উপস্থিত হবেন। তখন দামেশ্‌কের পূর্বে একটা সারা কিল্লাহ্‌র নিকটে হযরত ঈসা পৃথিবীতে নেমে আসবেন এবং মুসলমানদের তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে চালনা করে খৃষ্টশত্রুকে নিহত করবেন ও তাঁর বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবেন।

সৈয়দ আহমদের মুরীদরা শিক্ষা দিত যে, ইমাম মেহ্‌দী সম্পর্কিত এই ধারণা সাধারণের ভ্রান্তি-প্রসূত। তিনি আরব ও তুরস্ক-বিজয়ী খলিফার চেয়ে নিশ্চয়ই বড়ো হবেন। অন্যপক্ষে ইমাম মেহ্‌দী হবেন মধ্যবর্তী ইমাম, তিনি হযরত মুহম্মদের মৃত্যু ও হযরত ঈসার পুনরাবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে উদিত হবেন এবং ভারতীয়দের সাহায্যে ও তাদের বাহুবলে সারা বিশ্ব জয় করবেন। তারা আরও শিক্ষা দিত যে, গোঁড়া সুন্নীরা ইমাম মেহ্‌দীকে একজন মশহুর নেতা হিসেবে বেশি বিবেচনা করায় হযরত কর্তৃক ভবিষ্যৎবাণীতে উল্লেখিত নেতাদের বিষয় চিন্তা করেনি, আর এজন্যে সুন্নীরা হাদীসটির অপব্যাখ্যা করে ফেলেছে। হযরত মুহম্মদ ঘোষণা করেছিলেন যে, হযরত মূসার মৃত্যুর পর বারোজন পয়গম্বর যেমন পর পর জন্মগ্রহণ করে তাঁর ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ও সুদৃঢ় ভিত্তি-মূলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই রকম বারো জন খলিফাও তাঁর মৃত্যুর পর উদিত হবেন এবং ইসলাম ধর্মকেও অনুরূপ উজ্জীবিত করে তুলবেন। এরকম প্রত্যেক খলিফার ইতিকাহিনীর ইংগিত দেওয়া হয়েছে হাদীসে। তাঁরা সকলেই সমান মর্যাদার হবেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের মর্যাদানুযায়ী ধর্মীয় দুর্নীতিগুলির সংস্কার সাধন করবেন, মুসলমান জনসাধারণকে সমগ্রভাবে ঐক্য-সূত্রে বেঁধে ফেলবেন এবং হযরত মুহম্মদের সমকালীন ইসলাম বিস্তার করবেন। সেই খলিফাদের একজন হবেন ইমাম মেহ্‌দী। রসূল বলেছেন : তোমরা যখন খোরাসান থেকে কালো পতাকা আসতে দেখবে, তোমরা তাদের সংগে মিলিত হও, কারণ তাদের সংগে আল্লাহর মেহ্‌দী আছেন। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, রোজ কেয়ামতের সময় ইমাম মেহ্‌দী উদিত হবেন না, তিনি আসবেন মুহম্মদ ও ঈসার মধ্যবর্তীকালীন সময়ের ঠিক মাঝামাঝি কালে। মুহম্মদ আরও এক সময় বলেছিলেন যে, তাঁর পরেই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তা বজায় থাকবে ত্রিশ বছর কাল এবং ইমাম মেহ্‌দী আসবেন তার পরবর্তীকালে। অন্য এক সময় তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সময়ে যেমন সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই রকম হযরত ঈসার সময়ে তা লয় পাবে এবং মেহ্‌দী আসবেন মাঝামাঝি সময়।[২৭]

---

[২৭] রসূল বলেছেন : তোমরা সুসংবাদ শোনো—আমার ধর্ম বৃষ্টি-ধারার মতো। পূর্বে জানা যাবেনা, প্রথমটি ভালো, না শেষেরটি ভালো; কিন্তু বাগিচার মতো যা একজন মানুষকে সারা বছর আহার যোগায় এবং আরও অনেক বাগিচা আরও অনেক দলকে আহার যোগায় সারা বছর ধরে, অথচ প্রথম দলটি অন্যদের চেয়ে বেশী সুখে ছিলো, কিংবা ভালো ছিলো, বরাবরই সন্দেহ থেকে যায়। সে ধর্ম কখনও লয় পাবে না, আমি যার শুরু করে গেলাম, মেহ্‌দী যার মধ্যবর্তী এবং ঈসা যার শেষ ব্যক্তি।

এ রকম ভবিষ্যৎ-বাণীও করা হয়েছিলো যে, রসূলের ঠিক পরবর্তী খলিফাদের পর একদল সুলতান হবেন যারা পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয়ে ধর্মকে বিকৃত করে ফেলবেন ও মানুষকে ফেলাফতের আদর্শিক ধারা থেকে বিপথে নিয়ে যাবেন।[২৮] কিন্তু কালক্রমে তাঁরাও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাতে সব ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবেন এবং মুসলমানরাও তাদের হাতে কঠোরভাবে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হবে। তখন আসমান থেকে বৃষ্টি হবে না এবং মাটিতে ফসল ফলবে না। তারপর খোরাসানের পূর্বদিগস্থ দেশ থেকে একটি দরিদ্র জাতির আবির্ভাব হবে। তারা পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করবে এবং ধর্মের জন্য স্বেচ্ছাচারী শাসকের সংগে যুদ্ধ করবে।[২৯] কিন্তু তার পূর্বেই মেহ্দীর জন্ম হবে। বাল্যকালে তিনি অখ্যাত থাকবেন। কিন্তু সেই মানুষ যখন একটা রাজ্য জয় করে ফেলবে, তখন তিনি উদিত হবেন ও তাদের ইমাম হিসাবে গৃহীত হবেন। তিনি হিন্দুস্থান জয় করবেন।[৩০] এবং পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে পারস্য (বর্তমান ইরান) জয় করতেন আর যতোদিন তিনি জেরুজালেমের উপর নিশান উত্তোলন না করছেন, ততদিন তিনি ক্ষান্ত হবেন না।[৩১]

---

[২৮] রসূল বলেছেন : আমার পরে আসবেন খলিফারা, খলিফাদের পরে আমীররা এবং আমীরদের পর সুলতান-বাদশাহরা ও তাঁদের পর স্বেচ্ছাচারী শাসকরা। তারপর আমার বংশে একজন আসবেন, যিনি অবলুপ্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবেন ও রাজ্য জয় করবেন ইত্যাদি। তিনি আরও বলেছেন : আল্লাহ্ যতদিন ইচ্ছা করবেন পয়গম্বরের শাসন বজায় রাখবেন। আর আল্লাহ্ যখন সে শাসন তুলে দেবেন, তখন পয়গম্বরের সমান খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ও আল্লাহ্ যতোদিন ইচ্ছা করবেন তা বজায় থাকবে। তারপর বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হবে ও আল্লাহ্র ইচ্ছামতো কাল বজায় থাকবে। তারপর স্বেচ্ছাতন্ত্র বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হবে ও আল্লাহ্র ইচ্ছামতো কাল বজায় থাকবে। এবং তারও শেষ হলে পয়গম্বরের শাসনের অনুরূপ খেলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

[২৯] রসূল বলেছেন : নিশ্চয় আমার জন্যে আল্লাহ্ আমার উম্মতদের মনোনীত করেছেন রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত। আর নিশ্চয়ই আমার পরে আমার উম্মতরা ভীষণ দুর্ভাগ্যে পড়বে ও ইতস্ততঃ বিতাড়িত হবে। তখন পূর্বদেশ থেকে একটি জাতি কালো নিশান নিয়ে আসবে ও ভিক্ষা চাইবে, কিন্তু মানুষেরা তাদের কিছুই দেবে না। তখন পূর্বদেশীয় লোকেরা যুদ্ধ করবে ও জয়ী হবে। তখন তাদের প্রার্থিত জিনিস দেওয়া হবে কিন্তু তারা গ্রহণ করবে না। তারা বিজিত দেশের দখল আমার এক বংশধরকে দান করবে। তিনি দুনিয়ায় সেই ন্যায়বিচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা স্বেচ্ছাচারী রাজাদের স্বেচ্ছাচারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমার উম্মতদের যে কেউ এই সংবাদ শুনবে, তারই পক্ষে উচিত হবে পূর্বদেশীয় লোকদের সংগে যোগদান করা। যদিও বা হাঁটু পর্যন্ত বরফ জমে যায় তবুও করবে। তিনি আরও বলেছেন : পূর্বদিক থেকে একটি জাতি আসবে, তারা মেহ্দীকে আশ্রয় দেবে এবং তিনি প্রাচ্যশাসন করবেন।

[৩০] রসূল বলেছেন : আমি সকলের জন্যে হিন্দুস্থানে জেহাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আর যখন সে দিন আসবে, তখন নিজের জান-মাল কুরবান করো। যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি শহীদী মর্যাদা লাভ করবে, আর যদি ফিরে আস, তাহলে তোমার নরকাগ্নি থেকে মুক্তি লাভ হয়ে গেলো। রসূল আরও বলেছেন : আল্লাহ্ আমার উম্মতদের দু'শ্রেণীকে নাজাত দেবেন—যারা ভারতে জেহাদ করবে, আর যারা হযরত ঈসার সংগে আসবে।

[৩১] রসূল বলেছেন : যখন তোমরা খোরাসানের দিক থেকে কালো নিশান আসতে দেখবে, তখন তাদের সহগামী হও; কারণ তাদের সংগে নিশ্চয়ই মেহ্দী আছেন, তিনি আল্লাহ্র খলিফা। তিনি আরও বলেছেন : খোরাসানের দিক থেকে যে কালো নিশানগুলো আসবে, সেগুলো জেরুজালেমে প্রোথিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কিছুই রোধ করতে পারবে না।

মেহ্দীর আবির্ভাব সম্বন্ধে যে-সব চিহ্ন জড়িত, সেগুলি নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দেয় যে, হিজরী তের শতকেই তাঁর জন্ম হবে। দিল্লীর বাদশাহের শক্তি হিন্দুজাতি মারহাট্টাদের নিকট মাথা নত করেছে। মধ্যভারত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত। আউধ ও বাংলার সুন্নী মুসলমানরা বহুকাল শিয়া-শাসনাধীনে থাকার দরুন ধর্মীয় নিষ্ঠায় শিথিল হয়ে গেছে এবং বহু হিন্দু রেওয়াজ গ্রহণ করেছে।[৩২] কিছুকাল হলো খ্রীস্টান শক্তি (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, লর্ড ওয়েলেসলী ও হেস্টিংসের দক্ষতায়) ভারতে একচ্ছত্র হয়ে উঠেছে ও মালবের পাঠান দস্যুদের সব আশা-ভরসা নির্মূল করে দিয়েছে। আর শেষ কথা এই যে, পাঞ্জাবে শিখরা আজান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। চারদিক থেকেই রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিত হওয়ার চিহ্ন দেখা দিয়েছে। অতএব মেহ্দীর আবির্ভাবের সময় এসে গেছে, আর এজন্যে সৈয়দ আহমদের দাবীতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তিনি সৈয়দ এবং হযরত মুহম্মদের বংশধর। তাঁর নাম আহমদ, আর আল্লাহ্র বাণী থেকে এটা পরিষ্কার যে আহমদ ও মুহম্মদ একই নাম।[৩৩] তাঁর জন্ম হয়েছে ১২০১ হিজরীতে, অর্থাৎ হিজরীর তের শতকের প্রারম্ভে।[৩৪] তিনি মুরশিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। স্বভাবে তিনি রসূলের মতোই আর তাঁর বাল্যকাল অখ্যাতভাবেই কেটেছিল। তিনি খোরাসানের পূর্বদিকে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন একদল অনুচর নিয়ে ভারতের অমুসলমান শাসকদের সংগে জেহাদ করার জন্যে।

সৈয়দ আহমদের শিষ্যরা যে সিদ্ধান্তে এসেছিল, তা অবশ্য বিতর্কমূলক। তারা এ সিদ্ধান্তে এসেছিল নিতান্তই স্বেচ্ছাকৃতভাবে এবং যেসব হাদীস তাদের পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্তের অনুকূল ছিল, সেগুলি জোড়াতালি দিয়ে। কিন্তু এ সব করেও সেসব হাদীসের সংগে সংগতি রাখা গেল না, যেগুলি ছিল দ্ব্যর্থহীন। রসূল ঘোষণা করেছিলেন যে ইমাম মেহ্দীর পিতার নাম হবে তাঁর নামে এবং তিনি হবেন আরবের শাসক। প্রথম শর্তটি সৈয়দ আহমদের শিষ্যরা একেবারে বর্জন করলো আর শেষেরটি সম্বন্ধে তারা বিনা যুক্তিতেই দেখাতে চাইলো যে, তাদের বিশ্বাসের সংগে তার অসংগতি নেই। অবশ্য আরও কতকগুলি পৃথক কারণ ছিল, যার দরুন এই মতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাজশক্তি হিসাবে নিজেদের পতন ভারতীয় মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করলো, আর এশিয়া মাইনরে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীও তাদের অবিদিত ছিল না। তারা স্বপ্ন দেখতো নিজেদের শান্তিময় ও সার্বভৌম শাসনাধিকারের, আর ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তার সম্ভাবনা দেখতো না। বহু সুন্নী প্রকাশ্যে বলাবলি করতো, তাঁর উদয় হবে হিজরী তের শতকে (১৭৮৬-১৮৮৬ খ্রীঃ) আর শিয়ারা আরও নির্ভুল হয়ে দেখাতে চাইতো যে, হিজরী ১২৬০ সালে (১৭১৮ খ্রীঃ) তিনি উদিত হবেন। কিন্তু বছরের পর

---

[৩২] মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ সম্পর্কিত বহু অনুষ্ঠান-উৎসব হিন্দুদের থেকে নেওয়া। বিহারে বহু মুসলমান আছে, যারা আংশিক মুসলমান ও আংশিক হিন্দু।

[৩৩] "আর যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বললেন, হে ইসরাইল-বংশীয়গণ! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গাম্বর তোমাদের জন্যে; আমার পূর্বে যেসব আইন তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেগুলির সমর্থন করতে আর সুসংবাদ দিতে যে, আমার পরে একজন পয়গম্বর আসছেন, যাঁর নাম আহ্মদ"...সেল সাহেবের অনূদিত কুরআন পৃঃ ৪৪৯।

[৩৪] রসূল বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার বংশ থেকে একজনকে প্রত্যেক শতকের প্রথমে পয়দা করবেন, যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

বছর কেটে যেতে লাগলো, কিন্তু ইমাম মেহ্‌দীর আবির্ভাব হওয়ার অন্যতম প্রধান চিহ্ন খ্রীষ্টান শক্তির দ্বারা কনস্টান্টিনোপলের বিজয় দেখা গেল না, আর এজন্যে তাদের আশাও ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। সহসা সৈয়দ আহ্‌মদের আবির্ভাবে কতকগুলো চিহ্ন তো মিলে গেল, অতএব হাদীস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জনসাধারণ তাঁকে ইমাম মেহ্‌দীর প্রকৃত মর্যাদায় বরণ করে নিলো। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মানের খাতিরে একথা বলতেই হয় যে, তাঁরা এ মিথ্যা দাবীর তীব্র বিপক্ষতা করেছিলেন।

সৈয়দ আহ্‌মদের দাবীর পোষকতায় নানা ধর্মীয় জাল ভবিষ্যদ্বাণীও সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে নিম্নের কাসিদাটি মশহুর :

আমি আল্লাহ্‌র কুদরত দেখছি, দুনিয়ার অবস্থা দেখছি,
আমি জ্যোতিষবলে দেখছি না, অনুপ্রেরণায় দেখছি।
আমি দেখছি চোখ মেলে খোরাসান, মিসর, সিরিয়া, ইরানের দিকে,
আমি সবখানেই কেবল বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ দেখছি।
দুনিয়ার বহু পরিবর্তন আসছে—
হাজারের মধ্যে আমি একটাই বিশেষ লক্ষ্য করছি।
আমি একটা আশ্চর্য কাহিনী শুনছি,
আমি এই দুনিয়ার দুঃসময় প্রত্যক্ষ করছি।
চারিদিকেই দেখছি বিশাল বাহিনী লড়ছে, আর লুঠ করছে,
আমি দেখছি হীন বংশের লোক অকেজো শিক্ষা নিয়ে
আজ মোল্লা-মওলবী আলখেল্লা পরছে।
আমি দেখছি, সরদার ব্যক্তির বন্ধুরা সব
সবজাতির মধ্যে লাঞ্ছিত ও অবনত হচ্ছে।
প্রত্যেকেই দু'বার করে নওকরী পাবে, আবার হারাবে;
দারিদ্র্যে ভুগবে, তারপর আবার নওকরী মিলবে।
আমি দেখছি, তুর্কীরা ও ইরানীরা সংগ্রামে-সংঘাতে মেতেছে।
আমি দেখছি, সব শ্রেণীর লোকেরা শঠ ও প্রবঞ্চক হয়ে উঠেছে।
আমি দেখছি, ধর্মনিষ্ঠ লোকেরা দেশত্যাগী হয়েছে,
আর দেশগুলো দুষ্টলোকের আবাস হয়ে উঠেছে
শুধু একটি মাত্র সুখময় স্থান থাকবে—
পাহাড়ের অনেক উপরে সেটি থাকবে।
কারণ আমি বিপদবারণকে প্রত্যক্ষ করছি।
বহু, বহু বছর গত হলে পর—
আবার এ দুনিয়া সুন্দর হয়ে উঠবে।
আমি সিরিয়ার একজন সুশিক্ষিত মশহুর শাসককে দেখছি।
সমকালীন অবস্থার বিপরীত আমি দেখছি,
একটা যুগকে, যেটা স্বপ্নময় বলে মনে হয়।

আমি দেখছি, বারোশো বছর[৩৫] গত হলে পর
পৃথিবীতে বহু আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে।
আমি দেখছি, দুনিয়ার সুখের আয়নাখানায়
মরচে ধরে গেছে, বিবর্ণ ধূলময় হয়ে গেছে।
আমি দেখছি, জালিমের সীমাহীন অত্যাচার।
আমি দেখছি, সারা পৃথিবীটা ভরে গেছে
বিবাদ-বিসম্বাদে, অত্যাচারে ও দুঃখ-যন্ত্রণায়।
আমি দেখছি, মুনিবরা আজ গোলাম বনে গেছে,
আর গোলামরা সব মুনিবের জায়গা দখল করেছে।
আমি দেখছি, মানুষ দুঃখে ও বিপদে চুপ করে রয়েছে।
নতুন আশরফী তৈরী হবে কম ওজনের সোনা দিয়ে।
আমি দেখছি, দুনিয়ার সব শাসকরা আজ
পরস্পরের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।
চাঁদ তার চাঁদনী হারিয়ে আঁধার হয়ে যাবে,
সূর্যটাও হারিয়ে ফেলবে তার তেজ।
আমি দেখছি, সুদূরের সওদাগররা
সফরকালে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।
আমি দেখছি, তুর্কীরা অত্যাচারিত হচ্ছে।
আমি দেখছি, তরু-লতা সব ফলহীন শুষ্ক হয়ে গেছে।
আমি প্রত্যক্ষ করছি ঐক্য, সহিষ্ণুতা ও সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা।
দুঃখ করো না, আমি বন্ধুকে প্রত্যক্ষ করছি, সে আসছে।
শীতের প্রখরতা কেটে গেলে পর
বসন্ত আসে সূর্যের সব গরিমায় প্রদীপ্ত হয়ে।
তাঁর সাধনা সফল হলে পর তিনি এ জীবন থেকে চলে যাবেন,
আমি দেখছি, তাঁর পুত্র পিতাকে মনে রাখবে।
আমি পুত্রের রাজশ্রী প্রত্যক্ষ করছি।
আমি দেখছি, মহৎ বংশে তাঁর জন্ম,
তিনি সারা দুনিয়ার শাহানশাহ্।
আকৃতি ও স্বভাবে তিনি রসূলের সমতুল।
আমি দেখছি, তিনি সুশিক্ষিত ও গম্ভীর প্রকৃতির,
আমি অনুভব করছি, ঈমানের বাগিচা
পুষ্পের মধুর সৌরভে পরিপূরিত।
আমি বন্ধুর হাতে দেখছি ঈমানের ফুল।
শোনো বন্ধু শোনো! এই সুলতান চল্লিশ বছর রাজত্ব করবেন।
আমি দেখছি পাপীর পতন, সে নিষ্পাপ ইমামের

---

[৩৫] আসল কাসিদায় ছিল ৭৫০ হিজরী, কিন্তু সৈয়দ আহমদের জন্মের সংগে মিল রাখার জন্যে এরকম জাল করা হয়েছে।

দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকোতে চাইছে।
হে গাজীবর! যারা দুশমনকে হত্যা করে, তিনি তাদের বন্ধু।
তিনি তাদের ভালবাসেন, তাদের সব কাজ সমর্থন করেন।
আমি দেখছি সত্যধর্ম ও ইসলামের মহিমা
উজ্জীবিত ও শক্তিময় হয়ে উঠছে প্রতিদিন।
আমি প্রত্যক্ষ করছি নওশেরওঁয়ার ধন-দওলত,
আর সেকেন্দার শাহের অগণিত ধন-সম্পদ।
সত্য ইমাম আবার উদিত হবেন
আর সারা জাহানে রাজত্ব করবেন।
আমি দেখছি ও পড়ছি আহমদ।[৩৬]
অক্ষরগুলো শাহের নাম উদ্ভাসিত করে তুলছে।
আমি দেখছি দ্বীনের পথ হবে একমাত্র পথ,
আর পৃথিবী হবে উর্বরা।
আমি নিশ্চয় করে বলছি, তাঁর দ্বারা
সারা দুনিয়ায় শান্তি নেমে আসবে।
আমি দেখছি মেহ্‌দীকে ও ঈসাকে,
প্রত্যেকই নিজের যুগে শাহীতে বরিত হয়েছেন।
আমি সারা দুনিয়াকে দেখছি দ্বিতীয় মিসর হয়ে গেছে,
আমি সেখানে দেখছি ন্যায় শাসনের কিল্লাহ্‌।
আমি শাহের অধীনে দেখছি সাত জন আগন্তুককে,
আর তাঁরা সকলেই উপযুক্ত মানুষ।
আমি দেখছি, আল্লাহ্‌ সকলকেই করুণা করছেন।
আমি দেখছি, নিষ্ঠুর লোকের তরবারিগুলি কোষবদ্ধ,
তাদের সব মর্চে ধরে গেছে, ভোঁতা ও অকেজো হয়ে গেছে।
আমি দেখছি নেকড়ে, মেষ, বাঘ ও হরিণ
শান্তিতে সব এক সঙ্গে বাস করছে।
আমি দেখছি, তুর্কীবাহিনী নীরবে বসে আছে,
আর তাদের দুশমনরা অলস হয়ে যাচ্ছে।
আর আমি দেখছি নিয়ামতউল্লাহ্‌কে,
সকলের থেকে নির্জনে একাকী বসে আছে।

এই রকম ছিল এই বিস্তৃত পুনরুজ্জীবনের মোটামুটি রূপ। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, সমকালীন ব্রিটিশ সরকার সে সম্বন্ধে কিছুই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। বাস্তবিক এ পর্যন্ত প্রকাশিত নথিপত্র থেকে যতোদূর দেখা যায়, এখনও পর্যন্ত ওহাবী মতবাদ সম্বন্ধে সরকারের কোনো ধারণাই নেই। মিষ্টার র‍্যাভেন্‌স যে-সব সরকারী নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন, তার ১২৭ পৃষ্ঠায় এই রকম দেখতে পাওয়া যায় :

---

[৩৬] কাসিদাটিকে এখানে পরিবর্তন করা হয়েছে। আসলটিতে ছিল মুহম্মদ কিন্তু সৈয়দ আহমদের শিষ্যরা তাঁর নামানুযায়ী পরিবর্তন করে আহমদ—(অ)।

'সৈয়দ আহমদের শিষ্যরা সাধারণভাবে ওহাবী হিসেবে পরিচিত হলেও তারা এ উপাধি বর্জন করে এবং জিজ্ঞাসিত হলে নিজেদের হানাফী হিসেবে পরিচয় দেয়। বহুনিন্দিত ফরাজী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের অনেক মিল রয়েছে, আর ফরাজীরা সম্ভবতঃ বেশী গোঁড়া হানাফী তবে পার্থক্যটা মনে হয় এই যে, হানাফীরা সৈয়দ আহমদকে বলে সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষ, তাঁকে ইমাম হিসেবে স্বীকার করে না; আর বলে যে তিনি মৃত। অন্যদিকে ওহাবীরা ও সৈয়দ আহমদের শিষ্যরা ঘোষণা করে যে, তিনি ইমাম; আর নিজেই শিষ্যমণ্ডলীকে বলেছিলেন, তিনি কিছুদিনের মতো অন্তর্হিত হয়ে যাবেন, কিন্তু পুনরায় উদিত হবেন; তিনি কখনও মৃত নন। মুসলমানদের মধ্যে যারা বেশি অশিক্ষিত, তাদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ ও ইমাম মেহ্দী সম্বন্ধে ধারণা খুবই গোলমেলে; কারণ সব শ্রেণীর মুসলমানের ধারণা যে, ইমাম মেহ্দী আসবেন মহাপ্রলয় ও শেষ বিচারের দিন সমাগত হলে। আর ভুল ধারণাটার কিছুটা ওহাবীরা অস্বীকার করলেও তারা এটিকে পরোক্ষভাবে জিইয়ে রেখেছে তাদের অশিক্ষিত শিষ্যদের ধর্মীয় উন্মাদনা বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। কারণ তাদের আশা আছে বিধর্মীদের উপর বিজয় লাভের এবং দুনিয়াবী শক্তি ও শাসন প্রতিষ্ঠার, দ্বীন ইসলাম জারীর ও শেষে বেহেশতে সুখ লাভের।"

কিন্তু মওলবীদের পুথিপত্রগুলি, যে গুলিকে খুবই সাবধানে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা হতো, তা থেকে মোটেই সন্দেহ থাকে না যে, তাদের পৃথক মতামত কী ছিলো। মিষ্টার র‍্যাভেন্‌স সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেননি, তাঁর রিপোর্টের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুহম্মদ জাফরের[৩৭] রোজ-নামচার তর্জমায় এই উক্তিটুকু আছে :

> 'আমি হচ্ছি মুনশী তোফায়েল আলী মারফত মওলবী বেলায়েত আলী শাহের ঘনিষ্ঠ মুরীদ ও খাদিম। এখনও পর্যন্ত সৈয়দ আহমদের উপর আমার দ্বিধাহীন বিশ্বাস যে, তিনি মাঝামাঝি যুগের ইমাম এবং আমার আরও বিশ্বাস যে, তিনি বেঁচে আছেন। হাদীসের উক্তি মতে যুগের ইমামকে স্বীকার না করে যে কেউ মৃত্যুবরণ করবে, সে অজ্ঞতার পরলোকে যাবে। যে-সব লোক সৈয়দ আহমদের ইমামত অস্বীকার করে, তারা সকলেই ধর্মভ্রষ্ট। আল্লাহ্ পাপীদের সঠিক পথে চালনা করুন এবং ইমামের অভিব্যক্তির আলোকধারায় তারা অভিষিক্ত হোক।"

কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মতবাদ বহু পূর্বেই ডক্টর হার্কটস্ মাদ্রাজ থেকে তাঁর 'কানুন-ই-ইসলাম' পুস্তকে লোকচক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় এই সম্প্রদায়কেই নিঃসন্দেহে উল্লেখ করে তিনি বলছেন :

> "গায়ের মেহ্দীরা প্রত্যেক জিলায় বা শহরে একটা জামাতখানা তৈরী করে এবং লায়লাতুল কদরের রাত্রিতে সকলেই সেখানে সমবেত হয় এবং মেহ্দীর 'দোগানা' বা দু'রাকাত নামাজ আদায় করে। তারপর তারা সমবেত কণ্ঠে তিন বার পড়তে থাকে—'আল্লাহু ইলাহুনা মুহাম্মাদুন নবীয়ুনা আল্-কুরআন মেহ্দী আমান্না ওয়া সাদ্দাক্না" অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশক্তিময়, হযরত মুহম্মদ আমাদের নবী এবং কুরআন

---

[৩৭] মুহম্মদ জাফর ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে বিশ্বাসী কার্যনির্বাহক। তাঁর বাস ছিল থানেশ্বর ঃ তিনি মুহম্মদ শফীর নিকট নও-মোজাহেদীন ও টাকাকড়ি চালান দিতেন। আম্বালা কোর্টের বিচারে তাঁর শাস্তি হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস।

ও মেহ্‌দী খাঁটি ও সত্য। তারপর তারা এই বলে শেষ করে—'ইমাম মেহ্‌দী এসেছিলেন ও চলে গেছেন, যারা এতে অবিশ্বাস করে তারা কাফের।" সুন্নীরা এ-সব শুনে এমনভাবে ক্ষেপে ওঠে যে, তারা প্রথমে ছোট ছেলেদের লেলিয়ে দেয় খেলাচ্ছলে তাদের উপর ঢিল ছুঁড়তে, তারপর নিজেরাই তলোয়ার নিয়ে হামলা করে। বিপক্ষ দল অন্য দিকে মনে করে যে, এমন পবিত্র রজনীতে মৃত্যু শাহাদতের মর্যাদা এনে দেবে এবং তারা জীবনকে তুচ্ছ করে আত্মরক্ষার্থে দাঁড়িয়ে যায়। উপরোক্ত কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিসদৃশ ঘৃণা আজ পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে, আর এজন্যে প্রত্যেক বছরেই বহু জীবনপাত হয়ে যায়। এই লেখকও এরকম দু'তিনটি ভীষণ মারামারিতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই গায়ের মেহ্‌দীদের বিজয়ী হতে দেখেননি। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে, এসব মারামারির তদন্ত-রিপোর্টের বর্ণনানুযায়ী মৃতেরা বরাবরই মাটির দিকে মুখ রেখে পড়ে থাকে। সাধারণ লোকেরা যখন এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘোষণা যে, এটা হচ্ছে তাদের ধর্মে বিশ্বাসহীনতা, তখন তারা প্রতিবাদ করে—'না, না, তা নয়; আমাদের শহীদরা সিজদায় পড়ে আছে" এই শত্রুতার প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই : সুন্নীরা ও শিয়ারা আশা করে যে, মেহ্‌দী ভবিষ্যতে উদিত হবেন। অন্যদিকে গায়ের মেহ্‌দীরা মনে করে যে, সৈয়দ মুহম্মদ জিওনপুরী (জয়পুরী?)[৩৮] হচ্ছেন ইমাম মেহ্‌দী; তিনি ইতিমধ্যেই দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ও চলে গেছেন এবং আর উদিত হবেন না। তারা মেহ্‌দীকে পয়গম্বরের মতোই শ্রদ্ধা করে এবং বলে যে, যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তারা নিঃসন্দেহে দোযখে যাবে। এজন্যেই তাদের বলা হয় গায়ের মেহ্‌দী (মেহ্‌দী বিহীন), অথচ তারা নিজেদের বলে প্রকৃত মেহ্‌দীওয়ালে কিংবা দায়েরাওয়ালে। শেষেরটি বলার কারণ হলো এই যে, 'পীর-ই-দস্তগীর'-এর উপর তাদের কোনও আস্থা নেই। অধিকাংশ গায়ের মেহ্‌দী হচ্ছে পাঠান আদিজাতিদের মধ্যে; কিন্তু সুন্নী শিয়াদের তুলনায় তারা এতোই সংখ্যাল্প যে, তাদের বলা যায় 'গমের আটায় লবণের ছিটার মতো'।[৩৯]

ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনে যোগদান করতে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে এই অশিক্ষিত লোকদের স্বার্থ, গর্ব ও গোঁড়ামিকে উত্তেজিত করার জন্যে সবরকম যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, তারাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত প্রাচ্যদেশীয় জাতি, যারা সারা পৃথিবী জয় করবে এবং ভবিষ্যতে সৈয়দ আহমদের শাসনাধীনে তারাও শান্তিতে বাস করবে। মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা আসবে এবং সব রকম পার্থিব বিভেদ লয় প্রাপ্ত হবে। দুর্ভিক্ষ আর হবে না এবং অভাব-অনটনও আর থাকবে না। আসমান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বারিধারা বর্ষিত হবে, দুনিয়া শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে। তা ছাড়া ভারতে জেহাদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী পরিষ্কারভাবেই করা হয়েছে এবং মুহম্মদ তার ধর্মানুসারীদের ধনপ্রাণ দিয়েই এই জেহাদ সমর্থন করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। জেহাদে যারা মৃত্যু বরণ করবে, তারা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে; আর যারা প্রাণে

---

[৩৮] কিংবা হয়তো জৌনপুরী।

[৩৯] উপরোক্ত উদ্ধৃতিটুকু নেওয়া হয়েছে ১৮৩২ সালের সংস্করণ থেকে; কেবলমাত্র বানানের (ইংরাজীতে-অ) কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

বাঁচবে, তারা অবশ্যই নাজাত বা মুক্তিলাভ করবে। যারা এ বিষয়ে নিরুৎসাহী, তাদের কী শাস্তি হবে, তারও উল্লেখ করতে মওলবীরা পশ্চাদপদ হননি। এই শ্রেণীর লোকদের মৃত্যু হবে পাপী হয়েই এবং তারা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সমান শাস্তি লাভ করবে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বাশিন্দাদের থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুজাহেদীন্ এসেছিল। দাক্ষিণাত্যের বাশিন্দাদের ধর্মীয় উদ্দীপনা এতোখানি বর্ধিত করা হয়েছিল যে, মেয়েরা পর্যন্ত গহনা বিক্রি করে আন্দোলনের সাহায্যে টাকা দান করেছিল। বাঙালীরা প্রথমে পিছনে পড়েছিল; তারা স্বভাবতই ভীরু এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাশিন্দাদের চেয়ে অধিককাল স্থায়ী সরকারের অধীনেও ছিল; এজন্যে তাদের মধ্য থেকে কম সংখ্যক মুজাহেদীন এসেছিল। কিন্তু কালক্রমে তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রাধান্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেল এবং আন্দোলনটার অনেকখানি বাঙালি মুসলমানের উজ্জীবনের রূপ গ্রহণ করেছিল।

মোটের উপর আন্দোলনটা সফল হয়েছিল। সব শ্রেণীর মানুষের অভাব পূরণার্থে সেটি কার্যকরী হয়েছিল। মুজাহিদরা শহীদ হওয়ার সুযোগ লাভ করলো, আর শান্তিপ্রিয় লোকরা চাঁদা আদায় দিয়েই নাজাত বা মুক্তিলাভের পথ খুঁজে পেলো।

মওলবীদের সাম্যনীতি ও ধর্মীয় ঐক্যের প্রচারণাই ছিল নিঃসন্দেহে আন্দোলনটি সাধারণের জনপ্রিয় হওয়ার একটা প্রধান কারণ। তাঁরা শিক্ষা দিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানই পরস্পরকে দেখবে ভাই-ভাই হিসেবে। পদমর্যাদাসিক্ত ও প্রভাবশালী লোকদের বাহ্যিক অধিক সম্মান দেখানো হচ্ছে মুসলমান ধর্মে বেদাত, কারণ পয়গম্বরের জীবদ্দশায় এমন কোন রেওয়াজ ছিল না, অতএব এটি বর্জন করা উচিত। প্রত্যেক মুসলমান তার পদমর্যাদায় যাই হোক না, সাধারণ নিয়মের 'আস্‌সালামুআলায়কুম' সম্বোধনেই তাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। আর যারা বিধর্মী, তা সে হিন্দুই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক, তাকে কোনও সম্মান দেখাতে হবে না।

সৈয়দ আহমদ কর্তৃক পেশোয়ার জয়ের সংবাদটা দ্রুতগতিতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। মওলবীরা তার প্রয়োজনীয়তা বেশি করেই বাড়িয়ে দিলেন এবং আন্দোলনটাকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুললেন। কিন্তু হঠাৎ যেন আন্দোলনটা নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে ক্রমাগত পলাতকের দল আসতে লাগলো সৈয়দ আহমদের মৃত্যুবার্তা নিয়ে এবং তাঁর অনুগামীদের ছত্রভংগ হওয়ার দুঃসংবাদ নিয়ে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

বারাসতে সৈয়দ আহ্মদের শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। তাঁর বাস ছিল চাঁদপুর গ্রামে। সাধারণ গ্রামীণদের চেয়ে তিনি ছিলেন উচ্চকুলের এবং সম্ভ্রান্ত জোতদার মুনশী আমীরের সংগে তাঁর বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা ছিল। তিনি ছিলেন একজন খারাপ ও বেপরোয়া স্বভাবের লোক। ১৮১৫ সালে তিনি কলিকাতায় পেশাদার কুস্তিগীর হিসেবে বাস করতেন। পরে তিনি নদীয়ার জমিদারদের লাঠিয়াল নিযুক্ত হন। একটা মারামারিতে জড়িত হয়ে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাস থেকে খালাস পেয়ে তিনি ঘটনাক্রমে দিল্লীর শাহী বংশের একজনের দৃষ্টিপথে আসেন এবং তাঁর অনুচর হয়ে মক্কায় হজ করতে যান। সেখানে সৈয়দ আহ্মদের সংগে তাঁর পরিচয় হয়। সৈয়দ আহমদ পূর্বেই ১৮২২ সালে তথায় গমন করেছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদের মুরীদ হন। ১৮২৭ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং পূর্বের বাসগ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত হায়দারপুরে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তিনি ওহাবী মতে সংস্কার প্রচার করতে আরম্ভ করেন। সৈয়দ আহ্মদের মতো তিনি পীরপূজার নিন্দা করতেন, মাজার তৈরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলেন, মৃত ব্যক্তিদের নামে দান-খয়রাতের উপযোগিতা অস্বীকার করতেন, নিজের মুরীদদের দাড়ি রাখতে বলতেন এবং তাদের এমন এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে বলতেন যাতে সহজেই তাদের কাফেরদের থেকে পৃথকভাবে চেনা যায়। তাছাড়া তাদের তিনি নির্দেশ দিতেন নিজেদের মজহাব ছাড়া অন্য লোকদের সংগে মেলামেশা না করতে। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন তিন-চারশো ভক্ত অনুগামীদের ধর্মীয় নেতা এবং তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়লো ইছামতী নদীর পার্শ্ববর্তী নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের চার পাশের অঞ্চলে, প্রায় আঠারো-কুঁড়ি মাইল দীর্ঘ ও বারো-চৌদ্দ মাইল প্রশস্ত এলাকা জুড়ে।

এই মজহাবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হানাফী কৃষক সম্প্রদায় ও হিন্দু জমিদারকুল অত্যন্ত অসন্তোষ ও উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছিল। চাষীরা প্রতিবাদ করতো এই নয়া মজহাবের অনুসারীরা তাদের বহু শ্রদ্ধার্হ অনুষ্ঠান ও আচার-নীতি সম্বন্ধে নিতান্তই শ্রদ্ধাহীনভাবে কথা বলার জন্যে। আর প্রাচীনপন্থী জমিদারেরা সহজেই তাদের বিরুদ্ধে চাষীদের অনুযোগ শুনতেন এবং এই নয়া মজহাবের বৃদ্ধি রোধ করতে সর্বশক্তি ব্যয় করতেন; কারণ তারা মোটেই তাঁদের সম্মান দেখাতো না এবং এমন একটা দৃঢ় ঐক্যভাব দেখাতো, যার দরুন তাঁরা নিজেদের স্বার্থ ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করতেন।

সৈয়দ আহ্মদের ১৮২৯-৩০ সালের বিরাট বিজয় তার বাংলাদেশের অনুগামীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা নিজেদের আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে আরও প্রত্যয়ী হয়ে উঠলো। অতঃপর তারা নীরবে ও গোপনে কাজ করার এ-পর্যন্ত অনুসৃত অভ্যাসটা ত্যাগ করলো এবং প্রকাশ্যে অন্য ধর্মের উপর অনুদারতা জাহির করতে লাগলো। ১৮৩০ সালের আগষ্ট মাসের বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে

আসে যে, পাঞ্জাবে মালিক নামে একজন ওয়াবীকে তার জমিদার জরিমানা করেছেন ও আটক করে রেখেছেন, কারণ সে মোহররমের সময় একটা মশহুর মাজার ভেঙ্গে ফেলেছিল। ১৮৩১ সালের প্রথম ভাগে পূর্ব বাংলায় গোলযোগ ওঠে এবং এপ্রিল মাসে ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র অনুগামীরা, যারা সৈয়দ আহমদের প্রচারিত মতবাদের অনুরূপ মত পোষণ করতো, প্রকাশ্যে একটা গ্রামের উপর হামলা চালায় ও লুঠতরাজ করে, কারণ সে গ্রামের জনৈক বাশিন্দা তাদের মজহাবে যোগদান করতে স্বীকৃত হয়নি।

ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত পূর্ণার জমিদার ছিলেন কৃষ্ণরায়। ১৮৩১ সালের জুন মাসে কৃষ্ণরায়ের অত্যাচারে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর ওহাবী প্রজাদের উপর মাথাপিছু আড়াই টাকা হারে ট্যাক্‌স বসালেন এবং এটাকে দাড়ির উপর ট্যাক্‌স হিসাবে জাহির করে জ্বালাটা আরও বাড়িয়ে তুললেন। বিনা প্রতিবাদে তিনি পূর্ণা গ্রামে ট্যাক্‌স্ আদায় করলেন এবং তারপর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সরফরাজপুরে ট্যাক্‌স্ আদায় করতে গমন করলেন। কিন্তু এখানে তাঁর প্রচেষ্টা দুর্ভাগ্যক্রমে সফল হলো না। তিতুমীরের একদল অনুগামী এখানে পূর্ব থেকেই জমায়েত ছিল। একথা বলা শক্ত যে, তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই কিংবা ঘটনাক্রমে সেখানে হাজির ছিল। যা হোক তারা প্রতিবাদ জানালো এবং ট্যাক্‌স্ আদায়কারী পিয়াদাদের ধরে আটক করে রাখলো। পরিস্থিতির সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে জমিদারকে জানানো হয়। তাঁর ক্ষমতার এরকম প্রকাশ্য অবমাননায় তিনি ক্ষেপে ওঠেন এবং প্রায় দু'তিনশো অনুচর সংগ্রহ করে নিজেই সরফরাজপুর গমন করেন। একটা দাংগা বেধে যায়, কয়েকখানা ঘর লুঠ করা হয় ও একটা মসজিদ পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর উভয় পক্ষই বারাসত থানার পুলিশের নিকট ঘটনার বিষয়ে এজাহার দেয়। জমিদারের লোকেরা তিতুমীরের অনুগামীদের বেআইনী কয়েদ ও আটক রাখার ও নিজেদেরই মসজিদ পোড়ানোর জন্যে দায়ী করে। থানার মুহরী সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে হাজির হন ও তদন্ত শুরু করেন। জমিদার পলাতক হলেন এবং কিছুদিন আত্মগোপন করে সাতই জুলাই তারিখে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তখন তিনি প্রকাশ করেন যে, ঘটনার বিষয় তিনি কিছুই জানেন না এবং দাংগার সময় তিনি সত্যি সত্যিই কলিকাতায় ছিলেন। ইতিমধ্যে বারাসত থানার দারোগা ঘটনার তদন্তের ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতের কারসাজিতে সমস্তই সহসা ভিন্ন চেহারা ধারণ করলো। তখন মামলার আসল ফরিয়াদীরা ও সাক্ষীরা নিজেদেরই মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়ার ও জমিদারকে মিথ্যা অপরাধে জড়িত করার দোষে দায়ী হয়ে গেল। তিতুমীরের অনুগামীরা পলাতক হলো এবং তাদের আসল মামলার সাক্ষী দিতে হাজির হলো না, কারণ তাহলে তারাই আটক হয়ে পড়বে। এভাবে অবস্থাটা চরমভাবে সফল হয়ে গেল জমিদারের পক্ষে। দারোগা তাদের বিরুদ্ধে গরহাজির রিপোর্ট দিলেন এবং এভাবে জমিদারের বিরুদ্ধে রাহাজানি ও ঘরজ্বালানির মামলাটা সাক্ষ্যের অভাবে ফেঁসে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি উভয়পক্ষকেই কোর্টে সোপর্দ করলেন মারামারি করার অপরাধে। মামলাটিতে যেভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছিল, তাতে মনে হয়, দারোগা অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন। তিতুমীরের অনুগামীরা দরখাস্ত দিয়ে নিবেদন করে যে, ঘটনার পর আঠারো দিন পর্যন্ত কোনও পাল্টা মামলা দায়ের করা হয়নি; তারা দারোগার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

আনলো এবং অভিযোগের সপ্রমাণে সাক্ষীদের নামে সমন জারীর প্রার্থনা করলো। কিন্তু তাদের এসব দরখাস্তে মোটেই কর্ণপাত করা হয়নি এবং মামলাটা কিছুকাল চলার পর উভয় পক্ষকেই খালাস দেওয়া হয়। ওহাবীরা কিন্তু দারোগার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কয়েক মাস পরে তিনি সহসা তাদের কবলে পড়লে তারা তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মামলা শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষ ঘরে ফিরলো। কিন্তু তারপর তিতুমীরের অনুগামীদের উপর ভীষণ উৎপীড়ন করা হতে লাগলো। এরকম প্রকাশ হতে লাগলো যে, জমিদার প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মতলবে বাকী খাজনার দায়ে তাদের আটক করতে থাকেন। তিনি দেওয়ানী আদালতে তাদের নামে মিথ্যা বাকী খাজনার মামলা দায়ের করতে লাগলেন।[১] ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে মুসলমানরা তাদের মামলায় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতে কলকাতায় গেল। কিন্তু জজসাহেব তখন বাকেরগঞ্জ মামলা শুনতে গিয়েছিলেন। এজন্যে তারা কিছুই করতে পারলো না।

পূর্বে না হলেও, ঠিক এই সময় তিতুমীর জেহাদ ঘোষণার সংকল্প করলেন। কিছুকাল পূর্বে মিসকিন্ শাহ্ নামক একজন ফকীর তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ও তাঁর বাড়ীতেই বসবাস করতে থাকেন। মিসকিন শাহের অন্যান্য মুরীদরাও জমায়েত হতে লাগলো, এই মজহাবের অন্যান্য লোকদের নিকট হতে চাঁদা আদায় হতে লাগলো এবং চাউল ও আরও নানা সামগ্রী ক্রয় করে নারিকেলবেড়িয়ায় মুইজুদ্দিন বিশ্বাসের বাড়িতে জমা হতে লাগলো। সম্ভবত ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিতুমীর তাঁর অনুমাগীদের একটা ভোজ দেওয়ার অছিলায় জড়ো করলেন এবং মাসের শেষের দিকে তাঁর বহু অনুচর নানারকম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমায়েত হতে লাগলো।

কয়েকদিন কেটে গেল নারিকেলবেড়িয়া গ্রামখানিকে ঘিরে একটা মজবুত বাঁশের কিল্লাহ্ নির্মাণ করতে। ইতিমধ্যে এই জমায়েতের সংবাদ পূর্ণার জমিদারের কর্ণে পৌছালো। তিনি বেশ অনুধাবন করলেন যে, আক্রমণের প্রথম চোট উদ্যত হবে তাঁর উপরেই। এজন্যে তিনি সংগে সংগে কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করলেন কিন্তু কোনও ফল হলো না। ৬ই নবেম্বর তারিখের সকালবেলায় প্রায় পাঁচশো ধর্মান্ধ পূর্ণা আক্রমণ করতে চললো। তারা প্রথমে একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করলো, তারপর গ্রামবাসীদের দুটি গরুকে ধরে জবেহ্ করলো। বাজারের মাঝখানে, তার রক্ত দিয়ে একটি হিন্দু মন্দির অপবিত্র করলো এবং তারপর গরুর অংগ-প্রত্যংগগুলো তাচ্ছিল্যভরে ঝুলিয়ে দিল দেব মূর্তির সম্মুখে ও বাজারের কোণে-কোণে। এসব করার পর তারা সব দোকানপাট লুট করে, পথবাহী স্মিথ নামে একজন দেশীয় খ্রীষ্টানকে ধরে মারপিট করে এবং যেসব মুসলমান তাদের মজহাবে যোগ দেয়নি, তাদের বেইজ্জৎ করে। অতঃপর তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো যে, কোম্পানীর শাসন খতম হয়ে গেছে; এবং দাবী করলো যে, শাহী ক্ষমতা একমাত্র মুসলমানদেরই প্রাপ্য ও জন্মগত অধিকার; তা ইউরোপীয়রা

---

[১] পূর্বে জমিদারদের নিজস্ব কয়েদখানা ছিল এবং বাকি খাজনার দেনাদারকে নিজের কয়েদখানায় আটক রাখার অধিকারও ছিল। কৃষ্ণরায় শত্রুপক্ষকে নিজের কয়েদখানায় মিথ্যা খাজনার দায়ে আটক রাখতেন, তাদের খেতে দিতেন না এবং ভয়ংকর শাস্তি হিসেবে তাদের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে দিয়ে নাকে লংকার গুঁড়ো দিতেন। 'শ্যামচাঁদ' নামে ভীষণ বেত্রাঘাতেরও ব্যবস্থা ছিল—(অ)।

অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। মনে হয়, এ-সব ভূমিকা ইচ্ছাপূর্বক ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবেই করা হয়েছিল। বাঙালিরা বিরাট একদলে জমায়েত হলে যেসব হৈ-চৈ ও গোলযোগ উপস্থিত হয়, তার কিছুই হয়নি। বিদ্রোহীরা জংগী নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছিল এবং গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে সামরিক কায়দায় সারি বেঁধে কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছিল।

পরদিন সকালে তারা নদীয়া জিলার মধ্যে হামলা করে এবং লাউঘাটা গ্রামে প্রবেশ করে। এই গ্রামে তাদের সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল কিছু বেশি। তারা প্রথমে হিন্দুদের বস্তিতে একটা গরু জবেহ্ করে। তখন হিন্দু রায়তরা বাধা দেয় ও একটা দাংগা বেধে যায়। এই দাংগায় গ্রামের হিন্দু মোড়ল নিহত হয় এবং তার ভাই ও আরও কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হয়। তারপর বিদ্রোহীরা তাদের সদর কর্মকেন্দ্র নারিকেলবেড়িয়ায় প্রত্যাগমন করে। তার পরের কয়েকদিন কেটে গেল লাউঘাটার হত্যাকাণ্ড বিষয়ে যে দারোগা তদন্ত করতে এসেছিলেন তাঁকে খেদিয়ে ফিরিয়ে দিতে, রামচন্দ্রপুর ও হুগলী গ্রাম দুটি লুটপাট করতে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের হিন্দুদিগকে অপমান ও বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করতে। ১৪ই তারিখে তারা শেরপুরের জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ী লুট করে এবং বলপূর্বক তাঁর কন্যার সংগে নিজেদের দলপতির শাদী দিয়ে দেয়।

মনে হয়, এ পর্যন্ত বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আন্দোলনটার গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণাই জন্মেনি। অথচ পরিস্থিতির এমন সব অবস্থা হয়েছিল, যা থেকে প্রথমেই খাঁটি সংবাদ পাওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল। আক্রান্ত এলাকাটি নদীয়া ও বারাসত জিলার অংশ নিয়ে বিস্তৃত। তার মাঝে মাঝে অনেক নীলকুঠি ছড়িয়ে ছিল এবং বাগুণ্ডির সরকারী লবণগোলাও ছিল অনতিদূরে অবস্থিত। ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রথমেই বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে, তিতুমীরের অনুগামীরা নারিকেলবেড়িয়ায় জমায়েত হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি এতোই তুচ্ছ ভাবলেন যে, তিনি মনে করলেন জন দুয়েক বরকন্দাজ দিয়েই জমায়েতটাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যাবে। কয়েকদিন আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েকজন লোক মারফত যা কিছু সামান্য খবর মিললো, তাতে জানা গেল যে, বিদ্রোহীরা কয়েকটা খুন করেছে। তখন তিনজন জমাদারকে ত্রিশ জন বরকন্দাজ দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করতে। কিন্তু এই সামান্য লোকবল নিয়ে তিনি বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে অক্ষমতা জানালেন। তবে নদীয়া ও বারাসতের বাসিন্দাদের সৌভাগ্য এই যে, সেখানে আরও এমন সব ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা আন্দোলনটাকে ততো তুচ্ছ ভাবেননি। ১১ই ও ১২ই নবেম্বর তারিখে বিদ্রোহীদের সদর কর্মকেন্দ্রে নিকটবর্তী নীলকুঠির ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্মচারী মিঃ পিরন্ কলিকাতাবাসী তাঁর মালিক মিঃ স্টর্মকে পত্র পাঠান। তাতে তিনি ১০ই তারিখে অনুষ্ঠিত নৃশংস ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন, স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে অনুযোগ তোলেন এবং একথাও পরিষ্কারভাবে জানান যে, গোলযোগ নিবারণ করতে কোনও সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা না হলে সরকার ভীষণ বিপদগ্রস্ত হবে। মিঃ স্টর্ম তখনই যথাবিহিত ব্যবস্থা করলেন। ১৩ই তারিখে তিনি নদীয়ার ও বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয়কে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র দিলেন এবং তাঁর কর্মচারীর পত্রগুলি ডেপুটি গবর্ণরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন বিবেচনার জন্য। প্রথমে সরকার বিদ্রোহের অস্তিত্বই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা তো কোনও সংবাদই

পাননি, যা থেকে তাঁদের বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, এ ধরনের বিদ্রোহ হতে পারে। অতএব তাঁরা সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনও সংবাদ না পাওয়ায় এতোদূর ভীষণ বিদ্রোহের ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। কিন্তু এই ভ্রান্তি ঘুচে গেল যখন সরকারী রিপোর্ট বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে ১৪ই তারিখে কলকাতায় পৌছালো এবং ১৫ই তারিখে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে একই ধরনের পত্র পাওয়া গেল।

তখন আশু প্রস্তুতি চলতে লাগলো বিদ্রাহ দমন করতে। কলকাতা সামরিক বাহিনীর একটা অংশ বাগুণ্ডির যশোর লবণগোলায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং মিঃ আলেকজাণ্ডারকে নির্দেশ দেওয়া হলো সামরিক বাহিনীর সংগে যোগ দিতে ও বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হতে। তিনি ১৪ই তারিখে রওয়ানা হলেন এবং বাগুণ্ডিতে সহযোগিতার জন্যে বারাসতে সব রকম বন্দোবস্ত করে ফেললেন। বেলা নয়টার সময় তিনি বাদুড়িয়ায় পৌছলেন। এটা বিদ্রোহের শিবির থেকে ছয় মাইল দূরে ছিল। সেখানে দারোগা বহু বরকন্দাজ ও চৌকিদার নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। সমগ্র বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো একশো কুড়িজন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁরা শত্রুর সন্ধানে অগ্রসর হলেন। তাঁরা দেখলেন যে, পাঁচ-ছয়শো লোক নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের সামনের ময়দানে যুদ্ধার্থে দাঁড়িয়ে গেছে এবং গোলাম মাসুম অশ্বপৃষ্ঠে তাদের নেতৃত্ব করছেন। বাঙালীরা সাধারণত ভীরু জাত। মিঃ আলেকজাণ্ডার ও তাঁর দলবল কোনও ভীষণ বিরুদ্ধতার আশংকা করেননি। তাঁরা নিশ্চিত ভেবেছিলেন, ওহাবীরা সামরিক বাহিনী দেখলেই ছত্রভংগ হয়ে যাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সিপাহীদের নির্দেশ দেওয়া হয় ফাঁকা আওয়াজের টোটা ভরতে। আর মিঃ আলোকজাণ্ডার রক্তপাত এড়াবার ইচ্ছায় একাই অগ্রসর হয়ে দেশী লোকদের ভর্ৎসনা করতে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কোনও কর্ণপাত করা হলো না। বিপক্ষরা তাঁকে ও তাঁর দলবলকে ইটপাটকেল ও সমান স্তরের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলো এবং পরে গোলাম মাসুম বাহিনী নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সিপাহীরা ফাঁকা গুলী ছুঁড়লো। কিন্তু দুশমনরা সংগে সংগে তাদের ঘিরে ফেললো ও কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলো। কলকাতা সামরিক বাহিনীর জমাদার, দশজন সিপাই ও তিনজন বরকন্দাজ নিহত হয়; বারাসতের দারোগা, কলোংগা থানার জমাদার ও কয়েকজন বরকন্দাজ গুরুতরভাবে জখম হন ও বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হন। তারা তাঁদের নিজেদের কিল্লায় ধরে নিয়ে যায় ও দারোগাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মিঃ আলেকজাণ্ডার বহু কষ্টে বেঁচে যান। তিনি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে লাগলেন, আর বিদ্রোহীরা নাংগা তলোয়ার হাতে নিয়ে তাঁকে তাড়া করে ফিরতে লাগলো। শেষে তিনি বাদুড়িয়ায় উপস্থিত হন এবং একটা নৌকা ধরে যশোরের লবণগোলায় সূর্যাস্তের সময় পৌছালেন। তাঁর মুখে যুদ্ধের বিশদ বিবরণ শুনে সেখানকার রেসিডেন্ট মিঃ বারবারের চোখে-মুখে কী পরিমাণ আতংক দেখা দিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। তিনি তো সকালে মিঃ আলেকজান্ডারকে রওয়ানা করে দিয়েছিলেন এই ভরসায় যে, সিপাইদের উপস্থিতিই গোলযোগ নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিদ্রোহটা যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও গুরুতর এবং কালক্ষেপ করা মোটেই সমীচীন হবে না। লবণগোলায় যা কিছু টাকা-পয়সা ছিল সমস্তই তাড়াতাড়ি একটা নৌকায় উঠিয়ে ফেলা হলো এবং মিঃ আলেকজাণ্ডারের জিম্মায় সুন্দরবন হয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হলো। ১০ই নবেম্বর তারিখে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পেলেন, বিদ্রোহীরা লাউঘাটা আক্রমণ করেছে। ১২ই তারিখে পুলিশ সোজা তাদের অক্ষমতা জানালো সাহায্য ব্যতীত বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে। একজন দারোগা ও কুড়িজন বরকন্দাজ পাঠিয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। তারপর পুলিশের নিকট থেকে আর কোন সংবাদ আসেনি। কিন্তু ১৪ই তারিখে মিঃ স্টর্মের পত্র এসে গেল। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি যা পারলেন পুলিশ সংগ্রহ করে তাদের নিয়েই দাংগাবাজদের দমন করতে অগ্রসর হলেন। সেখানে মিঃ এনড্রুজ নামে একজন নীলকর সাহেব তাঁর চারজন কর্মচারী ও যেসব কর্মচারী সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছিল, তাদের নিয়েই তাঁর সংগে যোগ দিলেন। মোটেই কালক্ষেপ করা হলো না এবং প্রায় দু-তিনশো সশস্ত্র বাহিনী ইছামতী নদীর নীচের দিকে অগ্রসর হলো বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে। তারা ১৬ই তারিখের বিকেল পাঁচটায় বাদুড়িয়ার কুঠিতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, বিদ্রোহীরা ঐদিন সকালবেলায় কুঠিটিকে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। মিঃ পিরণ বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটকে যে সংবাদ দিয়েছিলেন, এটা হলো তার প্রতিশোধ গ্রহণ।

মিঃ আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের সংবাদও এসে গেল। কিন্তু বিদ্রোহীদের ক্ষমতা কতখানি এবং তাদের উদ্দেশ্যই বা কী, সে সম্বন্ধে ভাসা ভাসা খবর আসতে লাগলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আরও শক্তি সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত আর অগ্রসর হতে প্রথমে রাজি হলেন না। কিন্তু সংবাদদাতারা মতলব করেই তাঁকে জানালো, বিদ্রোহীরা এমন কিছু সংখ্যাধিক নয়, বা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সসুজ্জিত নয়, যার দরুন বিজয় লাভে সন্দেহ থাকতে পারে। এভাবে প্রতারিত হয়ে তিনি আক্রমণ করাই স্থির করলেন। ১৭ই তারিখের সকালে ইউরোপীয়রা হাতীর উপর সওয়ার হয়ে বাহিনী নিয়ে নারিকেলবেড়িয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখান থেকে দূরত্ব ছিল মাত্র চার মাইল। পথে বাঙালিরা একে একে সরে পড়তে লাগলো এবং দলটি যখন নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের খোলা ময়দানে উপস্থিত হলো, তখন দেখা গেল যে, মাত্র কুড়ি বা ত্রিশজন উত্তর ভারতীয় বরকন্দাজ ব্যতীত প্রত্যেক দেশীয় লোক অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ তারা দেখলো যে, বিদ্রোহীরা প্রায় এক হাজার লোক, রীতিমতো যুদ্ধসজ্জায় দাঁড়িয়ে আছে এবং খোদ তিতুমীর তাদের নেতৃত্ব করছেন। এরকম পরিস্থিতিতে আক্রমণ করা সমীচীন নয় বিবেচনা করে ইউরোপীয়রা পিছনে হটতে লাগলো। কিন্তু যেই তারা পিছন ফিরলো, তখনই বিদ্রোহীরা দ্রুত গতিতে তাদের ধাওয়া করলো এবং ধরে ফেলে নদীয়া ফৌজদারী কোর্টের নাজিরকে ও দু'জন বরকন্দাজকে হত্যা করে ফেললো। বেচারীরা পালিয়ে বাঁচতে পারেনি। বাকী সকলেই প্রাণপণে ধাবমান হয়ে ইছামতী নদীর তীরে পৌছালো ও বহু কষ্টে নৌকা ধরতে পারলো। তারপর তারা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুঁড়তে লাগলো, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। বিদ্রোহীদের একজন মাত্র মারা গেল ও একজন আহত হলো। মিঃ আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের পর ধর্মান্ধদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক দুশমনদের গুলী থেকে বিশেষভাবে হেফাজতে রক্ষিত ও নিরাপদ। তাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হলো, যখন তারা দেখলো যে, নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের বাহিনী তাদের খুবই কম ক্ষতি করতে পেরেছে। অতএব তারা অসম সাহসে সামনে অগ্রসর হলো এবং ইউরোপীয়দের নৌকাগুলি ঘিরে ফেলতে ও উপরে উঠতে চেষ্টা

করতে লাগলো। অবস্থা তখন বেগতিক দেখে ইউরোপীয়রা নৌকাগুলি নদীর অপর তীরে ফেলে দিয়ে দৌড়াতে লাগলো এবং এক মাইল তফাতে রাখা হাতীগুলির উপর উঠে পালিয়ে গেল। প্রায় ছাব্বিশ মাইল এসে তারা মূলনাথের একটা বড়ো নীলকুঠিতে আশ্রয় পায়। একটি হাতী, একটা পানসী, একটা বজরা ও অন্যান্য নৌকা বিদ্রোহীদের হাতে পড়লো। বিদ্রোহীরা পর পর দুটি যুদ্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করে উল্লসিত হয়ে উঠে ও আরও লুণ্ঠন চালাতে থাকে। তারা হুগলীর নীলকুঠি আক্রমণ করে এবং ম্যানেজারকে সপরিবারে বন্দী করে, তারপর তাদের নারিকেলবেড়িয়ার কিল্লায় নিয়ে যায় এবং তিতুমীর ও মিসকিন শাহের সম্মুখে হাজির করে। তাঁরা বন্দীদের নিকট অবিলম্বে বিনাশর্তে তাঁদের হুকুমত মেনে নিতে দাবী জানান। ম্যানেজার বুদ্ধিমানের মতো সম্মত হলেন। তিনি জিম্মী হতে রাজি হলেন এবং ভারতীয় শাসকরূপে তাঁদের অধীনে নীল চাষ করতে সম্মত হলেন। তখন তাঁরা তার বশ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ একেবারে অকেজো হয়ে পড়লো এবং বিদ্রোহীরা তাদের সমস্ত নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে উত্তরে কৃষ্ণনগরের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করলো। তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ও জমিদারদের উপর ইশতেহার জারী করে নির্দেশ দিলো তাদের হুকুমত মেনে নিতে এবং তাদের অভিযানকালে রীতিমতো রসদ যোগাতে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের রাজ্য জয়ের স্বপ্নটা রূঢ়ভাবেই ভেঙ্গে গেল।

মিঃ আলেকজাণ্ডার ১১ই নবেম্বর কলকাতায় পৌঁছেন এবং নিজের পরাজয়ের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে সরকার আর মোটেই কালক্ষয় করেননি। দেশীয় পদাতিক বাহিনীর দশম রেজিমেন্টের একটা অংশ, দুটি কামানসহ অশ্বচালিত সাঁজোয়া-বাহিনী এবং দেহরক্ষী দলের একটা অংশকে নির্দেশ দেওয়া হয় অবিলম্বে বারাসতে মিঃ আলেকজাণ্ডারের সংগে মিলিত হতে। এই বাহিনী ১৭ই তারিখের সন্ধ্যার পর বারাসত থেকে অগ্রসর হতে থাকে ও পরদিন সকাল এগারটার সময় সমগ্র অশ্বারোহী ও সাঁজোয়া-বাহিনী নারিকেলবেড়িয়ার সম্মুখে উপস্থিত হয়। পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর সংগে সমান তালে অগ্রসর হতে পারেনি। এজন্যে অশ্বারোহী বাহিনী সারাদিন গ্রামটির সম্মুখে অবস্থানের পর সন্ধ্যার সময় পিছন ফিরে আসে ও পদাতিক বাহিনীর সংগে মিলিত হয়ে ছাউনি ফেলে। ১৯শে তারিখ সকাল বেলায় সমগ্র বাহিনী একযোগে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। তারা দেখলো, বিদ্রোহীরা রীতিমত সজ্জিত হয়ে যুদ্ধার্থে ময়দানে উপস্থিত আছে এবং তাদের সম্মুখে গত রাতের নিহত একজন ইউরোপীয়ানের খণ্ডিত দেহ ঝুলানো আছে। অশ্বারোহী বন্দুকধারীরা বিদ্রোহীদের অসম সাহসে আক্রমণ সহ্য করতে লাগলো। কিন্তু মুহুর্মুহু গোলার আঘাতে তাদের দলের লোক অত্যধিক নিহত হওয়ায় তারা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো ও কিল্লাহ্‌র মধ্যে আশ্রয় নিলো। তাদের প্রায় ষাট-সত্তর জন নিহত ও সমান সংখ্যক আহত হয়। কিল্লাহ্‌টি তোপের মুখে অধিকার করা হয়।

কিল্লাহ্‌র ভিতরে বিদ্রোহীদের বন্দী করে আনা কয়েকজনকে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় স্থানীয় গ্রামগুলি ও নীলকুঠিগুলি থেকে লুঠ করে আনা প্রচুর মালামাল। এগুলো বিজয়ী সিপাহীরা লুট করে নেয়। তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন, তাঁর সহকারী

গোলাম মাসুমসহ সাড়ে তিনশো বিদ্রোহীকে বন্দী করা হয়। আলীপুর কোর্টে তাদের বিচার হয়। বিচারে গোলাম মাসুমের ফাঁসির হুকুম হয় এবং প্রায় ১৪০ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। পরবর্তীকালে মিঃ কলভিন বিদ্রোহের স্থানীয় কারণসমূহের একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন। তার উপর সরকার নিম্নলিখিত মন্তব্য করেই যথাকর্তব্য সমাধা করেন :

> মিঃ কলভিনের রিপোর্ট থেকে সন্তোষজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, 'বিদ্রোহীটা সর্বতোভাবেই সামান্য ব্যাপার ছিল' এবং 'কোনও' সময়েই তার আদি উৎপত্তিস্থান থেকে বাইরে বিস্তৃত হয়ে পড়েনি। আরও জেনে সন্তোষ লাভ করা যায়, 'দেশের কোনও বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দেয়নি।' কিন্তু যতোই সন্তোষের বিষয় হোক না কেন, 'এসব অবস্থা থেকে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হতে হয় যে, এমন সব কার্যকলাপে এতোখানি তীব্রতা ও নৃশংসতা উদ্রিক্ত হতে পারে'।

এ ধরনের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেই সরকার এই বিদ্রোহের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। সরকার বিদ্রোহীদের ভাবলেন, মাত্র অবিবেচক লোক, যাদের কাজের কোনও কৈফিয়ৎ থাকতে পারে না। তাদের ধর্মীয় মতবাদ কি ছিল এবং কি জন্য তারা এরকম ভীষণ অপরাধজনক কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়নি, কারণ, এই শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর গত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও এই বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠকালে কেউ সরকারের চরম উদাসীনতায় আশ্চর্য না হয়ে পারে না। ১৮২২ সালে সৈয়দ আহমদ ভারতের বর্তমান অমুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এতোটুকু বাধাগ্রস্ত না হয়ে এবং ১৮২৭ সালে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে অজস্রভাবে মানুষ ও টাকা-পয়সার সাহায্য প্রকাশ্যভাবেই তাঁর নিকট পাঠানো হতো। এ বিষয়ে কোনও গোপনীয়তা অবলম্বন করা হতো না। সরকার নিশ্চয়ই পাঞ্জাবে তাঁর বিজয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তবুও যখন তাঁর অনুগামীরা আত্মবলে বলীয়ান হয়ে কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল তখনও সেটাকে মাত্র দুর্বোধ্য গোলযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হলো, আর বিদ্রোহীদের আখ্যা দেওয়া হলো নির্বোধ ও অবিবেচক এবং কোনও ষড়যন্ত্র বা অভিসন্ধি সাধনে অক্ষম।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সংবাদ যখন পাটনায় পৌছালো, তখন মওলবী ইনায়েত আলী দাক্ষিণাত্যে ও নিম্নবংগে প্রচারকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ পাটনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং অতঃপর কী কর্তব্য হবে, সে বিষয়ে গভীর আলোচনা করলেন। সৈয়দ আহমদের মৃত্যু ভীষণ দুর্ভাগ্য বিবেচিত হয়েছিল। শুধু নেতা হিসেবেই ছিল তাঁর ক্ষতি অপরিসীম। তিনি ছিলেন যুদ্ধ-বিশারদ এবং আমীর খানের অধীনে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তার ফলে সৈন্য যোজনায় তাঁর পারদর্শিতা জন্মেছিল। আর কোনও নেতা তাঁর অভাব পূরণের উপযুক্ত ছিলেন না। মওলবী ইসমাইলও বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর সংগে শহীদ হন, আর মৌলবী আবদুল হাই কিছু পূর্বেই দিল্লীতে

জান্নাতবাসী হন। কিন্তু পাটনার মওলবীদের বিবেচনায়, সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর দরুন অবস্থার সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে সমকালীন পরিস্থিতি লক্ষ্য করা দরকার। তাঁর অনুগামীরা প্রথম থেকেই দুটি বিরুদ্ধ দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, আর এজন্যে এ দুটির মধ্যে ঐক্যসাধনই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা। স্বীকৃত ইমাম হিসেবে তাঁর মর্যাদা এবং সম্প্রীতি আনয়নে অসীম ক্ষমতার বলে তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য কারণেই তাদের মধ্যে পুনরায় বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তারও যথেষ্ট চিহ্ন দেখা যেতো। একদিকে তাঁর শিষ্যদলের এক বিরাট অংশের নেতৃত্ব করতেন মওলবী আবদুল হাই ও মওলবী কেরামত আলী জৌনপুরী। তাঁদের বিরুদ্ধ দলের নেতৃত্ব করতেন মওলবী ইসমাইল, যিনি চার ইমাম—আবু হানিফা, আবু শাফী, মালিক ও ইবনে-হাম্বলকে অনুসরণ করার সার্থকতা বরাবরই অস্বীকার করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করার অধিকার চরমভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতেন। সৈয়দ আহমদ ছিলেন মধ্যপন্থী। তিনি সর্ববিধ ধর্মীয় বিধি ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করতেন হানাফী মহজাবের অনুবর্তী হিসেবে কিন্তু সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি নয়া ফকীরের তরিকা সৃষ্টি করে নীরবে মওলবী ইসমাইলের অনুসারীদের অনুমোদনও করতেন। "তাঁর এই মোহাম্মদী তরিকার চিন্তা মৌলিক কিছু নয়। আসলে সকল মুসলমানই মোহাম্মদী দ্বীন অর্থাৎ মুহম্মদের ধর্মের অনুসারী।" আবদুল ওহাব যখন আরবে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন, তখন তিনি প্রচলিত সব মজহাবকে অস্বীকার করেন এবং নিজেকে কেবল মুসলমান হিসেবে প্রচার করেন। তিনি নিজেকে একজন নয়া ধর্মপ্রবর্তক হিসেবে জাহির করতে, কিংবা একটা নয়া মজহাব সৃষ্টি করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। একজন ফকীরের ধর্মে এতো গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যে-সব মশহুর ফকিরী প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠাতার কোনও একটি বৈশিষ্ট্যের জন্যেই সে নামে আখ্যাত হয়েছে, যেমন কাদিরীয়া নামাংকিত হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা আবদুল কাদিরের নামানুসারে। সৈয়দ আহমদ দাবী করতেন, তিনি মুহম্মদেরই পদাংক অনুসারী, আর এজন্যেই তিনি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন মোহাম্মদী তরিকা নামাংকিত করে। আর তাঁর উদ্দেশ্য ছিল "মুসলমানদের জন্য সেসব আচার-নীতির প্রবর্তন করা, যেসব মুহম্মদের সময়ে প্রচলিত ছিল।" এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু আন্দোলনটিকে ধ্বংসের মুখে এনে দেয়। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, হানাফী আলেমরা ঘোষণা করলেন, ইমামের দ্বারাই জেহাদ চালানো সম্ভব, অতএব সৈয়দ আহমদের মৃত্যু হয়ে থাকলে জেহাদ বন্ধ করতে হবে। এসব বিষয় পাটনার মওলবীদের নিশ্চয়ই চিন্তান্বিত করে থাকবে, কারণ তাঁরাই ছিলেন সৈয়দ আহমদের মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী। সৈয়দ আহমদের মুরশিদ হিসেবে আবির্ভাব হওয়ার বহু পূর্বে তাঁরা জনৈক আবদুল হকের মুরীদ ছিলেন। তিনি ছিলেন বেনারসবাসী গোড়া ওহাবী। তাঁর প্রথম জীবনে নাম ছিল গোলাম রসুল। কিন্তু ওহাবী মতে দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি এই ধর্মবিগর্হিত নাম বর্জন করে নাম গ্রহণ করেন আবদুল হক। তারপর তিনি মক্কায় গমন করেন। সেখানে বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণের দরুন তিনি তুর্কী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে পতিত হন। তাঁকে বন্দী করার আদেশ দেওয়া হয়,

কিন্তু গোপনে তিনি নজদে পলায়ন করেন। তখন নজদ ছিল আরবের মধ্যে ওহাবী অঞ্চল। নজদে কিছুকাল বসবাস করে তিনি বেনারসে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি নজদী শেখ হিসেবে সুপরিচিত হন এবং মুরীদ করতে আরম্ভ করেন। মওলবী বিলায়েত আলী তাঁর প্রথম দলের মুরীদ।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ আহমদ বিশেষভাবে ছোট-খাটো বিভেদগুলি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষার মোটামুটি সার কথা এই যে, তিনি ছিলেন একান্তভাবে আল্লাহ্-নির্ভর, আর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই ইমাম মেহ্দী—হিজরী তের শতকের একমাত্র নেতা। তাঁর যেসব খলিফা এ মতবাদ প্রচার করতেন, তাঁদের মধ্যে বিলায়েত আলী ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সাধারণ্যে এ মতবাদ কেবল মুখেই প্রচার করতেন না, এর সমর্থনে একখানা পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। এখন সৈয়দ আহমদ যদি সত্যই মৃত হন তাহলে দুনিয়া তাঁকে ভণ্ড আখ্যা দেবে। এজন্যে প্রথম থেকেই তিনি সৈয়দ আহমদের মৃত্যুসংবাদ অস্বীকার করতেন। তাঁর মুরশিদের কয়েকটি বাণী তাঁর স্মরণ হলো, আর সেসবের বলে তিনি এসব মিথ্যা বিবেচনা করতেন। সৈয়দ আহমদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি বহু জয়লাভ করবেন, আর কাফেররা যতোবারই পরাজিত হবে, ততোবারই তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ রটনা করবে তাঁর অনুগামীদের হতোদ্যম করতে ও তাদের উৎসাহে ভাটা দিতে। এখন তো সেই অবস্থাই উপস্থিত হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সৈয়দ আহমদ ছিলেন পেশোয়ারের শাসক; এখন গুজব আসছে যে, তিনি মৃত ও তাঁর অনুগামীরা ছত্রভংগ; এসব অবিশ্বাস্য, বিশ্বাসেরই যোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে যা কিছু সন্দেহ ছিল সবই অবশ্য দূর হয়ে গেল কয়েকদিন পরে উত্তর-পশ্চিম থেকে খবর পাওয়ায়, আর তার দ্বারা মওলবীদের প্রথম ধারণা সঠিক হওয়ার বিশ্বাসও ঘনীভূত হয়ে গেল।

সৈয়দ আহমদ যখন বালাকোটে পরাজিত হন তখন মওলবী কাসিম[২] একদল বাহিনী নিয়ে মুজফ্ফরাবাদ আক্রমণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতে সে অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। মওলবী কাসিম ফিরে আসেন, যুদ্ধ থেকে পলাতক জেহাদীদের একত্রিত করেন এবং সৈয়দ আহমদের পরিবারদের নিয়ে সিত্তানায় গমন করেন। এই গ্রামের মালিক ছিলেন সৈয়দ আহমদের অন্তরংগ বন্ধু সৈয়দ আকবর। সেখানে মওলবীদের এক মজলিস বসে এবং স্থিরীকৃত হয় যে, আপাততঃ জেহাদ বনায়ের অঞ্চলের তখ্তাবন্দেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কারণ এই গ্রামটিতে সৈয়দ আহমদের বংশ ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। অতঃপর তদন্ত শুরু হয় কীভাবে সৈয়দ আহমদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোনো কোনো জেহাদী প্রকাশ করে, তারা তাঁকে শহীদ হতে স্বচক্ষে দেখেছে। আবার অনেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলো, তিনি মরেননি। তারা সাক্ষ্য দিল, ভীষণ যুদ্ধের সময় একটা ধূলিমেঘ ইমাম সাহেবকে ঘিরে ফেলে; তারপর আর তাঁকে জীবিত দেখা যায়নি, তাঁর মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। মওলবী কাসিম ছিলেন শেষের

---

[২] মওলবী কাসিম ছিলেন দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথের বাসিন্দা ও সৈয়দ আহমদের একজন বিশ্বস্ত খলিফা। মুরশিদের মৃত্যুর পর তিনি প্রধানতঃ পার্বত্য অঞ্চলেই বাস করতেন ও জেহাদে সাহায্য করতেন। ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে ও কারাবাসেই তাঁর মৃত্যু হয়, সম্ভবতঃ ১৮৫১ সালে। জয়নাল আবেদীন পরে তাঁকে উল্লেখ করেছেন কাসিম কাজ্জাব' বা মিথ্যুক কাসিম হিসেবে।

দলের। তিনি শীঘ্রই ভারতের অন্যান্য খলিফার নিকট পত্র পাঠালেন। তার মধ্যে তিনি বালাকোটের বিপর্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিলেন, মুজাহিদদের ইমাম সাহেব অদৃশ্য হওয়ার দরুন বর্তমান শোচনীয় অবস্থা জানালেন এবং সাহায্য চেয়ে পাঠালেন আরও মানুষ ও টাকা-পয়সার। এ থেকেই পাটনার মওলবীদের সৈয়দ আহমদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস এখন দৃঢ়ীভূত হলো।[৩] তাঁরা ভাবলেন, তিনি তো জীবদ্দশাতেই নিজের অদৃশ্য হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব তাঁরা নতুন উদ্যমে জেহাদ প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে, আল্লাহ্ ইমাম সাহেবকে লোকচক্ষু থেকে গোপন করে একটা পর্বত গুহায় লুকিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা যখন একত্রিত হয়ে ধর্মে আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ ঐক্যভাবে জেহাদ পরিচালনা করবে তখন আবার তিনি উদিত হবেন ও পূর্বের মতো তাদের বিজয়ের পথে চালনা করবেন। এসব প্রচারণা শ্রবণেচ্ছু সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং যে আন্দোলনটা বালাকোটে ধ্বংস হয়ে গেছে মনে হয়েছিল, সেটা আবার নয়া উদ্যমে জেগে উঠলো।

একজন ইউরোপীয়ের নিকট এটা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, মাত্র এরকম উক্তি সহজে বিশ্বাস করা যাবে এবং সেটাকে জেহাদের উদ্দেশ্যে কাজেও লাগানো যাবে। সে স্বভাবতই ধারণা করবে যে, এরকম আজগুবি ও অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনার আগে লোক নিশ্চয়ই সম্ভাব্য বলিষ্ঠ প্রমাণ চাইবে। আর সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও পাশ্চাত্য মানসকে এরকম মায়াকাহিনী বিশ্বাস করানো নিশ্চয়ই অসম্ভব, কোনও পরিমাণ সাক্ষ্যেই তা সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলমানের নিকট এর কিছুই অবিশাস্য নয়। তার সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুরাকাহিনীর সংগে এর দস্তুর মতো সংগতি আছে এবং প্রথম শুনেই সম্ভব ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। এজন্যে সামান্য মাত্র সাক্ষ্যেই সে বিশ্বাস করে বসবে। আর এরকম ঘটনা তো পূর্বেও ঘটেছিল। একথা সকলেরই জানা যে, হযরত ইউনুস[৪] কিছুকাল অদৃশ্য হয়েছিলেন এবং একটা বৃহৎ মাছের পেটে লুক্কায়িত ছিলেন। হযরত মুসাও অদৃশ্য হয়েছিলেন, যখন তিনি সিনাই পর্বতে উঠে 'তওরাত' গ্রহণ করেছিলেন[৫] মহান নেতা জুলকারনাইন[৬] ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্দী করে তাদের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস বন্ধ করেছিলেন এবং তিনিও প্রায় একই অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের ধর্মহীন অনুগামীদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এবং পুনরায় তাঁদের আবির্ভূত হতে অনুমতি দিয়েছিলেন যখন তাঁরা অনুতাপ করেছিলেন ও স্ব স্ব ধর্মমতে নিষ্ঠাবান হয়েছিলেন। হযরত ঈসাও মরণের হলাহল পান করেননি। এখনও তিনি আসমানে

---

[৩] বিলায়েত আলী প্রচার করেন যে, তিনি সৈয়দ আহমদকে নিজের অদৃশ্য হওয়ার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুনেছেন। কেরামত আলী জৌনপুরী এ উক্তির সত্যতা অস্বীকার করেন এবং তার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কাহিনী বলেন : একবার সৈয়দ আহমদের এক মুরীদ তাঁকে বলে যে, আল্লাহ্ তাঁকে যেমন জীবদ্দশায় কেরামত দেখাবার শক্তি দিয়েছেন, সেই রকম কেরামত তিনি মৃত্যুর পরও দেখাবেন। এ কথার জওয়াবে সৈয়দ আহমদ প্রার্থনা করেন, যেন তাঁর কবর মুরীদানের নিকট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে সেটাকে আর ভক্তি বা পূজা করার সম্ভাবনা থাকবে না।

[৪] ইউনুস বাইবেলে জোনাহ্ নামে উল্লিখিত। [কুরআনে আছে : অতএব মাছটি (তাঁকে) মুখে টেনে নিলো। ৩৭ ঃ ১৪১-অ]।

[৫] কুরআন, সুরা ৭ : ১৪২-৪৫ ও ২ : ৫৩—অ।

[৬] জুলকারনাইন কুরআনের বহু ভাষ্যকারের মতে তিনি ছিলেন মহান আলেকজাণ্ডার; অন্য মতে বিশ্বাস যে, তিনি হযরত ইবরাহিমের সমকালীন একজন রাজা ও পয়গম্বর—সেল সাহেবের অনূদিত কুরআন, ২৪৬—৭ পৃ।

জীবিত আছেন এবং পুনরায় খ্রীষ্ট শত্রুর সংগে যুদ্ধ করতে ধরাধামে উদিত হবেন। ভারতীয় মুসলমানরা পরিষ্কারভাবেই ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অতএব এটা এমন কিছু অযৌক্তিক ধারণা নয় যে, মধ্যবর্তী ইমাম সাহেব সমভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

সৈয়দ আহ্মদের ক্রমাগত অনুপস্থিতিতে একজন সরদার নির্বাচন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে জেহাদ পরিচালনার জন্য। এই নির্বাচনের ভার ছিল ভারতীয় খলিফাদের উপর। তাঁরা দলে দলে দিল্লীতে একত্রিত হলেন ও মওলবী নাসিরউদ্দীনকে নির্বাচন করেন। আরও স্থিরীকৃত হলো যে, তিনি টংক ও সিন্ধুর[৭] মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে বনায়েরের তখ্তাবন্দে অবস্থিত মুজাহিদ বলে যোগদান করবেন।

নাসিরউদ্দীন মাত্র কয়েকজন অনুগামীসহ দিল্লী ত্যাগ করেন। টংকে বহু নও-মুজাহিদ তাঁর সংগে যোগ দেয় এবং তিনি বহু অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা পয়সা সাহায্য পেলেন। সেখান থেকে তিনি সিন্ধুর শিকারপুরে গমন করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, শিখদের সংগে মোকাবিলা করার উপযুক্ত বাহিনী সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত নড়বেন না। ১৮৩৩ সালে সৈয়দ আহ্মদের পরিবারবর্গ এবং তখ্তাবন্দে পলাতক তাঁর বাকি সৈন্যরা নাসিরউদ্দীনের সংগে যোগ দিল। মুজাহিদরা সিন্ধুতে প্রধান বাহিনীর সংগে থেকে গেল, কেবল সৈয়দ আহ্মদের পরিবারবর্গ টংগে ফিরে গেল। সিন্ধুর আমীররা ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোঁড়া এবং তাঁরা অমুসলমান শাসক গোষ্ঠীর উপর খড়গহস্ত ছিলেন। তাঁরা আমাদের দূতদের ঘৃণা করতেন ও তাঁদের সংগে অপমানকর ব্যবহার করতেন। তাঁরা শিখদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ভীতির চক্ষে দেখতেন, আর রণজিৎ সিংহ ছিলেন তাঁদের ও ওহাবীদের সমান শত্রু। আর এটাও ছিল সর্বজনবিদিত যে, রণজিৎ সিন্ধু আক্রমণের শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এজন্যে আমীররা সম্ভবতঃ ওহাবী নেতাদের সাহায্য চেয়ে থাকবেন অধিকৃত অঞ্চল রক্ষা করতে। কারণ যাই হোক না কেন, নাসিরউদ্দীন শিকারপুরেই অবস্থান করতে লাগলেন এবং পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে জেহাদ চালানোর ইচ্ছা আপাততঃ ত্যাগ করলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগলো। সারা বাংলাদেশ থেকে অজস্র নও-মুজাহিদ ও টাকা-পয়সা আসতে লাগলো। তবু তিনি বহুদিন নিষ্ক্রিয় বসে রইলেন এবং হাজারার বিরুদ্ধে একটা উল্লেখের অযোগ্য অভিযান ব্যতীত কখনও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। কিন্তু উত্তেজনার সময় ঘনীভূত হতে লাগলো। লর্ড অকল্যাণ্ড যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন শাহ্ শুজাকে কাবুলের লোকদের উপর জোর করে বাদশাহ্ করতে, তখন দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজদের সংগে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং ওহাবীদের আমন্ত্রণ করলেন এই জেহাদে যোগ দিতে। নাসিরউদ্দীন দোস্ত মুহম্মদকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হলেন, কিন্তু অনেক মওলবী তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন এবং নিজেদের অনুচরদের নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। প্রায় এক হাজার লোক নাসিরউদ্দীনের সংগে রইলো। তাদের নিয়েই তিনি কাবুল যাত্রা করলেন এবং দাদুরের নিকট গেলে তিনশো বাছা বাছা যোদ্ধা পাঠালেন আমীরকে সাহায্য করতে। তাদের পাঠানো হলো গজনীর রক্ষা-ব্যবস্থায় সাহায্য করতে। কিন্তু ইংরেজ বাহিনী কিল্লাহটি আক্রমণ ও দখল করার সময় তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেয়। তারপর কাবুল শীঘ্রই ইংরেজদের হস্তগত হলো, আর হতোদ্যম ওহাবীরা ছত্রভংগ হয়ে হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।

---

[৭] টংক ও সিন্ধু ছিল মুসলমান রাষ্ট্র এবং এই দু'জায়গায় সৈয়দ আহ্মদের অনুগামীরা ছিল সংখ্যাবহুল। টংকের নওয়াব ও সিন্ধুর কয়েকজন আমীরও তাঁর মুরীদ ছিলেন বলে কথিত।

সিন্ধু হতে ওহাবীরা ছত্রভংগ হয়ে গেলে গোলাম কাসিম পাহাড়িয়া অঞ্চলে ফিরে গেলেন এবং সৈয়দ আহমদের খলিফা হিসেবে প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন। তিনি প্রধানত বাস করতেন কাগানের কাওয়াই নামক স্থানে। কাগানের আমীর জামীন শাহ ও নওবত শাহ তাঁর মুরীদ হন। কাবুল থেকে ওহাবীরা আপন আপন গৃহে ফিরে যাওয়ার কিছুকাল পরেই গোলাম কাসিম নেতাদের নিকট সংবাদ পাঠান, ইমাম পুনরায় উদিত হয়েছেন এবং ইচ্ছা জানিয়েছেন যে, পুনরায় শিষ্যদের সংগে তিনি মিলিত হয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালনা করবেন। সৈয়দ আহমদর নামাংকিত হয়ে বিভিন্ন খলিফার নিকট চিঠি পাঠানো হলো, তাঁদের আহ্বান জানানো হলো অনুগামীদের নিয়ে মুরশিদের সংগে যোগদান করতে। পাটনার খলিফারা শীঘ্রই এ আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং বৃটিশ ভারত থেকে পুনরায় দলে দলে কাফেলা পাহাড়িয়া অঞ্চলে আসতে লাগলো। ইনায়েত আলী শীঘ্রই উপস্থিত হলেন ও নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পরিচালনায় জেহাদীরা শিখদের আক্রমণ করলো ও বালাকোট থেকে বিতাড়িত করে দিলো।

বালাকোটের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাগান। নজফ খাঁ সেখানকার শাসনকর্তা ও ওহাবীদের বন্ধু। শিখরা তাঁর এলাকা হস্তগত করে নেওয়ায় এখন তিনি ইনায়েত আলীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যেসব মওলবী ইনায়েত আলীর সংগে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হায়দরাবাদের মওলবী জয়নুল আবেদীন। বিলায়েত আলী যখন প্রথম দাক্ষিণাত্য সফর করেন তখন তাঁর সংগে জয়নুল আবেদীনের পরিচয় হয়। জয়নুল আবেদীন তাঁর প্রচারকার্যে মুগ্ধ হন এবং গোঁড়া ধর্মান্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ মানসের আবেগপ্রবণ মানুষ এবং সর্বশক্তি দিয়ে তিনি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর উৎসাহ লক্ষ্য করে বিলায়েত আলী তাঁকে পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে প্রচারকার্যে পাঠিয়ে দিলেন। সিলেট ও ঢাকা জেলায় তাঁর শিষ্যসংখ্যার আধিক্য থেকেই প্রচারক হিসেবে তাঁর সাফল্যের প্রমাণ মেলে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে ইমাম সাহেবের সংগে যোগদানের আদেশ পেয়েই তিনি তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং পিছনে চললো তাঁর এক হাজার অনুগামী, নজর এড়াবার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে। সেখানে উপস্থিত হলে একদল জেহাদী দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় শিখদের বিরুদ্ধে নজফ খাঁকে সাহায্য করতে। কিন্তু পরাজিত হয়ে তিনি বালাকোটে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি সেনা নায়কের কাজ ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ থেকেও অবসর গ্রহণ করেন।

এ পর্যন্ত ইমাম সাহেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে জেহাদীবাহিনী চালানার ভার গ্রহণ করেননি। তাঁর সম্বন্ধে বলা হতো যে, তিনি কাওয়াইএর নিকট কোনো একটা পাহাড়ের গুহায় বাস করছেন, কিন্তু পাহাড়টিকে কঠিন পাহারায় ঘিরে রাখা হতো এবং কোনও জেহাদীকে তার ধারে কাছে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু জয়নুল আবেদীন একবার মুর্শিদের সংগে সাক্ষাৎ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তখন সব ভয় ও বাধা তুচ্ছ করে গুহায় তাঁর মুর্শিদের অবস্থান করার কথা, সেখানে জোর করে প্রবেশ করলেন। এবং তিনি সেখানে দেখলেন, খড়ে তৈরী তিনটি মাত্র মূর্তি সেখানে বিদ্যমান, একটি সৈয়দ আহমদের ও দুটি তাঁর খাদিমদের।

ধর্মীয় উৎসাহে তীব্র আঘাত লাগলো। তিনি এই অভিশপ্ত স্থান থেকে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন এবং অনুগামীদের এই ভয় দেখিয়ে জেহাদ করতে নিষেধ করলেন যে,

মওলবী কাসিম ও মওলবী কাদিরের[৮] মতো মূর্তি পূজকদের সংগে থেকে জেহাদ করা হলো কাফেরের কাজ। এই সময় তিনি কলকাতায় জনৈক বন্ধুর নিকট নিম্নলিখিত যে পত্রখানি লেখেন, তাতে লোককে সৈয়দ আহমদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ধোঁকাবাজি করা হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় :

> 'আস্সালামু-আলায়কুম—আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশিস আপনার উপর বর্ষিত হোক। অধীনের আরজ এই যে, বিলায়েত আলীর শিক্ষায়, ঈমানে ও ইসলামে কোনও রকম বেদাত আমদানী করা এ অধীন অবিমিশ্র পাপ হিসেবেই বিবেচনা করে এবং সে-সব বর্জন করা ধর্মীয় নির্দেশ হিসেবেই গণ্য করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমার পীর মওলবী বিলায়েত আলীর সততায় নির্ভর করতুম, আর এজন্যে যুক্তি বহির্ভূত একটা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আমি একটা অতি পরিচিত স্থানে যাই। সেখানে যেয়ে ইমাম হুমামের উপযুক্ত কোন কিছুরই অস্তিত্ব সেখানে নেই। অন্যপক্ষে কাসিম কাজ্জার দ্বারা প্রবঞ্চিত করিম আলী আমাদের শিবিরে আসে মোল্লা কাদিরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এবং বলে, আমীরুল মুমেনীন শেখ ওয়ালী মোহাম্মাদকে এতদূর মিথ্যুক বলেছেন যে, সে বলে বেড়ায়, যদি রণজিৎ সিংহ কবর থেকে উঠে আসেন ও অনুতাপ করেন, তাহলে ইমাম সাহেব তাঁর রাজতখ্তে বসবেন এবং শূন্যে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন, ঠিক যেমন ফিরতেন বাদশাহ সোলায়মান। মোল্লা কাদির ঈদ-উজ-জোহার পূর্বে বলেছিলেন পয়গম্বর সাহেব ও সমস্ত আলী ইমাম সাহেবের সংগে বসেছিলেন ও তাঁকে বলেছিলেন , 'ওঠ! কাফেরবাহিনী যে বালাকোটে এসে গেল।' তখন ইমাম বললেন, "আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া আমি উঠতে পারিনে।" শেষে পয়গম্বর সাহেব নিজেই তাঁকে উঠতে বললেন, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন, "বান্দার সে ক্ষমতা নেই।"
>
> "মোল্লা কাদির সৈয়দ আহমদের একটি মূর্তি তৈরী করেছিলেন এবং সেটি কোনও মানুষকে দেখবার আগে সকলের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, কেউ তাঁর হাতে হাত মিলাতে কিংবা তাঁর সংগে কথা বলতে চেষ্টা করবে না, কারণ এরকম চেষ্টা করলেই ইমাম সাহেব পুনরায় চৌদ্দ বছরের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। সব মানুষই দারুণ অভিভূতি হয়ে দূর থেকে প্রাণহীন মূর্তিটাকে দর্শন করতো এবং সালাম করতো। কিন্তু কোনও জওয়াব মিলতো না। এদিকে লোকেরা তাঁর হস্তমর্দন করতে উৎসুক হয়ে উঠতো। কিছুদিন গত হওয়ার পর লোকেরা একটা ছলনায় সন্দেহ করতে লাগলো এবং ইমামের হস্তধারণ করতে জিদ করতে লাগলো। কিন্তু মোল্লা কাদির তাদের সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, কেউ যদি আগে খবর না দিয়ে ইমাম সাহেবের হস্তধারণ করতে চেষ্টা করে, তাহলে মিয়া আবদুল্লাহ্ সাহেব[৯] তাকে পিস্তল ছুঁড়বে। কিছুকাল পরে মোল্লা দেখলেন, আমি মোটেই ভীত নই, আর লোকেরা ইমাম সাহেবের হস্তধারণ না করে ক্ষান্ত হবে না। তখন তিনি বলতে লাগলেন যে, ইমাম হুমাম এই আদেশ

---

[৮] মোল্লা কাদির ছিলেন পার্বত্য অঞ্চলে কাগানের অধিবাসী ও সৈয়দ আহমদের অন্যতম খলিফা।

[৯] মিয়া আবদুল্লাহ্ ছিলেন সৈয়দ আহমদের খাদিম এবং তিনিও প্রভুর সংগে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

> দিয়েছেন : লোকেরা আমায় দেখেই সন্তুষ্ট নয়, তারা আমার হস্তমর্দন করতে চায় এবং আমার সংগে কথা বলতেও চায়। তাদের যে অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে, তা পেয়ে তারা ধন্য নয়। এজন্যে ন্যায়বান আল্লাহ্ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আর আমি যতোদিন মুজাহদ-বাহিনীর নেতা হিসেবে যোগদান না করছি, ততোদিন আমি আর তাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছিনে। এরপর মূর্তিটাকে আর দেখা যায়নি। আরও কিছু দিন পর মোল্লা তোরাব এবং কাবুল ও কান্দাহার থেকে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন এবং এই প্রতারণা প্রকাশ করে দেন। তখন বহু অনুনয়-বিনয়ের পর মোল্লা কাদিরকে রাজী করানো হলো মূর্তিটা একবার সকলকে দেখাতে। তারা মূর্তিটাকে পরীক্ষা করে দেখলে, সেটা ছাগলের চামড়ায় ঘাসে ভর্তি এবং কয়েকখানা কাঠ, চুল প্রভৃতি দিয়ে মানুষের অবয়ব তৈরী করা হয়েছে। তখন এই বান্দা কাসিম কাজ্জাবকে এর কারণ জানাতে বলে। সে বলে, এটা ঠিক বটে, তবে ইমাম হুমাম একটা কেরামত দেখিয়েছেন, আর সেজন্যেই এসব অবিশ্বাসী লোকদের সম্মুখে তৈরী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। এর পর মোল্লা কাদির এরকম বলতে থাকেন : হুজুর এখন আমার উপর নারাজ হয়েছেন। এজন্যে আমার বাড়ী আসা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু মিয়া চিশতী সাহেব[১০] এখনও মাঝে মাঝে আসেন। মওলবী খুদাবখশ[১১] এর রাখাল ছেলেকে ধরে প্রহার করেন ও তারই জুতাজোড়া নিয়ে ফরক্কাবাদ যান। এইসব হলো লোকের মূর্তি পূজা ও কুফুরীর সামান্য নমুনা মাত্র। আমি প্রথমে মূর্তিটাকে যেমন দেখেছি, তারই সঠিক বর্ণনা আপনাকে জানালুম। এখন এসব লোকের ভুল ও মিথ্যা স্পষ্ট দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর আমি তাদের সংগ ত্যাগ করে পাপ থেকে বেঁচেছি। এই সংগে আমি বদি-উজ-জামান ও মওলবী রজব আলীকে সালাম জানাচ্ছি।"

জয়নুল আবেদীন কলিকাতা ফিরে গেছেন এবং ওহাবী মতবাদ একেবারে ত্যাগ করেছেন। তাঁর অনুগামীরাও তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন। আর তার দরুন তৃতীয়বার পরিস্থিতি এমন হলো, যেন ওহাবী আন্দোলন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু পাটনার মওলবীদের অধ্যবসায় বলে আবার সব বাধা দূরীভূত হলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্প্রদায়টা উজ্জীবিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এতোখানি শক্তিশালী হয়েছিল, যেমনটি ছিল ঠিক সৈয়দ আহমদেরই জীবনকালে।

---

[১০] মিয়া চিশতী সৈয়দ আহমদের খাদিম। তাঁর সম্বন্ধে বলা হতো যে, তিনি প্রভুর সংগে বালাকোটের যুদ্ধকালে অদৃশ্য হয়ে যান।

[১১] যখন সৈয়দ আহমদের পুনরাবির্ভাবের বার্তা হিন্দুস্থানে পৌছে, তখন ফরাক্কাবাদের লোকেরা মওলবী খুদাবখশের নিকট একটা পত্র পাঠায় এই নির্দেশ দিয়ে যে, ইমাম যে পার্বত্য অঞ্চলে গেছেন, তার যেন কিছু নিদর্শন সংগে আনেন। তখন তিনি ফেরার পথে রাখালের জুতাজোড়া চুরি করে আনেন পাহাড়িয়া অঞ্চলে যাওয়ার সাক্ষ্য হিসেবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পাঞ্জাব রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পরবর্তী প্রত্যেক সরকার ছিল নামে মাত্র শক্তিধর, রাষ্ট্রের সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল খালসা সৈন্যদের হাতে। শেষ পর্যন্ত লাহোরের দরবার স্থির করলো, তার রাজনৈতিক সত্তা রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিদ্রোহপরায়ণ খালসা-বাহিনীকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা। এই বিবেচনায় শিখরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধে শিখরা দারুণভাবে পরাজিত হয়, খালসা-বাহিনী আংশিকভাবে ধ্বংস হয়, এবং লাহোরে একজন রেসিডেন্টের অধীনে দেশীয় সরকারের পত্তন হয়। শেষের কয় বছরের ভীষণ গোলযোগের সময়টা ছিল জেহাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল এবং ওহাবীরাও খুবই বিজয়ের আশা করতো। তারা বালাকোট দখল করে নেয় এবং মুজাফ্ফরাবাদ দ্বিতীয়বার আক্রমণের প্রস্তুতি চালাতে থাকে। এমন সময় জয়নুল আবেদীনের দলত্যাগে আন্দোলনটা সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সমকালীন জেহাদীদের প্রধান নেতা ছিলেন তিন জন : বিলায়েত আলী ইনায়েত আলী ও মকসুদ আলী; আর তাঁরা সকলেই ছিলেন বিহারের অধিবাসী। ইনায়েত আলীর ইচ্ছা ছিল মওলবী কাদিরকে সমর্থন করার। কিন্তু মকসুদ আলী সোজা জানিয়ে দিলেন যে, সৈয়দ আহমদের পুনরাবির্ভাবের কাহিনী যদি অস্বীকার করা না হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জেহাদ ত্যাগ করে বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। তখন বিলায়েত আলীকে নেতা নির্বাচন করা হলো ও জেহাদ পুনরায় শুরু করা হলো। মুজাফ্ফরাবাদে দ্বিতীয় অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হয়। শিখদের দক্ষিণমুখে বিতাড়িত করে জেহাদীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তখন একদল পাঠান এই বিজয়বার্তা শুনে জেহাদীদের পক্ষাবলম্বন করে। শিখরা নওশেরায় একবার বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুনরায় পরাজিত হয়। সিন্ধু নদীর পূর্বতীরে হরিপুর থেকে কাগান এবং সিত্তানা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওহাবীরা অত্যল্পকালের মধ্যেই নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। কিন্তু খালসাবাহিনীর ধ্বংস এবং তার দরুন ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয়ে একটা নয়া শিখ-শক্তির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ওহাবীদের পক্ষে নিজেদের অধিকার সুদৃঢ় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ১৮৪৭ সালে হরিপুরের নিকট মিঃ এগ্নিউ-এর নিকট সমগ্র মুজাহিদবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কেবলমাত্র মীর আওলাদ আলী তাঁর কিছু সংখ্যক অনুগামীসহ সিত্তানায় পলায়ন করেন। মওলবী ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলী রাজবন্দী হিসেবে জন্মস্থান আজিমাবাদ প্রেরিত হন। সেখানে উপস্থিত হলে তাঁরা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকার মুচলেকা দিয়ে খালাস পান এই শর্তে যে, চার বছর তাঁরা পাটনা শহর ত্যাগ করতে পারবেন না। কিন্তু মুচলেকার শর্ত পালনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি, এবং মাত্র কয়েক মাস তাঁরা নিষ্ক্রিয় থেকে পুনরায় সিত্তানায় আশ্রয়প্রাপ্ত মীর আওলাদ আলীর সংগে চিঠিপত্র যোগাযোগ শুরু করেন এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টিত হন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে, ইনায়েত আলী পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ও মুজাহিদ সংগ্রহ করছেন, অথচ

পূর্বে একবার তাকে এই জেলা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল রাজদ্রোহ অপরাধে ও বিদ্রোহ প্রচার করার অভিযোগে। তদন্ত আরম্ভ হলেই ইনায়েত আলী আত্মগোপন করেন ও পাটনায় পলায়ন করেন। তখন তাঁকে গ্রেফতার করবার জন্যে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পরওয়ানা পাঠানো হয়। কিন্তু ইনায়েত আলী রাজশাহী থেকে উধাও হয়ে গেলেও তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সিদ্ধান্তের জন্যে দুঃখিত হন এবং ১৮৫০ সালের মার্চ মাসে তিন এতদ্‌সংক্রান্ত মামলায় এই হুকুম দেন : পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইনায়েত আলী নিরীহ ব্যক্তি, তাঁকে গ্রেফতার করার কোনও দরকার নেই; তাঁর বিরুদ্ধ ফরিয়াদীকে[১] পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হোক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করার কারণ দর্শাতে। এই হুকুমের নকল পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানো হয়। তিনি কিন্তু পাটনার মওলবীদের কার্যকলাপের বিষয় রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। এজন্যে তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে, ইনায়েত আলী নিরীহ লোক। তিনি পুনরায় ইনায়েত আলীর নিকট এক হাজার টাকার মুচলেকা নেন এই শর্তে যে, তিনি পাটনা পরিত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বাংলার কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়েছেন লক্ষ্য করে ইনায়েত আলী গোপনে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পলায়ন করে সিত্তানায় জেহাদীদের সংগে মিলিত হলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধি হিসেবে এই ওহাবী বসতির মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫০ সালের শেষভাগে বিলায়েত আলী সীমান্ত প্রদেশের দিকে সফর আরম্ভ করেন নিজের পরিবারবর্গ ও আশিজন অনুগামী নিয়ে। পথে তিনি বড়ো শহরে প্রচারকার্য চালান। দিল্লীতে তাঁর প্রচারকার্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কথিত আছে যে, এই সময় তিনি বাদশাহের[২] নিকটও জেহাদ প্রচার করেন ও তাঁর সমর্থন লাভ করেন।

দিল্লী থেকে পূর্বের মতো ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে তিনি সিত্তানা পৌছালেন জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোনও বাধা না পেয়ে। কেবল মাত্র এক জায়গায় কুব্‌বুনের নিকট পুলিশ তাঁদের মালবাহী উটগুলোকে ধরে পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনারের নিকট চালান দেয়, কিন্তু তিনি নির্দেশ দেন উটগুলোকে অবিলম্বে মালিকদের ফিরিয়ে দিতে।

বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী চার বছর পূর্বে গ্রেফতার হয়ে পুলিশ প্রহরায় পাটনায় প্রেরিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁরাই নির্ভয়ে ও নিরাপদে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে ফিরলেন, এটা নিশ্চয়ই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক আশ্চর্য বিষয় বটে। এ থেকেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্যটা সহজে নজরে পড়ে—তখন শাসকরা বিপজ্জনক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কতোটুকুই বা খবর রাখতেন। সৈয়দ আহমদের যুদ্ধবিগ্রহ, বারাসতের বিদ্রোহ, হরিপুর ধর্মান্ধদের প্রতিরোধ ও শেষে আত্মসমর্পণ সমস্তই শেষ হয়ে গেলে ভুলে যাওয়া হলো। আর তারপর সহসা রুঢ়ভাবে সরকার জাগ্রত হলো শেষ সময়ে, যখন মওলবীরা সিত্তানায় ফিরে গেছেন এবং পার্বত্য আদিবাসীদের উত্তেজিত করে তুলছেন।

---

[১] বলাবাহুল্য, এই ফরিয়াদী ছিল জনৈক হিন্দু—(অ)।

[২] বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর (১৮৫১-১৮৫৭ খৃঃ)—(অ)

বিলায়েত আলীর উপস্থিতিতে শক্তি বৃদ্ধি না হয়ে অনৈক্যই সৃষ্টি হলো। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভাইয়ের মতো তাঁর জাতক্রোধ ছিল না। তাঁর ধর্মীয় উৎসাহ্ ততোখানি বন্য অন্ধ প্রকৃতির ছিল না, যার দরুন ধর্মীয় দুর্বলতাবশত মানুষ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং পার্থিব পরিণামদর্শিতাও বর্জন করে। তিনি সফর করে ফিরেছেন মধ্যভারতে, দাক্ষিণাত্যে, সিন্ধুতে ও বোম্বাইতে এবং তাঁর দরুন ভাইয়ের চেয়ে আরও সঠিকভাবে তিনি ব্রিটিশ শক্তির গুরুত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শক্তিই মারাঠা বর্গীদের ছত্রভংগ করে দিয়েছে, মুসলমান পিণ্ডারীদের শায়েস্তা করেছে, সিন্ধুর আমীরদের দমন করেছে, শিখদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এজন্যে তিনি কাফেরের দেশ থেকে পলায়ন করে নিজের বিবেককে প্রবোধ দিয়েছেন ও শান্তিতে থাকতে চেয়েছেন যতোদিন না সৈয়দ আহমদ পুনরায় উদিত হন, কিংবা নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনাময় অনুগামীদের সংখ্যা বর্ধিত হয়। তিনি বোঝালেন যে, উপস্থিত অল্পসংখ্যক জেহাদীদের নিয়ে ভারত জয় করা একেবারেই অসম্ভব এবং আরও দেখালেন যে, কোনোরকম নিষ্ফল প্রচেষ্টায় মাত্র ব্রিটিশ সরকারের চোখ খুলে দেওয়াই হবে। আর যদি সে সরকার একবার তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠে তাহলে সরকার তাদের সব রকম রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে এবং প্রজাদেরও জেহাদ সমর্থন করতে নিষেধ করবে। কিন্তু ইনায়েত আলী ছিলেন সংকীর্ণমনা গোঁড়া এবং ভাইয়ের চেয়ে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এজন্যে তাঁর নিকট এরূপ পন্থা ভ্রমাত্মক বিবেচিত হলো—এ যেন ইসলামে ও সৈয়দ আহমদের কাজে আস্থাহীনতা মাত্র। খোদ পয়গম্বর সাহেব ইমাম মেহেদীর চেয়ে উচ্চস্তরের না হয়েও^{৩} মাত্র কয়েকজন অনুচর নিয়ে সারা আরবদেশ জয় করেছিলেন। যা একবার ঘটেছে, তা পুনরায় ঘটতে পারে। এখন শুধু দরকার বিশ্বাসের, তাহলে সুফল নিশ্চিত। এভাবে তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধে জেহাদের পক্ষে ওকালতি করলেন এবং অনিচ্ছুক ভাইকে সরদারী ছেড়ে দিতে গররাজী হলেন। ফলে বসতিতে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাঙালিরা সমর্থন করলো তাদের পীর সাহেব ইনায়েত আলীর দাবী, আর সংখ্যাবহুল হিন্দুস্থানীরা পক্ষ নিলো তাঁর ভাইয়ের। ঝগড়া তীব্রতর হয়ে উঠলো এবং পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, জেহাদীরা ভারত অধিকারের প্রশ্ন ত্যাগ করে আত্মকলহেই শক্তি অপচয় করতে প্রস্তুত হ'ল। এমন সময় বিলায়েত আলীর শুভবুদ্ধিতে বিরোধটার মীমাংসা হয়ে গেল। তিনি বিবদমান দুই দলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর নিকট এই মুনাজাত করলেন, তিনি যেন দুর্দিনে মুসলমানদের করুণা করেন এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। শত্রু-মিত্র তাঁর আচরণে অভিভূত হয়ে পড়ে ও অস্ত্র ত্যাগ করে। তখন ইনায়েত আলী নিজের অবস্থা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে ভাইয়ের পক্ষে খেলাফতের দাবী ত্যাগ করেন এবং নিজের অল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে সোয়াতের আখুন্দের নিকট আশ্রয় লাভের আশায় প্রস্থান করেন। আখুন্দ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

আখুন্দের সংগে সাক্ষাৎ করে ইনায়েত আলী বনায়ের নদীর অপর তীরবর্তী গ্রাম মুদদ্খেলে বসবাস করতে থাকেন। আর নিজের অভিলাষ পূরণের সুযোগের অপেক্ষাও করতে লাগলেন। ভাগ্য তাঁর উপর সুপ্রসন্ন ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই বিলায়েত আলী

---

৩ নাউজুবিল্লাহ, কোনও মুসলমানই এরূপ চিন্তা করতে পারে না—(অ)।

রোগভোগের পর জান্নাতবাসী হন। তখন জেহাদী বাহিনীর নেতৃত্বের একমাত্র বাধাও অপসারিত হয়ে গেল। এখন ওহাবীদের অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রজাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, তারা শাসকদের অধীনে শান্তিতে বাস করবে কিংবা শাসকদের ধর্মের শত্রু বিবেচনায় তাদের নির্মূল করাই অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এ পর্যন্ত একথা বলা উচিত হবে না যে, তারা বিনা উত্তেজনায় সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অস্ত্রধারণ করেছে। কয়েক বছর ধরে তারা সিন্ধুতে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে ছিল এবং যদিও তারা কাবুল যুদ্ধে দোস্ত মুহম্মদ খানের সংগে যোগদান করেছিল এবং আমাদের বিরুদ্ধে গজনীতে যুদ্ধও করেছিল, তারা স্থানীয় চাপে পড়েই তা করতে বাধ্য হয়েছিল। আর তখন পরিস্থিতিও ছিল অন্য রকম। কাবুলে যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ছিল একটা মুসলিম রাজ্যকে উৎখাত করা, এজন্যে ওহাবীরা আক্রমকদের বাধা দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের ভাইদের সাহায্য করেছিল একটা বিধর্মী শক্তির বিনা কারণে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কালে।

ইসলামের শিক্ষার ধারানুযায়ী স্রষ্টা এমন কোন সত্তা নন, যিনি মানুষের ছোটখাটো অভিযোগের উর্ধ্বে থেকে কেবলমাত্র অপরিবর্তনীয় বিধান দান করেন। বরং তিনি হচ্ছেন তাদের মহান শিক্ষক, করুণাময় পিতা, যিনি মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাকে উপযোগি করেন এবং প্রত্যেক মুশকিলে ও সমস্যায় সাহায্যদান করেন। তাঁর বিধিবিধান একেবারেই চরমভাবে দেওয়া হয়নি, বরং ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানবীয় বিভিন্ন স্তরে ধারণা-শক্তির উপযোগি করেই দেওয়া হয়েছে এবং যখনই সে সবের উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে, তখনই সেগুলিকে রদ করে দেওয়া হয়েছে। সর্বকালের জন্যে অপরিবর্তনীয় বিধিসমূহের ভিত্তিমূলে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়; ধর্ম যুগে যুগে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা ও হযরত ঈসার দ্বারা এবং শেষ নবী হযরত মুহম্মদের সময় পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। হযরত মুহম্মদের সময় পর্যন্ত এই ধারা ধর্মীয় অনুদারতার অনুকূল ছিল না। শক্তিকে শক্তির দ্বারা প্রতিরোধ করা ধর্মের অজানা! ধর্মবিশ্বাসীর কর্তব্য ছিল, অহিংস বাধ্যতা দেখিয়ে প্রতিরোধ করে যতোদিন সম্ভব ধর্মের অনুশীলন করা। আর যখনই ধর্ম কিংবা পৃথিবী দুটির একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তখনই তার কর্তব্য ছিল গৃহত্যাগ করা এবং এমন এক দেশে হিযরত বা প্রস্থান করা, যে দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। হযরত মুসা এই পন্থা অবলম্বন করছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইসলামের প্রথম যুগেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। মক্কার প্রথম দীক্ষিত মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন শুরু হলে তারা মিসরের দক্ষিণে পলায়ন করে আশ্রয় লাভ করেছিল। এবং তারপর স্বয়ং হযরত মুহম্মদ মদিনায় হিজরত করে এই নীতিকে মুসসমানদের আদর্শ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, যখন কোনো দেশে মুসলমানদের ধর্মাচরণ প্রাণসংশয়ের কারণ হবে, তখনই সে দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাবে। তরবারির মুখে ধর্মপ্রচারের বোধ তখনও হযরত মুহম্মদের হয়নি। আর এ জন্যে তিনি কোরায়েশদের এই প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন যে, তারা তাঁর আল্লাহ্‌কে এক বছর পূজা করবে, যদি তিনি তাদের দেবতাকে এক বছর পূজা করেন, তাহলেও তাঁর অস্বীকৃতি চরম উদারবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ 'বলো, হে অবিশ্বাসিগণ! আমি তার পূজা করবো না, যার পূজা তোমরা করো, আর তোমরা তার পূজা করবে না, যার পূজা আমি করি। তোমাদের ধর্ম

তোমাদেরই থাক, আমার ধর্ম থাক আমারই।'[৪] কিন্তু যতোই তিনি মক্কাবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন, ততোই তাঁর ধর্মমতে দীক্ষিত মুসলমানরা বিপজ্জনক রাষ্ট্রীয় অপরাধী বিবেচিত হতে লাগলো, আর এজন্যে নও-মুসলিমরা উৎপীড়ন এড়াবার উদ্দেশ্যে জন্মস্থান ত্যাগ করে মদিনায় পয়গম্বরের সংগে মিলিত হতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে মুহম্মদের অনুসারী বিভিন্ন জাতের লোক ইসলামের একসূত্রে আবদ্ধ হয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ে গ্রথিত হতে লাগলো, এবং তাঁর শাসনও বিস্তৃত হতে লাগলো তাদের বাসভূমির সমগ্র এলাকা জুড়ে। তাদের সংখ্যা যতোই বাড়তে লাগলো হযরত মুহম্মদও সেই অনুপাতে কম উদার হতে লাগলেন। শেষে এক ঐশী বিধানের বলে পূর্বের উদারনৈতিক বিধানকে মাত্র চার মাসে সীমাবদ্ধ করে এই আদেশ দেওয়া হলো যে, তারপর মুসলমানরা বিধর্মীদের সংগে সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধ করে দেবে এবং তাদের ধর্মও প্রচার করতে পারবে তরবারির মুখে। এই নীতির বলে মুসলমানেরা যে কোনও দেশে বাস করুক না কেন, ধর্মের সূত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, আর বিধর্মীরা ধর্মীয় ও জাতীয় যতোই পার্থক্য থাক না কেন তাদের মধ্যে, সমানভাবে মুসলমানদের দুশমন হয়ে গেল। আর তার দরুন মুসলমানদের চোখে সারা দুনিয়াটা ভাগ হয়ে গেল 'দারুল ইসলাম' অর্থাৎ শান্তির আবাস, যার বিস্তৃতি হচ্ছে সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রের আর 'দারুল হরব' অর্থাৎ দুশমনের দেশ, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রত্যেকটি অমুসলমান রাজ্য। প্রত্যেক 'দার' অর্থাৎ দেশের অধিবাসীরা অন্যটিতে বাস করতে পারে তার জাতীয়তা ত্যাগ না করেও। কিন্তু মুসলমান দারুল হরবের অধিবাসী হয়ে পড়লে তাকে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করবার সদিচ্ছা পোষণ করতেই হবে, অন্যথায় সে হবে ধর্মত্যাগী। কারণ, মুসলমান আইন কোনও মুসলমানকে স্থায়ীভাবে একজন 'হরবী' অর্থাৎ দুশমনের প্রজা হিসেবে স্বীকার করে না।

মুসলমান আইনের বিধানদাতারা এ বিষয়ে একমত যে, মুসলমান কর্তৃক শাসিত প্রত্যেক দেশই দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়ে গেছে যে, এককালীন দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান ব্রিটিশ ভারত বিধর্মী শক্তি কর্তৃক বিজিত হওার দরুন দারুল হরব হয়ে গেছে কিনা। এই প্রশ্নের জওয়াব যদি ব্রিটিশ সরকারের অনুকূলে যায়, তাহলে মুসলমানরাও জেহাদ চালাবার অধিকার হারিয়ে ফেলে; আর যদি জওয়াবটা প্রতিকূল হয়, তাহলে মুসলমানরা গোলমেলে অবস্থায় পড়ে যায়, কারণ সরকার বিরোধ না বাধালে তাদের সক্রিয় বাধ্যবাধকতা হয় না। কিন্তু এ দেশ থেকে হিজরত বা পলায়ন করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। স্থায়ীভাবে এদেশবাসী মুসলমান তার সর্ববিধ ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, সে পাপে জীবন যাপন করবে, তার বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিবি তালাক হয়ে যাবে এবং তার সন্তানরা হবে জারজ। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে গোড়া মানুষদের উপর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা যদি ইউরোপীয় পাঠকরা সম্যক অনুধাবন করতে চান তা হলে তাঁরা ক্ষণকাল চিন্তা করে দেখুন, ইউরোপবাসীদের—দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক আইরীশদের উপর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যদি তাদের বিশ্বাস করতে বলা হয় যে, তাদের রাজনৈতিক ক্ষোভ ছাড়াও তাদের বিবাহ অসিদ্ধ হবে, সন্তানরা হবে জারজ এবং প্রার্থনা হবে মূল্যহীন, যতোদিন তারা ইংলণ্ড শাসিত দেশে বাস করতে থাকবে।

---

[৪] মক্কাশরীফে সর্বপ্রথম যুগে নাজেল হওয়া সুরা 'আল-কাফিরুন'—(অ)।

হানাফী সম্প্রদায়ের বিধানমতে দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তিনটি শর্তে :

> প্রথম—বিধর্মী কর্তৃত্বের সাধারণ প্রকাশ এবং তার মধ্যে মুসলিম কর্তৃত্বের প্রকাশ না থাকা।
>
> দ্বিতীয়—দারুল হরবে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া যে, কোনও মধ্যবর্তী মুসলিম শহর বা কওমের অস্তিত্ব না থাকা।
>
> তৃতীয়—তার মধ্যে কোনও ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান উপস্থিত না থাকা।

প্রথম শর্তটি ব্রিটিশ ভারতে উপস্থিত, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি নয়। ব্রিটিশ ভারত উত্তর-পশ্চিমে মুসলমান রাজ্যসমূহের সংগে মিশে আছে। আর তার মধ্যে এমন সব মওলবী উপস্থিত, যাঁরা জ্ঞান-গরিমায় ও ধর্মনিষ্ঠায় দূর-দূরান্তেও খ্যাতিমান। হানাফীরা এখনও এদেশকে দারুল ইসলাম বিবেচনা করে থাকে। কিন্তু ওহাবী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে মওলবী মুহম্মদ ইসমাইলের অনুগামীরা মনে করতেন যে, মাত্র প্রথম শর্তটির উপস্থিতি প্রয়োজন। আর এজন্যে প্রচার করতেন যে, ভারত দারুল-হরব হয়ে গেছে। তাঁরা কল্পনা করতেন যে, ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক মিসরে ইসরাইলীদের মতো, আর এজন্যে তাঁরা দ্বিতীয় মুসার আবির্ভাব আশা করতেন। ইংরেজরা হচ্ছে বর্তমান যুগের ফেরাউন, অতএব তাদের অধিকার থেকে পলায়ন মিসর থেকে পলায়নের মতোই প্রয়োজনীয়। তবে উৎপীড়িত মুসলমানদের একটা সান্ত্বনা এই যে, ব্রিটিশ সরকারের ধ্বংস অবধারিত। তার স্থায়িত্ব মাত্র একশো বছর—ঠিক যতোদিন ইসরাইলীরা মিসরে দাসত্ব ভোগ করেছিলো। এই দাবী সপ্রমাণ করতে ওহাবীরা পিছপা হয়নি। তারা এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী জাল করে, ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারপত্র ছাপিয়ে অজ্ঞ অসন্দিগ্ধ মুসলমান ভাইদের মধ্যে বিতরণ করতো :

> সত্যকাহিনী শোনো : একজন বাদশাহ্ হবেন, তাঁর নাম তাইমুর, ত্রিশ বছর তিনি শাহী করবেন। মর্দান শাহ্ হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী, তিনিও দুনিয়ায় ত্রিশ বছর শাসন করবেন। যখন তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে যাবেন, তখন আবু সঈদ হবেন জিন্ ও মানুষের বাদশাহ্। তারপর বাদশাহ্ হবেন ওমর শাহ্, হিন্দুস্তানের তখ্ত তাঁর অধিকারে আসবে। কাবুলের শাহ্ মহামতি বাবুর হবেন হিন্দুস্তানের বাদমাহ, আর দিল্লী হবে রাজধানী। তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন সিকান্দার, তাঁর পরে তখ্ত পাবেন ইবরাহীম। তখন দুনিয়ায় নামবে বিপর্যয়। তার পর হুমায়ুন তখ্তে উন্নীত হবেন। তাঁর আমলে হবে আফগানদের অভ্যুদয়—এই বংশের শাহ্ হিন্দুস্তান দখল করবেন, তাঁর নাম মহামতি শের শাহ্।
>
> হুমায়ুন ইরানে পালিয় আশ্রয় নেবেন মুহম্মদের বংশধরদের, সেখানে তাঁর সম্মান হবে। ইরানের শাহ্ হবেন তাঁর প্রতি সদয়, তাঁর মর্যাদা তাঁর সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। যখন তিনি হিন্দুস্তানে অভিযান করবেন হুমায়ুনকে তখ্তে বসাতে, তখন শেরশাহ্ গত হবেন, তাঁর ছেলে হবেন শাহ্। হুমায়ুন সহজেই ফিরে পাবেন হিন্দুস্তানের তখ্ত। তাঁর পরে আকবার হবেন হিন্দুস্তানের বাদশাহ। তাঁর পুত্র জাহাংগীর হবেন উত্তরাধিকারী, তিনি হবেন সারা দুনিয়ার রক্ষক। যখন তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে যাবেন, শাহজাহান শাহী করবেন ত্রিশ বছর যা আরও বেশি। তাঁর

কনিষ্ঠতর পুত্র হবেন উত্তরাধিকারী, তিনিও শাহী করবেন ত্রিশ-চল্লিশ বছর। তারপর ঈমান একেবারে লুপ্ত হবে, সত্য নষ্ট হয়ে যাবে, মিথ্যা মাথা তুলে দাঁড়াবে, বন্ধুরা হবে পরস্পরের দুশমন। তিনি শাসন করবেন কুড়ি বা ত্রিশ বছর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হবে উত্তরাধিকারী। তাঁর আমলে ঈমান আবার তাজা হবে, তাঁর নাম হবে বাদশাহ্ মুজান্ শাহ্। তাঁর শাহীতে মানুষ থাকবে আরামে-আয়াসে। আর ন্যায়বিচার তাঁর রাজ্যে বিরাজ করবে। আবার শান্তি নেমে আসবে তাঁর সময়ে। দুঃখ দূর হবে, সুখ দেখা দেবে সর্বত্র। তাঁর শাহী থাকবে এগারো বছর। তারপর হবেন আর একজন বাদশাহ্, তখন নাদির শাহ্ করবেন হিন্দুস্থানে অভিযান, তাঁর তরবারি দিল্লীতে রক্তস্রোত বইয়ে দেবে। তাঁর পরে অভিযান করবেন আহ্মদ শাহ্, তাঁর হাতে শাহী বংশ উৎখাত হয়ে যাবে। এই বাদশাহ্ ফৌত হলে পরে আগের বংশ আবার তখ্‌ত ফিরে পাবে। তখন শিখেরা হবে শক্তিশালী, আর শুরু করবে অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। তারপর নাসারারা সারা হিন্দুস্থান জয় করবে, তাদের শাহী কায়েম হবে মাত্র একশো বছর। তাদের আমলে দুনিয়ায় নেমে আসবে ভীষণ উৎপীড়ন। তাদের ধ্বংস করতে পশ্চিমে এক শাহ্ উদয় হবেন, তিনি যুদ্ধ করবেন উৎপীড়ক নাসারদের সংগে। এই যুদ্ধে অগণিত মানুষ শহীদ হয়ে যাবে। পশ্চিমের শাহ্ জয়ী হবেন জেহাদের তরবারিতে, আর ঈসার অনুসারীরা হবে পরাজিত। আবার ইসলাম আবাদ হবে চল্লিশ বছর ধরে। তারপর এক বেঈমান জাতি আসবে ইসপাহান থেকে। এই স্বেচ্ছাচারীদের ধ্বংস করতে ঈসা আসবেন আসমান থেকে নেমে, আর আসবেন মেহ্দী। এসব ঘটবে যখন রোজ-কেয়ামত শুরু হবে দুনিয়ায়। এই কাসিদা লেখা হলো পাঁচশো সত্তর হিজরীতে। পশ্চিমের শাহ্ আসবেন বারোশো সত্তর হিজরীতে। নেয়ামতউল্লাহ্ জানতেন আল্লাহ্‌র অনন্ত রহস্য, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সফল হবেই।

হিজরত করার অনুকূলে যেসব প্রচারণা চলতো, নীচের উদ্ধৃতিই তার উপযুক্ত উদাহরণ[৫] :

> "পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্ পরম মংগলময়। তিনি রাব্বুল-আলামীন—সারা বিশ্বের মালিক। আল্লাহ্‌র করুণা ও নিরাপত্তা হযরত মুহম্মদ, তাঁর রসূল, তাঁর বংশধরদের উপর ও সাহাবাদের উপর বর্ষিত হোক। এখন সকল মুসলমান অবহিত হোক যে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে, কাফের শাসিত দেশ পরিত্যাগ করা, কারণ সেখানে মুসলমান আইননির্দিষ্ট বিধিবিধান শাসনশক্তি প্রতিপালিত হতে বাধা দেয়। তারা যদি দেশ ত্যাগ না করে, তাহলে মৃত্যুকালে আজরাইল যখন তাদের দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করবেন, তখন তিনি তাদের এই প্রশ্ন করবেন : আল্লাহ্‌র রাজ্য কি এতো প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা গৃহত্যাগ করে অন্যত্র বাস করতে পারোনি? আর এই কথা বলে তিনি তাদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করবেন। তারপর তারা কবরের ভিতর ভোগ করবে অশেষ যন্ত্রণা এবং তার রেহাই নেই। শেষে রোজ-কেয়ামতের সময় তাদের দোজখে ফেলে দেওয়া হবে এবং সেখানে তারা শাস্তি ভোগ করবে অনন্তকাল

---

[৫] হিন্দীতে মুদ্রিত 'রিসালা-ই-হিজরত' থেকে গৃহীত।

ধরে। আল্লাহ্ করুন! কোন মুসলমান যেন কাফেরের রাজ্যে মৃত্যু আলিংগন না করে। যদি তার কাফেরের রাজ্যে মৃত্যু ঘটে, তাহলে মৃত্যুকালে তার অশেষ যন্ত্রণা ভোগ হয়। তারপর তার ভাগ্যে আসে কবরের ভিতর অশেষ শাস্তি, আর রোজ-কেয়ামতে তার যে শাস্তি হয়, তা মানুষের অচিন্তনীয়। ভাইগণ! এখনও মরণ আসেনি। এখনও তোমরা পলায়ন করতে পারো। সেই দেশে যাও, যেখানের শাসক মুসলমান এবং মোমেন মুসলমানদের সংগে বাস করো। তুমি যদি জীবিতকালে স্বদেশে উপস্থিত হও, তাহলে তুমি সারাজীবন যতো কিছু পাপ করেছো, সব মাফ হয়ে যাবে। তোমার রুজীর কথা মোটেই ভেবো না। আল্লাহ্ সকলেরই আহার যোগান; তুমি যেখানেই যাবে, সেখানেই তিনি তোমার আহার যোগাবেন। আল্লাহ্ কখনও কাউকে অনাহারে বা বিবসনে রাখেন না। বা তুমি তো আল্লাহ্‌র হুকুমে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছো, আল্লাহ্ কুরআনে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিরাট সম্ভাবনার, উন্নতির ও তাঁর অনন্ত করুণার। তবু তোমার ভয় কিসের? আসমান ও জমীনের মালিক তো সর্বদাই আছেন তোমার সংগে। তুমি যে দেশে যাচ্ছো, সেখানেই তোমার রুজীর হিল্লে হয়ে যাবে। এ চিন্তা মনেই এনো না। সে দেশে চলে যাও, আর এখানে যে পেশা চালাচ্ছো, তাই সেখানে শুরু করে দাও। আল্লাহ্ সবারই আহার যোগান। তোমার মনে শান্তি আনো। যেখানেই তুমি যাবে, সেইখানেই সম্মানের সংগে তিনি আহার যুগিয়ে যাবেন, আর তোমার সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। তুমি এ জীবন আরাম-আয়েসে কাটিয়ে যাবে আর মরণকালে আজরাইল তোমায় এতোটুকু যন্ত্রণা না দিয়ে তোমার দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।[৬] আর তোমার কোনও গোর-আজাব হবে না।[৭] রোজ-কেয়ামতে তোমার কোনও ভয়ের কারণ নেই, তুমি দোজখের যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পাবে।

"পুরাকাহিনীতে আছে যে, একজন ইসরাইলী অন্যায়ভাবে নিরানব্বাইটা খুন করে। তারপর একজন সাধুর নিকট যেয়ে অপরাধ স্বীকার করে ও জিজ্ঞাসা করে কীভাবে তার মুক্তিলাভ হবে। সাধু পুরুষ বললেন, কেউ যদি অন্যায়ভাবে একজন লোককেও খুন করে, তাহলে তার পরিত্রাণ নেই। তোমার পাপের ক্ষমা নেই, তোমাকে দোজখে যেতেই হবে।' একথা শুনে ইসরাইলী বললো, 'আমাকে দেখছি দোজখে যেতেই হবে, এটা ধ্রুবসত্য। তাহলে তোমাকেও খুন করে খুনের

---

[৬] মুসলমান বিশ্বাস করে যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে আজরাইল আত্মাকে হাতে ধরে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। মুমূর্ষু যদি মহাপাপী হয়, তাহলে ফেরেশতা তাকে যন্ত্রণা দেন এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে ধীরে ধীরে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু সে যদি ধর্মনিষ্ঠ হয় তাহলে এই বিচ্ছিন্ন ভাবটা হয় যন্ত্রণাবিহীন, আর শান্তিতে তার মৃত্যু হয়। এই বিশ্বাসের দরুন মুসলমানদের মধ্যে প্রথা হয়ে গেছে যন্ত্রণাভোগী মুমূর্ষুর নিকট কোরআনের 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করা। তার উদ্দেশ্য হলো, আজরাইলকে প্রসন্ন করা ও তার জীবযন্ত্রণা শেষ করে দিতে প্রবৃত্ত করা।

[৭] মুসলমানরা আরও বিশ্বাস করে যে, দু'জন ফেরেশতা (মনকির ও নকির) মৃতকে ঈমান সম্বন্ধে কঠোর পরীক্ষা করেন এবং জওয়াব সন্তোষজনক না হইলে কঠোর শাস্তি দেন। মুসলমানরা তাদের পরীক্ষাকে এতোই ভয় করেন যে, তারা ছেলেমেয়েদের কল্পিত সওয়াল ও তার জওয়াব সম্বন্ধেও শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সংখ্যাটার শত পূর্তি করে যাই।' একথা বলে সে সাধুপুরুষকে খুন করলো। তারপর সে আর এক সাধুর নিকট গিয়ে স্বীকার করলো, সে একশোটি খুন করেছে, এখন কীভাবে তার মুক্তিলাভ হবে। সাধুর জওয়াব হলো, অকপট মনে তওবাহ্ বা অনুশোচনা করে ও হিজরত করে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ কথা শুনেই সে তওবাহ্ করলো এবং নিজের দেশ ত্যাগ করে বিদেশ যাত্রা করলো। পথেই কিন্তু তার মৃত্যু এলো ঘনিয়ে এবং করুণার দূত ও শাস্তির দূত তার দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করতে উপস্থিত হলেন। করুণার দূত (রহমতের ফেরেস্তা) বললেন, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করার অধিকার তাঁরই আছে, কারণ লোকটি তওবাহ্ করেছে এবং হিজরত করেছে। শাস্তির দূর (গজবের ফেরেশতা) স্বীকার করলেন, লোকটি যদি অন্য রাজ্যে পৌছাতে পারতো, তাহলে শাস্তির দুতেরই অধিকার হতো একাজ করবার। কিন্তু তিনি নিজেরই অধিকার দাবী করলেন এই যুক্তি দিয়ে যে, লোকটি এখনও তার নিজের দেশেই রয়ে গেছে এবং তার মৃত্যু ঘটাতে চাইলেন। কারণ লোকটি হিজরত সমাধা করতে সমর্থ হয়নি। তখন দূত দু'জন যেখানে লোকটি শুয়েছিল, সে জায়গাটি মেপে দেখলেন এবং ফলে জানা গেল যে, লোকটির একখানি পা সীমানা অতিক্রম করে ভিন্ন দেশে পড়েছে। তখন শাস্তির দূত নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ঘোষণা করে সংগে সংগে বিনা যন্ত্রণায় লোকটির মৃত্যু ঘটিয় দিলেন, আর লোকটিও আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত মানুষের দলভুক্ত হয়ে গেল। তোমরা শুনলে কিভাবে হিজরত মৃত্যুর পরও পুরস্কৃত হয়। অতএব তোমার আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করো তিনি যেন তোমাদের হিজরত করার সমর্থ্য দেন। আর তোমার অতি শীঘ্র হিজরত করো, না হলে কাফেরের দেশেই তোমাদের মৃত্যু হতে পারে। এদেশে মৃত্যু হলে তোমাদের অশেষ দুর্গতি হবে। মরণ যখন এসে যায়, তখন তওবাহ্ করার সময় থাকে না। যা করবার এখনই করে ফেলো।"

হিজরতের মতবাদ শুরু ইসলাম ধর্মেরই বিশেষত্ব নয়, খ্রীষ্টান ধর্মেও রয়েছে সমান মতবাদ। যে ক্রুসেডার তীর্থযাত্রী জেরুজালেমে অস্থিরক্ষা করার আশা পোষণ করে,আর যে রোমান ক্যাথলিক জীবনের শেষ দিনগুলো রোমে কাটিয়ে দিতে চায়, তারা একই প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হয় জীবনের শেষ দিনগুলো এমন কোনো পবিত্র স্থানে অতিবাহিত করতে, যেখানে পাপের প্রলোভনে পড়ার কম সম্ভাবনা। গোঁড়া মুসলমানও হিজরত করাকে এই রকমই একটা প্রবৃত্তিতে দেখে থাকে। তারা আশা করে থাকে মক্কা বা মদিনাশরীফে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার। কিন্তু তারা এটাকে মুক্তিলাভের জন্যে প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করতে দ্বিধা করে। আর এজন্যে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো, যখন তারা দেখলো যে, একটা বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় অজ্ঞ জনসাধারণকে বিশ্বাস করাতে চাইছে যে, তাদের এই মতবাদের সমর্থন করে মক্কাবাসীরাও। ১৮৮৩ সালে মওলবী কেরামত নামক একজন ও সৈয়দ আহমদের জনৈক খলিফার 'কাতুল-ইমাম' থেকে নিচের উদ্ধৃতিটা এই বিষয়ের উপর সমকালীন সবচেয়ে উন্নত মত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে :

> "আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করা দরকার, কারণ তাতে বহু উপকার পাওয়া যেতে পারে : যদি পয়গম্বরের কোনো উম্মত মুশরিকদের[৮] দ্বারা কিংবা নাস্তিকদের দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং অবিশ্বাসীদের দেশে শরীয়তী আইন পালন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে তাহলে সে আশ্রয় নেয় কোনো মুসলমান রাজ্যে, বিশেষতঃ মক্কা বা মদীনা শরীফে। কিন্তু ওহাবী যদি সেসব জায়গায় প্রবেশ করে, তাহলে তাদের স্থানীয় অধিবাসীরা শাস্তি দিয়ে থাকে।[৯] সেসব দেশে হিন্দুস্থানের মতো নয় যে, একজন কারও এতোটুকু বিনা আপত্তিতে যা ইচ্ছা সেখানে করতে পারে। এজন্যে ওহাবী যখন দেখে যে, সে-সব দেশের লোক তাদের বিপক্ষে ও তাদের শাস্তি দিতে প্রস্তুত, তখন তারা কোনও বিধর্মীর দেশেও আশ্রয় খুঁজবে। বহু ওহাবী এমনতরো করেছে। আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন! এটা কেমন খারাপ মজহাব যে, তার অনুসারীরা দারুল-ইসলামে বাস করতে পারে না, তাদের কাফেরের দেশেও ছুটাছুটি করে বেড়াতে হয়? অতএব তাদের মজহাবের কেউ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, কেন তুমি কাফেরের দেশে বাস করছো, তাহলে তাকে জওয়াব দাও : কাফেরের রীতিনীতি দেখে মন হতবুদ্ধি হয়ে যায়, আর তোমাদের মজহাবই তো এমন মনোবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছে। শুধু পারেনি মক্কা, মদীনা ও দারুল ইসলামের অন্যান্য শহরে। কারও দৃষ্টি ঠিকভাবে সংযত রাখা যায় না। তোমরা যারা ওহাবী এবং ঐসব স্থানে সফর করেছো, তোমরাই বুকে হাত দিয়ে এ প্রশ্নটা ভেবে দেখো। এদেশে বসবাসের সওয়ালে তোমাদের ও আমার মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। আমি এখানে আছি বটে, কিন্তু আমার মন পড়ে আছে ওখানে। এবং আমার একান্ত কামনা যে, আল্লাহ্ আমায় একদিন দারুল ইসলামে নিয়ে যাবেন, কিংবা এ দেশটাকে দারুল ইসলামে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আমি বিশ্বাস করি, ওখানকার মানুষগুলো সৎ, উত্তম, ধর্মে নিষ্ঠাবান ও ঈমানে বলিষ্ঠ। কিন্তু তোমরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে, তাদের আচার-নীতিতে ও ফতোয়ায় সন্তুষ্ট নও। এমন কি তাদের আখ্যা দাও স্বেচ্ছাচারী বলে। আর তোমাদের আরও অনেকে বলে থাকে যে, মক্কা ও মদিনার লোকদের উপর বিশ্বাস করা চলে না, তারা দশ টাকার বিনিময়ে মিথ্যা ফতোয়াও দিয়ে বসে।"

ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা যখন বেনারস বা গয়ায় তীর্থ করতে যায়, তখন তারা বিদায়ের পূর্বে তাদের বিষয় সম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করে যায়। বহুলোক মনে করতো হিজরত করা বড়ো কঠিন কাজ। এখন রেলপথ বসানো হয়েছে, এবং ভারত ও আরবের বন্দরগুলোতে জাহাজের যাতায়াতও সহজ হয়েছে। তার দুরুন মক্কাশরীফে সফর করতে যাওয়ায় লোকের উৎসাহ বেড়েছে। কিন্তু তার ফলেই মুসলমানদের চিরতরে ভারত ত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে কিনা, সঠিক বলা শক্ত। শাহ আবদুল আজীজ ছিলেন ভারতে বহু শতাব্দীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোমেন মুসলমান। কিন্তু তিনি দিল্লীতেই বাস করেছেন এবং সেখানেই মৃত্যু আলিঙ্গন করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মওলবী ইসহাক হিজরত করেছেন। আর সমকালীন হানাফীদের নেতা মওলবী কুতবউদ্দীনের রচনাসমূহ

---

[৮] ভারতীয় খ্রীষ্টানরা এই নামে আখ্যাত।

[৯] কেরামত আলী এখানে উল্লেখ করেছেন ফরিদপুর, বেনারস, শরাণপুর প্রভৃতি স্থানের ওহাবীদের; তাদের তুর্কী কর্তৃপক্ষ ১২৪৬ হিজরীতে মক্কায় গ্রেফতার করে ও বোম্বাই-এ চালান করে দেয়।

বিবেচনা করে ধারণা হয় যে, আজকাল গোঁড়া মুসলমানরা হিজরত সম্বন্ধে এরকম ধারণা করে, যা ওহাবীদের প্রচারিত মতবাদ থেকে খুব কমই পৃথক। আর তার তুলনায় মওলবী কেরামত আলীর মতামত অনেকখানি উদার। দিল্লীতে ১৮৬৭ সালে মুদ্রিত তাঁর 'ইমাম তাফাসীর' গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন :

> "আল্লাহ্‌র রসূল বললেন : 'আমি সে-সব মুসলমানের উপর নারাজ যারা মুশরিকদের মধ্যে বাস করে।' সাহাবারা একথা শুনে রসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন নারাজ হলেন?' রসূল বললেন, ঈমানের একটা বড়ো চিহ্ন এই যে, মুশরিকরা ও মুসলমানরা পরস্পরকে দূর থেকেও দেখতে পাবে না, আবার কাফেরদের থেকে মুসলমানরা এতোখানি দূরে থাকবে যে, তারা কেউ কারও ঘরের আগুনও দেখতে পাবে না। কাফেরদের মধ্যে বাস করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তার ফলে ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতা আসে কাফেরদের রীতিনীতি লক্ষ্য করে।"
>
> "সংক্ষেপে বলতে চাই, ভাইসব! আমাদের উচিত বর্তমান অবস্থার জন্যে ক্রন্দন করা, কারণ আল্লাহ্‌র রসুল আমাদের উপর বিরূপ রয়েছেন আমরা কাফেরের দেশে বাসা করছি বলে। যখন খোদ রসূলুল্লাহ্ আমাদের উপর বিরূপ রয়েছেন, তখন আমরা কার শরণাপন্ন হবো? আল্লাহ্ যাদের সামর্থ্য দিয়েছেন, তাদের উচিত হিজরত করা, কারণ এদেশে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমরা যদি সত্য কথা বলি, তাহলে আমাদের ফাঁসি যেতে হয়; আর যদি চুপ করে থাকি, তাহলে ধর্মচ্যুতি হয়।"

কুরআন থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাণীগুলি থেকে বিধানের অব্যর্থতা এবং সৎ ও ধর্মানুমোদিত কাজের ও ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্ব সুপরিস্ফুট; কুরআনের বিভিন্ন বাণীতেও এসব পালনের বিধান দেওয়া আছে। তার উপকারিতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ঃ

> হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, আগামীদিনের পূর্বে যেসব দেখেছো সেগুলি পুনরায় দেখা।
>
> তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো; নিশ্চয়ই তিনি অবগত আছেন তোমরা যা কিছু করছো।
>
> যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাকে নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বিপদ থেকে বাঁচান; আর তাকে আহার যোগান, যখন তা পাওয়ার মোটেই সম্ভাবনা থাকে না।
>
> যারা ধর্মাচরণ করে তাদের অতি নিকটে তিনি সঞ্চয় করে রেখেছেন বেহেশত, যার নিম্ন দিয়ে অনন্তকাল স্থায়ী নহর বয়ে যায়, আর যেখানে আছে পবিত্র ও ধর্মশীলা তরুণীগণ যাদের উপর আল্লাহ্ দয়ালু।
>
> আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট প্রাণিগণের অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

মওলবী কুতবউদ্দীন, যাঁর ফতোয়া তাঁর মুরীদরা অভ্রান্ত হিসেবে বিশ্বাস করে বলেছেন যে, তাদের তিনটির যে-কোনো একটি বেছে নিতে হবে : শাহাদত, হিজরত কিংবা পরলোকে অনন্ত শাস্তি। আর সরকারী কর্মচারীরা যেমন তাচ্ছিল্যভরে দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যের বিচার করে থাকেন, তার প্রতি বিদ্রূপ করেই তিনি তাঁর পুস্তকের শেষে বলেছেন যে, তাঁর কিতাবখানি আইনানুসারে রেজিষ্টারী করাও হয়েছে।

হানাফী সম্প্রদায়ের মুখ্য ব্যক্তি যদি এ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে ব্রিটিশ সরকার সম্ভবতঃ আর ধারণা করতে পারেন না যে, হানাফী ও ওহাবীদের মধ্যে কোনও রকম মতদ্বৈধতা আছে, অথচ আমরা এতোকাল তাই ভেবে এসেছি। বর্তমানে এমন অনেক চিহ্ন উপস্থিত, যা থেকে লক্ষ্য করা যায়, এককালে এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য ছিল, তা আংশিকভাবে ক্ষয়িত হয়েছে। আর আমাদের সম্মুখে যে পুস্তকটি আছে, তাও লেখক এমন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই একই মতামত পোষণ করে। আর আমরা একথাও জোর করে বলতে পারিনে যে, অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণও নেই। বহু বছর ধরেই মুসলমানরা অবহেলিত হয়ে আসছে, কিংবা আমাদের সন্দেহদগ্ধ প্রজা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা দেখানো হয়, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মুসলমানদের ব্যক্তিগত দাতব্য সম্পত্তিগুলোও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য কাজে লাগনো হয়। আমাদের বিশ্বাস, বিবেচনা ও উদারনীতি অবলম্বন করে নিশ্চয়ই এই অবহেলা দূর করা হবে। যা হোক, আমরা এই বিষয়টার আর অধিক আলোচনা করতে পারিনে; কারণ এমনিতেই আমরা এই নিবন্ধে অনেক দূরে গেছি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওহাবীদের ইতিহাস অনুসরণ করা। অতএব আমরা প্রসংগটা এখানেই ত্যাগ করছি এই আশা নিয়ে যে, আমাদের কোনো পাঠক হয়তো সাধারণের উপকারার্থে অগ্রসর হবেন, ব্রিটিশ অধিকারের পর হতে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় মতামতের যে বিভিন্ন স্তরে বিকাশ দেখা গেছে সে সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে। কারণ এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র মুসলমান পাঠকদের জন্য যে-সব পুঁথিপুস্তক মুদ্রিত আছে সে-সব যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে বলতে হয় যে, এটি ক্রমেই সরকারের বিরুদ্ধে অসহনীয় ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

ইনায়েত আলী মুজাহিদবাহিনীর সরদার হয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত জেহাদ শোষণার সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করতে চেষ্টিত হলেন। তিনি বাংলাদেশের খলিফাদের তাগিদ দিলেন এই উদ্দেশ্যের জন্যে সর্বশক্তি ব্যয় করতে এবং প্রচার করতে যে, সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব আসন্ন। আর ওহাবী প্রচারকরা সারা দেশটায় পুনরায় অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে তুললো ও এভাবে বিদ্রোহ প্রচার করতে লাগলো :

> "যারা অন্যকে হিজরত বা জেহাদ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করবে, তারা মুনাফেক বা কপট বিশ্বাসী। সকলেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার ঃ যে দেশে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের প্রাধান্য সে দেশে হযরত মুহম্মদের ধর্মীয় বিধিবিধান চালু হওয়া সম্ভব নয়। তখন মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে একতাবদ্ধ হওয়া ও কাফেরদের সংগে জেহাদ করা। বর্তমান সময়ে এদেশ থেকে হিজরত করা একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আলেমরা এ সম্বন্ধে সত্য ফতোয়াই দিয়েছেন। এখন যারা একাজ করতে নিষেধ করে, মোমেন মুসলমানরা শোনো, তাদের উচিত ভোগাসক্তির দাস হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করা। যারা একবার ইসলামের দেশে চলে যেয়ে আবার ফিরে আসে বিবেকে বিসর্জন দিয়ে এবং আর হিজরত করতে অনিচ্ছুক, তাদের জানা উচিত যে, তাদের বিগত সমস্ত পুণ্যফল

বিফল হয়ে গেছে। যদি সে এদেশ থেকে হিজরত না করে মারা যায়, তাহলে সে নাজাত বা মুক্তিলাভ থেকে বঞ্চিত হবে। এ জমানার মওলবী, পীর ও হাজীদের ইতিহাস পড়ো এবং জানো; এবং ভেবে দেখ, তাঁদের মধ্যে কে এদেশ থেকে হিজরত করেছেন এবং বিবেক বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছেন। কে বাস করছেন কাফেরদের সংগে এবং কেই-বা হিজরত বা জেহাদ করতে নিষেধ করছেন।"

যে-সব লোক হিজরত করতে কিংবা জেহাদে যোগদান করতে অক্ষম তাদের উপদেশ দেওয়া হতো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করতে এবং কাফের শাসকদের সংগে কোনও সম্পর্ক না রাখতে। আর এভাবে সরকারের মধ্যেই অন্য শক্তি সঞ্চয় করে সম্পূর্ণভাবে বিরুদ্ধাচরণ করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। বিধর্মীদের সাহায্য গ্রহণ অনুচিত। তাদের আদালত সুদের ডিক্রী দেয়, অতএব সেগুলো বর্জন করা উচিত। আর মুসলমান ভায়ে-ভায়ে যেসব ঝগড়া-বিবাদ হয়, সেগুলি নেতাদের দ্বারা মীমাংসা করে নেওয়া উচিত। হযরত মুহম্মদের আইন হিসেবে এসব অজ্ঞ লোক যাই ভাবে, তাই প্রয়োগ করে। কারণ আল্লাহ্ কি আদেশ করেননি, "আর আল্লাহ্‌র নামে বলছি, তারা তখনও পূর্ণবিশ্বাসী হবে না, যতক্ষণ তোমাকে তাদের বিরোধের বিচারক না করছে, এবং তুমি যা বিচার করে দেবে, তাই গ্রহণ করতে তারা অন্তরে কষ্ট অনুভব না করছে এবং সর্বতোভাবে নির্ভর করে তা মেনে না নিচ্ছে?"

ইনায়েত আলীর সমর্থনে ব্রিটিশ ভারতে ওহাবীদের যে কার্যকলাপ চলেছিলো, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে মিঃ র‍্যাভেন্স কর্তৃক বাংলা সরকারকে প্রদত্ত রিপোর্টের ১৫২ পৃষ্ঠায়। নীচে তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেলো :

> "পাঞ্জাব সরকার ১৮৫২ সালে বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্রের একখানি চিঠি আটক করে ফেলে। তাতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, পার্বত্য অঞ্চলে যেসব হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধ থাকতো, তারা কীভাবে রাওলপিণ্ডিতে অবস্থিত ভারতীয় রাজকীয় বাহিনীর চতুর্থ রেজিমেন্টকে তাদের সংগে যোগাযোগ করতে প্ররোচিত করেছিলো। এই ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয় পাটনায়। আর যেসব চিঠিপত্র আটক করা হয়, তাতে উল্লেখ ছিল যে, সাদিকপুরের মওলবীরা ও বহু কাফেলা লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তখন সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এই রকম একখানা স্বাক্ষরহীন ও তারিখবিহীন চিঠি লেখা হয় পেশোয়ার থেকে। তাতে বলা হয়েছিলো, মওলবী বিলায়েত আলী এবং আজীমাবাদের মওলবী ইলাহী বখশ সাহেবের পুত্রগণ মওলবী ইনায়েত আলী, মওলবী ফয়েজ আলী, মওলবী ইয়াহ্য়া আলী এবং দিনাজপুরের মওলবী করম আলী (তিনি একজন দরজী ছিলেন) তখন সিত্তানায় অবস্থান করতেন সোয়াতের আকবর বাদশাহের সংগে, এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই সৈয়দ আকবর শাহের সম্বন্ধে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি ছিলেন সোয়াত উপত্যকার নির্বাচিত শাসক। চিঠিটা লেখা ছিল এই মর্মে : আজীমাবাদের মওলবী বিলায়েত আলীর ভাই মওলবী ফরহাত আলী এবং মওলবী ফয়েজ আলী ও ইয়াহ্য়া মওলবী আলী ভাই মওলবী আহমদউল্লাহ্ তাঁদের বাড়ীতে ও গ্রামে অন্যান্য লোকের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করতেন এবং অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতেন। অন্যান্য চিঠিতে জানা যায়, মানুষ ও অস্ত্রাদি পাটনা

থেকে মিরাট ও রাওলপিণ্ডির মধ্য দিয়ে চালান দেওয়া হতো এবং এসব জায়গায় লোক নিযুক্ত থাকতো সীমান্তে জেহাদের জন্যে সেগুলো পৌছিয়ে দিতে।

"পাঞ্জাব সরকারের প্রদর্শনে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট মওলবী আহমদউল্লাহ্‌র খানসামা হোসেন আলী খানের বাড়ীতে তল্লাশি করেন; কারণ এরকম সন্দেহ হয়, চিঠিপত্র সেখান দিয়েই আদান-প্রদান হতো। এ খবর পাওয়া যায় একজন দেশীয় ডাক্তার বা হেকিমের মারফত। তখন পাটনার ষড়যন্ত্রকারীরা সাবধান হয়ে যায় এবং বাড়ীর সব চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলে। যাহোক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রিপোর্ট পাঠান, ওহাবী সম্প্রদায় তখন বেড়েই চলেছে এবং জেহাদ প্রচার করা হয় মওলবী বেলায়েত আলী, মওলবী আহমদউল্লাহ্ ও তাঁর পিতা ইলাহী বখশের বাড়িতে। তিনি আরও রিপোর্ট পাঠান যে, স্থানীয় ওহাবীদের সংগে পুলিশের যোগাযোগ আছে, আর তার দরুন ওহাবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি মওলবী আহমদউল্লাহ ছয়-সাত শ' সশস্ত্র লোক তাঁর বাড়িতে জমায়েত রেখেছিলেন, এবং দরকার হলে এ সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্ত প্রচেষ্টায় বাহুবলে বাধা দিতে ও বিদ্রোহের নিশান তুলতেও প্রস্তুত ছিলেন।[১০]

"বিষয়টি তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড ডালহৌসির নিকট পেশ করা হয় ১৮৫২ সালের ২০শে আগষ্ট। তিনি তখন বিষয়টিতে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন যে, পাটনা ও সীমান্তের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সম্বন্ধে সরকার ওয়াকিফহাল এবং তিনি এ নির্দেশ দেন যে, পাটনার বিদ্রোহীদের উপর যেন কড়া নজর রাখা হয়।

"১৮৫২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কাউন্সিল বৈঠকে আর একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয় এই চিঠিপত্র সম্বন্ধে পাঞ্জাব সরকারের চিঠির উল্লেখ করে, এবং সীমান্তের আদি জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধাভিযানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে; কারণ বাঙালি হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধরা তখন তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। একটা ফৌজদারী মামলা হয় চতুর্থ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর মুনশী মুহম্মদ ওয়ালীর বিরুদ্ধে রাওলপিণ্ডিতে এবং বিচারে তিনি ১৮৫৩ সালের ১২ই মে দণ্ডিত হন। তখন মওলবী আহমদউল্লাহ্ ও পাটনার বহু অধিবাসীর নাম সাক্ষ্যে উঠে যে, তাঁরা সীমান্তের ধর্মান্ধদের নিকট রসদ সরবরাহ করতেন।

"বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সরকার তখন কঠিন নীতি অবলম্বন করেননি এবং পাটনার ষড়যন্ত্র ভেঙে ফেলেননি। তাহলে রাজদ্রোহের দমন হয়ে যেতো, আম্বালা অভিযানে কোন সৈন্যক্ষয় হতো না এবং সরকারী কর্মচারীরাও বহু পরিশ্রম ও অহেতুক ভর্ৎসনা থেকে বেঁচে যেতেন। কারণ ১৮৬২ সালের রাজদ্রোহী আহমদউল্লাহ্ হচ্ছেন ১৮৫৭ সালের সামান্য পুস্তকবিক্রেতা 'ওহাবী ভদ্রলোক'।"

---

[১০] আহমদউল্লাহ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও বিপ্লবী ছিলেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর বিচার করা হয় ও সেসন জজ তাঁর ফাঁসির হুকুম দেন ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত হয়। হাইকোর্ট ফাঁসির হুকুম বদল করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেন—(অ)।

এদিকে ইনায়েত আলী উত্তর-পশ্চিমে নিশ্চেষ্ট থাকেননি। পাঠান আদিবাসীদের সাহায্য লাভের জন্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করছিলেন এবং সোয়াতের আখুন্দ ও সিত্তানার সৈয়দ সাহেবের সহানুভূতি লাভেও সক্ষম হয়েছিলেন। এমন সময় অবস্থাগতিকে তাঁকে অসময়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সংগে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়। সিত্তানার উত্তরে অনতিদূরে সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তীরে আম্বের করদরাজ্য অবস্থিত। সমতলভূমি ও সিত্তানা থেকে সেখানে সহজেই যাওয়া যায় এবং বিলায়েত আলীর জীবদ্দশায় নও-মুজাহিদদের কাফেলা আম্বের ভিতর দিয়ে সিত্তানায় যাতায়াত করতো। কিন্তু ইনায়েত আলী যখন আদিবাসীদের জেহাদের পক্ষে একত্রিত করেন, তখন আম্বের শাসক জাহাঁদাদ খান এই উদ্যমে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন এবং ইংরেজদের সংগে মিলিত হয়ে মুজাহিদদের তাঁর এলাকার ভিতর দিয়ে পথ দিতেও অস্বীকার করলেন। ১৮৫২ সালের প্রথম ভাগে জেহাদীদের একটি কাফেলা আম্বের ভিতর দিয়ে জোর করে অতিক্রম করতে চেষ্টা করলে তাদের লুট করা হয়। ছিন্নবেশে ও অনাহারে তারা সিত্তানায় উপস্থিত হলো। ইনায়েত আলী এতে অপমানিত বোধ করেন এবং সোয়াতের আখুন্দের ও সিত্তানার সৈয়দদের সাহায্য দাবী করেন। ওহাবীরা ছোট-বড়ো যে কাজই করুক, ধর্মের নামে করে থাকে। মওলবীদের একটা মজলিস ডাকা হয়। জাহাঁদাদ খান কাফের বিবেচিত হন এবং তাকে উৎখাত করতে জেহাদ করা পুণ্যের কাজ হিসেবে ফতোয়া জারী করা হয়। আখুন্দ সাহেব সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হওয়ার উৎসাহ দেওয়ায় ইনায়েত আলী পার্বত্য অঞ্চল থেকে নিচে আম্বের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বিনা বাধায় আসুরা নামক গ্রামখানি দখল করে নিলেন। তারপর তিনি আসুরা ও আম্বের মধ্যবর্তী নিম্ন গিরিমালা অতিক্রম করলেন। জাহাঁদাদের সৈন্যদের কিল্লাহ্‌র মধ্যে বিতাড়িত করলেন এবং উপত্যকাটি দখল করে অবরুদ্ধ লোকদের সব যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিলেন। তারা আর প্রতিরোধ করা অনর্থক দেখে একখানি কুরআন নিশান নিসেবে উর্ধ্বে ধরে সন্ধি প্রার্থনা করলো। কিছু দেরী করে জাহাঁদাদ খান ইনায়েত আলীর মুরীদ হতে এবং তাঁর অধীনে রাজ্য শাসন করতে স্বীকৃত হলেন এই শর্তে যে, আক্রমক-বাহিনী উপত্যকা থেকে সরে যাবে এবং সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত আসুরার অপেক্ষা করবে। কূটনীতিতে বাঙালি পাঠানের মতো ধুরন্ধর ছিলেন না। জাহাঁদাদ খান কালক্ষেপণের দুরভিসন্ধিতে বশ্যতাস্বীকারের ভাণ করেছিলেন মাত্র। তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র একজন দূত পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাহায্য ভিক্ষা করে। এখন সাহায্য না আসা পর্যন্ত সন্ধির শর্তবিষয়ে টালবাহানায় সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি দু'দিন ধরে ওহাবীদের এটা সেটা কুচকাওয়াজে ব্যস্ত রাখলেন, কিন্তু তৃতীয় দিন সকালবেলায় দেখা গেল যে, আসুরার উল্টা দিকে পূর্ব তীরে ব্রিটিশ বাহিনী শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা দ্রুতগতিতে নদী পার হলো এবং আসুরা ও সিত্তানার মধ্যবর্তী গিরিবর্ত্মটি দখল করে জেহাদীদের তাদের কিল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করলো। এদিকে জাহাঁদাদ মুখোশ খুলে ফেলে উত্তর থেকে নিম্নে অগ্রসর হয়ে আম্বের পথপার্শ্বের পাহাড়ে ছাউনি ফেলে সেদিকে ওহাবীদের গতিবিধি একেবারে বন্ধ করে দিলেন। ধর্মান্ধরা সমূহ বিপদ দেখে সিত্তানার দিকে পলায়ন করলো, আর তখন তাদের বাহিনী ও ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে এক উত্তেজনাময় দৌড় শুরু হলো, কে আগে গিরিবর্ত্মটি অধিকার করবে। ওহাবীরাই সেখানে প্রথমে পৌছাতে সমর্থ হলো এবং

ইনায়েত আলীর অধীনে ওহাবীদের প্রধান বাহিনী পলায়ন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু দিনাজপুরের করম আলীর চালনায় পশ্চাদরক্ষীদল একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলো।

ওহাবীদের এই পরাজয়ে ইনায়েত আলী সাবধান হয়ে গেলেন এবং পরবর্তী কয়েক বছর সীমান্তে আর গোলযোগ ঘটেনি। তিনি ভ্রাতার মতো বুদ্ধিমানের নীতিই অবলম্বন করলেন এবং অনুচরদের সংঘবদ্ধ করতে এবং কাফের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় জ্বলে উঠে দারুণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। জেহাদীদের দৈনিক দু'বেলা ড্রিল করানো হতো এবং প্যারেডের সময় তাদের জেহাদের মহিমা কীর্তন করে গান করানো হতো। আর শুক্রবার নাজামের পর তাদের শ্রবণ করানো হতো বেহেশতে তাদের জন্যে কতো সুখ মওজুদ আছে। আরও বলা হতো ব্রিটিশ ভারত অধিকারের নির্দিষ্ট সময় সমাগত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে।

নিচে উদ্ধৃত সংগীতটাই বোধ হয় ওহাবীদের সবচেয়ে প্রিয় ও অতিপুরাতন ছিলো। এটাকে বলা হতো 'রিসালা-ই-জিহাদ' বা যুদ্ধ-সংগীত :

প্রথমে আল্লাহ্‌র মহিমা গাই, তিনি সব প্রশংসার উর্ধ্বে,
আমি রসূলের প্রশংসা করি আর জেহাদের গান গাই।
জেহাদ ধর্মের যুদ্ধ, তাতে ক্ষমতার লালসা নেই।
হাদীস ও কুরআনে তার মহিমা ঘোষিত। আমি কিছু বলছি শোনো,
পায়ে যার জেহাদের ধূলি আছে, দোজখে তার শাস্তি নেই,
যে এক মুহূর্তও আল্লাহ্ থেকে সরে যায়, বেহেশতে তার স্থান নেই।
রসূলের বাণী এই হাদীসটি শোনো—
'তরবারির ছায়ায় বেহেশত্ রয়েছে।
যে প্রশান্ত চিত্তে জেহাদে এক পয়সাও খরচ করে,
অতঃপর সে তার সাতশো গুণ বদলা পাবে।
আর যে জেহাদে দান করে এবং নিজেও শরীক হয়
আল্লাহ্ তাকে সাত হাজার গুণ বদলা দেবেন।
আল্লাহ্‌র রাহে যে একজন মুজাহিদকে সজ্জিত করে,
সে নিশ্চয়ই শহীদের পুরস্কার লাভ করে।
যে জেহাদে সাহায্য করে না, কিংবা শরীক হয় না,
এ দুনিয়াতেই তার কঠিন শাস্তি অবধারিত।
জেহাদে যে নিহত হয়, সে মরণ তো মরণ নয়,
সে হাসতে হাসতে বেহেশ্‌তে চলে যায়।
কেন তুমি আল্লাহ্‌র পথে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছ না'?
আল্লাহ্‌র হুকুম, শহীদের সব ছেলেই মাফ পেয়ে যাবে।
তাদের গোর-আযাব মাফ হয়ে যায়,
রোজ কেয়ামত বা রোজ হাশরে তাদের ভয় নেই।
আল্লাহ্ ভালবাসেন শুধু তাদের, যারা
জেহাদের ময়দানে অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
হে মোমেনগণ! জেহাদের মহিমা শুনলে, যাও যুদ্ধে যাও,

তোমার পরিবার, তোমার সম্পত্তি এসব কিছু ভেবো না।
ধন-জন-পরিবার-ঘর, সব কিছুরই বাসনা ত্যাগ করো,
যাও যুদ্ধের ময়দানে, আল্লাহ্‌র রাহে চলো।
মরণের পরে ধন-পরিবার নিয়ে কবরে যাবে না,
সাবধান, দোজখের শাস্তি থেকে রেহাই নেই তোমার।
যদি তোমার বরাতে থাকে, নিশ্চয়ই ঘরে ফিরবে,
আর যদি শহীদ হও, নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তে চলে যাবে।
আজ দুনিয়াতে ইসলামে বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে,
আর কাফেরদের ধর্ম তার স্থলে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
আগের জমানার মুসলমানরা যদি জেহাদ না চালাতেন,
তাহলে হিন্দুস্তানের বাসিন্দা কীভাবে মুসলমান হতো?
ইসলামের শক্তি সবকালেই ছিল তরবারির মুখে;
তাঁরা যদি নিষ্ক্রিয় থাকতেন, ইসলাম অজ্ঞাত রয়ে যেতো।
আর কতোকাল ঘরে নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে,
এতে কোনও লাভ নেই, শেষে তোমায় অনুতাপ করতে হবে।
অতএব ভীরু হয়ো না, ইমামের সংগে যোগ দাও।[১১]
আর কাফের দলনে তৎপর হও।
আল্লাহ্‌র মহিমা গাও, তিনি এক মহান ব্যক্তি পাঠিয়েছেন
আমাদের মধ্যে তেরশো হিজরীর মধ্যে।
মুসলমানরা ইমামবিহীন হয়ে অশেষ দুর্দশা পাচ্ছিলো,
শেষে রসূলের বংশেই এক ইমাম উদয় হলেন।
বন্ধুরা সব শোনো, আমি নিগম কথা বলছি,
তলোয়ার চালাবার দিন এসে গেছে।
মওলবী সা'ব! গ্রন্থ ছাড়ো আর তলোয়ার ধরো,
আর যাও ছুটে যাও জেহদের ময়দানে।
সময় এসেছে এখন প্রাণ কুরবানী দেওয়ার;
তর্ক ছাড়ো, সব ছাড়ো, শুধু তলোয়ার মুঠি ধরো।
তুমি তো নেতা, তুমি সৎ আদর্শ দেখাও।
তুমি আগুয়ান হলে বহু পরিজন তোমার সংগী হবে।
হে ফকীরগণ! আত্মনিগ্রহের শিক্ষক তোমরা,
জেহাদের চেয়ে আত্মনিগ্রহের আর কী আদর্শ হবে?
তোমার 'চিলা'।[১২] ছাড়ো এখন জেহাদের ডাক পড়েছে!
হে তরুণ! বাঘের মতো সাহসী ও রুস্তমের মতো বীর তুমি,
এখন আগুয়ান না হও যদি, বীরত্বে কী ফল?
তুমি নিহত কর বা নিহত হও, সমান লাভ;

---

[১১] ইমাম অর্থে সৈয়দ আহমদকে বোঝানো হয়েছে।

[১২] ফকীরদের মধ্যে প্রথা আছে 'চিল্লা' নেওয়া, অর্থাৎ চল্লিশ দিন নির্জন বাস করে অহোরাত্র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা।

একজন কাফের হত্যা করলে তুমি জয়ী হলে;
আর যদি তুমি নিহত হও, শাহাদত লাভ করলে।
একদিন তুমি দুনিয়ার সব আনন্দ ছেড়ে যাবে,
মরণ সেদিন তোমায় এখান থেকে মুছে ফেলবে।
শোনো বন্ধু শোনো! মরণ যখন হবেই হবে,
তখন কেন তুমি নিজেকে আল্লাহ্‌র রাহে বিলিয়ে দিচ্ছ না?
হাজারো মানুষ যুদ্ধে যায়, আর অক্ষত হয়ে ফিরে আসে,
হাজারো মানুষ তো ঘরে বসেই মৃত্যুর কবলে পড়ে।
হে জ্ঞানী ভাই! মৃত্যুর ক্ষণ অবধারিত, তবে কিসের ভয়?
মরণ না এলে মানুষ মরে না, অবধারিত ক্ষণের আগেও মরে না।
মরণ যখন আসে তখন ঘরে থাকলেও রেহাই নেই।
তুমি কি পথের শ্রমে বিমুখ? এসব ভয় ছাড়ো;
তুমি পুরুষ মানুষ নিজের আরাম-আয়েশ ভুলে যাও।
পুরুষ সব কিছুর অভ্যাস সহজে করতে পারে,
সে আরাম-আয়েশের অভ্যাসও ছেড়ে দিতে পারে।
চেয়ে দেখো হাজারো মুজাহিদ ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে।
আর এতোটুকু দুঃখ না করে যুদ্ধে প্রাণ দিতে তৈরী হয়েছে।
আশ্চর্য যে তোমরা নিজেদের মুসলমান বলছো।
তবু আল্লাহ্‌র রাহে ডাক পড়লে প্রতারণা করছো।
তোমরা দুনিয়ায় মশগুল হযে পড়েছো,
স্ত্রী-পুত্র-কন্যার চিন্তায় নিজের স্রষ্টাকে ভুলে গেছো।
কতোদিন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘরে থাকতে পারবে?
আজ যদি আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ কুরবানী দাও,
কাল তুমি বেহেশ্‌তে অনন্ত সুখ লাভ করবে।
ঘরে বসে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করা আর
আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দেওয়া, কোন্‌টা ভালো?
আল্লাহ্‌র রাহে যদি জীবন বিলিয়ে না দাও,
তোমার অনুতাপ হবে, রসূলকে কি করে মুখ দেখাবে?
এক কাজ করো, মন-প্রাণ দিয়ে ইমামের আজ্ঞানুবর্তী হও,
তা না হলে তোমার তরবারি ধরাই বৃথা হবে।
যদি কোন স্বেচ্ছাচারী লোক জেহাদে যায়,
সে যতো নিহত করবে, সবার জন্যে দায়ী হবে, তার শ্রম বৃথা যাবে।
যারা আল্লাহ্‌কে জানে আর জানে রসূলকে,
তারা বিনা দ্বিধায় ইমামের আজ্ঞানুবর্তী হবে।
এসব উপদেশ মুসলমানদের পক্ষে যথেষ্ট,
এখন আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করে শেষ করি।
হে আসমান-জমীনের স্রষ্টা! হে আমাদের প্রভু!
মুসলমানকে জেহাদ করতে শক্তি দান করো!

তাদের বাহুকে শক্তিশালী করো,
আর তাদের জয়ী করে তোমার ওয়াদা পূরণ করো!
ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের মহিমা গাও,
আর সব ধ্বনি ছাপিয়ে শুধু শোনাও 'আল্লাহ্' আল্লাহ্!

পঞ্চপঞ্চাশতম দেশীয় পদাতিক বাহিনী হোটিমর্দানে বিদ্রোহ করলে বিদ্রোহীরা পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে ও সোয়াত উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের বৃহদংশ আখুন্দের নিকট উপস্থিত হলে তাদের তিনি পর্বতমালা অতিক্রম করে কাশ্মিরে উপস্থিত হতে সাহায্য করেন, যাতে তারা হিন্দুস্তানে নিজের দলের সংগে যোগ দিতে পারে। তাদের কেউ কেউ ইনায়েত আলীর সংগে যোগ দিলো মুংগল-আন্নায়। এটি সিত্তানা থেকে একদিনের পথের দূরবর্তী মহাবনের মাথার উপর একটা সুরক্ষিত কিল্লাহ্। তিনিও তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন, কিন্তু দাবী করলেন যে, তাদের ওহাবী মতাবলম্বী হতে হবে। অতঃপর তিনি সোয়াত থেকে সৈয়দদের সর্দার মুবারক শাহ্কে তলব করলেন এবং নিজের সমগ্র বাহিনী নিয়ে নিম্নে অবতরণ করে সীমান্তের একটা গ্রাম চিনঘাইতে ছাউনি ফেললেন। তারপর দ্রুত প্রস্তুতি চলতে লাগলো ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত ইউসুফজাই অঞ্চল আক্রমণ করার।

ইউসুফজাই অঞ্চলের পূর্বদিকে এবং চিনঘাই-এর অনতিদূরে, নওয়াখিল্লা গ্রাম অবস্থিত। তার বাশিন্দাদের সুনাম নিকটবর্তী অঞ্চলে মোটেই ঈর্ষাজনক ছিল না। অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ এবং সীমান্তের বাশিন্দাদের স্বভাবজাত চঞ্চলমতির জন্যে তারা শাসক পরিবর্তন করতে মোটেই অনিচ্ছুক ছিল না। আর ইনায়েত আলীও তাঁর প্রতি তাদের সদিচ্ছার বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন। এজন্যে তিনি দু'শ' মুজাহিদ এবং মুবারক শাহের একশ' কুড়িজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আফ্রিদী মির্জা মুহম্মদ রিসালদারের নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন গ্রামখানি দখল করে নিতে। আফ্রিদী মির্জা নওয়াখিল্লায় উপস্থিত হয়ে তার ও নিকটবর্তী গ্রাম শেখজানার মধ্যস্থলে ছাউনি ফেললেন। কিন্তু জেহাদীদের সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ হোটিমর্দান থেকে একটি ব্রিটিশ বাহিনী তাদের আক্রমণ করে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তাদের নায়ককে বন্দী করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। তার একমাস পরে ইনায়েত আলী সমগ্র বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ এলাকার সীমান্তস্থিত গ্রাম নারিঞ্জি দখল করে নেন। এই আক্রমণের সংবাদ শীঘ্রই পেশাওরে পৌছালে তথাকার ডেপুটি কমিশনার কিছু সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন জেহাদীদের সীমান্তের বাইরে বিতাড়িত করতে। তখন একটা যুদ্ধ বাধে। কিন্তু ওহাবীরা বনায়ের ও সোয়াত আদিজাতিদের বলিষ্ঠ সাহায্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় আক্রমণটা সফল হয় এবং ওহাবীরা বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে পলায়ন করে এবং চিনঘাই ও বাগে আশ্রয় লয়। পরপর দু'বার বিতাড়িত হয়ে ইনায়েত আলী বেশ বুঝলেন যে, একা তাঁর দ্বারা বিজয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। তখন তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন সীমান্তের আদি জাতিদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে একজোট করতে। তিনি আপোষের নীতি অবলম্বন করলেন এবং পার্বত্য আদিজাতির সর্দারগণকে প্রচুর ইনাম পাঠালেন। আর একজন অবিবেচক কিন্তু সাহসী কমিশনার নাওয়াখিল্লায় ছাউনি ফেললে তাঁকে সহসা পরাজিত করে বিজয়টাকে ইনায়েত আলী কাফেরদের উপর

অবধারিত বিজয় হিসেবে অহেতুকভাবে সর্দারদের চোখে বাড়িয়ে তুললেন এবং যুদ্ধে লুণ্ঠিত সমস্ত দ্রব্য তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। সংক্ষেপে তিনি পাঠানদের ধর্মান্ধতা ও লোলুপতা বৃদ্ধি করতে সব পন্থা অবলম্বন করেন ও তাদের জেহাদ করতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু পাটনার কমিশনারের সাবধানতা ও প্রচেষ্টায় ইনায়েত আলীর সব অভিসন্ধিই পণ্ড হয়ে যায় এবং তার ফলে সম্ভবতঃ একটা সীমান্ত-যুদ্ধও এড়ানো গেলো, সিন্ধু নদের পারাপারের সব ক্ষেত্রেই কঠিন পাহারা রক্ষিত হলো এবং তার দুরুন নিম্নাঞ্চলের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। পাটনায় তাঁর সব আত্মীয়-স্বজনকে বন্দী করা হয় এবং তার ফলে বার বার সাহায্য প্রত্যাশা করেও কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। তাঁর অর্থও ফুরিয়ে এলো এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও অতি নামমাত্র মূল্যে দিতে বাধ্য হলেন। চিনঘাইয়ে আর অবস্থান করা সমীচীন নয় দেখে তিনি রুগ্নদেহে ও হতোদ্যম হয়ে অভুক্ত অনুচরদের নিয়ে সিত্তানায় বন্ধুভাবাপন্ন সৈয়দদের সংগে যোগ দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সেখানে পৌছাতে সক্ষম হননি। পথেই পর্বতমালার মধ্যে তিনি মৃত্যু আলিংগন করেন। আর বারোদিন পর একটি ব্রিটিশ বাহিনী সিত্তানা ও মুংগলআন্না পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

পরিশিষ্ট

ওহাবী আন্দোলনে'র রূপরেখা

বিশ্বনবীর ওফাতের পর মাত্র আশী বছরের মধ্যে (৬৩২—৭১২ খৃঃ) 'পশ্চিমে হিস্পানী শেষ, পূর্বে সিন্ধ হিন্দুদেশ' পর্যন্ত সমকালীন জ্ঞাত পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী অঞ্চলে আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বিশ্বেতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। চীনদেশের সীমান্ত থেকে অতলান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ মরুচর যাযাবর আরবজাতির পদানত, পারস্যের খসরু ও রোমান সীজারের জন-প্রবাদমুখর সাম্রাজ্যশক্তি পর্যুদস্ত এবং বাগদাদে এমন একটি শক্তিধর ও উচ্চতম সংস্কৃতি ধন্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার তুলনা তখনও পৃথিবীতে দেখা যায়নি।

এসব বিজয়-অভিযান ও সাম্রাজ্যবিস্তৃতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বেশুমার সম্পদসম্ভার ও অগণিত বিদেশী বিলাস সামগ্রী আরবে আমদানি হতে থাকে। কৃপণস্বভাবা প্রকৃতির মরুদুলালরা অতি শীঘ্রই তাদের সহজ সরল রুক্ষ স্বভাব ত্যাগ করে বিলাস-ব্যসনের স্রোতে হাবুডুবু খেতে লাগলো। ইরানী তন্বী রূপসী বাঁদী ও সিরাজীর আদর আরবের ঘরে ঘরে দেখা যায়। এসবের বিষময় ফলে মুসলমানের জাতীয় জীবনে যে ব্যভিচারিতার আমদানি হয়, তার প্রতিচ্ছবি কুটির থেকে শুরু করে দামেস্কের ও বাগদাদের খলিফার রাজপ্রাসাদে অতি বীভৎসরূপে দেখা দেয়। শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মুসলিম রাজপরিবারে এসব বিলাস-ব্যসন চলতে থাকায় মুসলমান সমাজের মধ্যে এগুলি যেন গা সওয়া হয়ে যায়। এজন্যে দেখা যায়, আঠার শতকে তুর্কীর সুলতানরা হজ্জের মৌসুমে মক্কা ও মদিনায় যেমন দান-খয়রাতে মুক্তহস্ত হতেন, তেমনি প্রকাশ্য রাজপথে সুরা ও আফিমের সংগে বারবিলাসিনীদেরও শোভাযাত্রা করতেন—কারও শাসনবাণীতে এসব সংযত হতো না।

এসব ছাড়াও আরো বহু শরীয়ত-বিরুদ্ধ রীতিনীতি মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ঢুকে পড়ে। নানা দেশ বিজয়ের ফলে নানা জাতি ও নানান ধর্মের সংস্পর্শে মুসলমানরা আসতে বাধ্য হয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে।

প্রভাব, আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের কারণ এবং বিভিন্ন জাতির নও-মুসলিমদের পূর্বপুরুষের আচার-নীতি ইসলাম গ্রহণের পরও অনুসরণ করার ফলে মুসলমানের জীবনে এসব বেদাত বা শরীয়ত-বিরুদ্ধ আচার-নীতি সংক্রমিত হয়েছিল। আর কালক্রমে এসব নয়া রীতি-নীতির কয়েকটি মুসলমানের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে একটা ধর্ম সম্মত অনুমোদনও লাভ করেছিল। এরূপ সচল বা সমাজ আচরণীয় হওয়া সম্ভব হয়েছিল ইজমার প্রয়োগে। ইজমার কাজ ছিল, যা প্রথমে বেদাত হিসেবে অধর্মীয় বিবেচিত হতো, তাকে সচল ও আচরণীয় করে শরীয়তসম্মত করা। অতএব ইজমার সহজ অর্থ হচ্ছে, যা কিছু মুসলমানদের মধ্যে শাস্ত্রকারদের অনুমোদনে অথবা বিনা আপত্তিতে গৃহীত হয়েছে, সেগুলি কুরআন ও হাদিসের পরেই ইসলামী বিধিনিষেধ হিসেবে গৃহীত হবে। ইজমার দরকার হয়েছিল, অমুসলমানদের সাহচর্যে যে-সব নয়া রীতি-নীতি মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল, খাঁটি শরীয়তপন্থী না হলেও সেগুলিকে মুসলমানদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দরুন শরীয়তী অনুমোদন দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে পীরপূজা ও পীর মতবাদের আনুষঙ্গিক সকল রকম রেওয়াজের কথা

উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে একথাও অবশ্যস্বীকার্য, ইজমার বেনামীতে কত বেদাত বা শরীয়ত-বিরুদ্ধ অনাচার ইসলামে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তার হিসেব করাও এক শক্ত ব্যাপার।

এ সবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে সাবধান বাণী ঝংকৃত হয়েছিল তের-চৌদ্দ শতকে ইবনে তাইমিয়ার (৬৬১ হিজরী/১২৬৩ খ্রীঃ—৭২৮ হিঃ/১৩২৮ খ্রীঃ) কণ্ঠে। ইসলামী অনুশাসনে ইজমার প্রয়োগ নিষেধ করে তিনি প্রচার করেন যে, কুরআনের বিধি-ব্যবস্থা আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তার বাধ্য করতে হলে কুরআনেরই আশ্রয় নিতে হবে। হাম্বলী মযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ইবনে তাইমিয়া যাবতীয় বেদাতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দান করেন এবং পীরবাদ ও তার আনুষঙ্গিক সব অনুষ্ঠানকে নিছক পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেন। ইসলামে 'পিউরিটানিক' বা অতিনৈতিক মতবাদের গোড়াপত্তন হয় ইবনে তাইনিয়ার শিক্ষা থেকেই।

অতঃপর আঠারো শতকে আর এক ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব। উল্লেখ্য যে, এই চার শতাব্দীর ব্যবধানে ইসলামে আয়ত্ত বহু বেদাতের এবং নানা অনাচারের প্রবেশলাভ হয়। হাজীদের মধ্যেও নানা গর্হিত আচরণ এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহরে বহু নাটকীয় ধরনের পূজা-পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। তুর্কী ও ইরানীর বদৌলতে ইসলামে বহু সংস্কার ও আবর্জনা জমে উঠে। তারা বাঁদীর বেনামীতে অসংখ্য রমণীয় সাহচর্যেই পরিতৃপ্ত হতো না, প্রকাশ্যে বারবিলাসিনী ও নৃত্যবাদ্যকুশলা রমণী নিয়ে মাতামাতি করতো, সুরা ও আফিমের প্রভাবে রাজপথেই মাতলামি করতো এবং আরো বহু নীতি ও রুচি-বিগর্হিত পাপ কর্মে লিপ্ত থাকতো। এসব অনাচার, ব্যভিচারের মূলোচ্ছেদ করাই ছিল আবদুল ওহ্হাবের জীবনব্যাপী সাধনা। এবং তাঁর এই ভূমিকাকেই তার দুশমনরা, বিশেষত ইউরোপীয়রা ওহাবী আন্দোলন নামে চিহ্নিত করেছে। তবে তাঁর আন্দোলনের শেষ পরিণতি অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায়, মূলতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হলেও বিশ শতকে এর দ্বারাই আরবী ন্যাশনালিযম্ পূর্ণভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। ইসলামের প্রথম যুগের মতো আবদুল ওহ্হাবও চেয়েছিলেন, সবরকম পৌত্তলিক অনাচারের মূলোৎপাটন করে খাঁটি তওহীদ বাণীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরবের সবরকম রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে শুধু ইসলামী সাম্য ও মৈত্রী-নীতির সূত্রে সমগ্র আরবভূমিকে এক রাষ্ট্রে বেঁধে দিতে।

আবদুল ওহ্হাবের এই দ্বিবিধ ভূমিকার আলোচনা পৃথকভাবে করাই প্রশস্ত।

২

প্রথমে মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের চরিতালোচনা করা যাক। সম্ভবত ১১১৫ হিজরীতে (১৭০৩ খ্রীঃ) আরবের উয়াইনা অঞ্চলে তামিম গোত্রের একটি শাখা বানু-সিনান বংশে তাঁর জন্ম হয়। মদিনায় সুলায়মান অল-কুর্দী ও মুহম্মদ হায়াত অল-সিন্ধির নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু দুজন ওস্তাদই তাঁর অধর্মীয় মনোবৃত্তির (ইলহাদ) জন্যে দোষারোপ করেন। তাঁর জীবনের অধিককাল দেশভ্রমণে কেটেছে। প্রথমে তিনি

চার বছর বসরার কাযী হুসেনের বাটীতে গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরে পাঁচ বছর তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং সেখানের জনৈকা ধনবতী বিধবাকে শাদী করেন। এ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পথে বের হন এবং এক বছর কুর্দিস্তানে ও দু'বছর হামাদানে অবস্থান করার পর ইসপাহানে উপস্থিত হন। তখন নাদির শাহের শাসন শুরু হয়েছে (১১৪৮ হিঃ, ১৭৩৬ খ্রীঃ)। এখানে তিনি চার বছর অবস্থান করেন এবং এরিস্টটলের দর্শন ও সুফীতত্ত্বে উচ্চজ্ঞান লাভ করেন। এক বছরকাল তিনি সুফী-মতবাদে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। পরে তিনি কুম্ শহরে গমন করেন এবং হাম্বলী মযহাবের একজন গোঁড়া সমর্থক হন। শেষে তিনি জন্মভূমিতে অত্যাগমন করেন এবং প্রকাশ্যে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। 'কিতাব অল-তওহীদে' তাঁর বিশেষ মতামতগুলি বিধৃত আছে। তাঁর অনুগামীর দল বর্ধিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। এমনকি তাঁর সহোদর ভ্রাতা সুলায়মান তাঁকে আক্রমণ করে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বিবাদ ও রক্তপাত হওয়ায় স্থানীয় শাসক তাঁকে বহিষ্কার করেন। তখন তিনি সপরিবারে দারিয়াপল্লীতে উপস্থিত হন। দারিয়ার আমির মুহম্মদ ইবনে সউদ তাঁকে আদরের সংগে গ্রহণ করেন ও তাঁর নিকট দীক্ষা নিয়ে তাঁর মতবাদ প্রচারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

শীঘ্রই আবদুল ওহ্হাবের প্রচারণা রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ইসলামের প্রথম যুগে রাজ্য-বিস্তৃতির মতোই বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। ইবনে সউদের নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী আরব লীগ গঠিত হয়, এবং দারিয়াকে কেন্দ্র করে সউদী অধিকার বর্ধিত হতে থাকে। 'কিতাব অলতওহীদের' শিক্ষাদানের সংগে আগ্নেয়াস্ত্রের শিক্ষাদানও চলতে থাকে। ফলে রিয়াদের শেখের সংগে ১৭৪৭ সালে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ সংঘর্ষ চলে প্রায় আটাশ বছর ধরে এবং ইবন সউদ ও তাঁর মৃত্যুর পর (১৭৬৫ খ্রীঃ) তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুল আযীয ইঞ্চি ইঞ্চি করে সমগ্র রিয়াদ অধিকার করেন। ১৭৬৬ সালে আবদুল ওহ্হাব মক্কার শরীফের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নিজের মতবাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। মক্কার শরীফ আবদুল ওহ্হাবের মতবাদ ইমাম হাম্বলের মযহাবের মতানুসারী বিবেচনা করে সেসব শ্রদ্ধার সংগে প্রচারের নির্দেশ দেন। কিন্তু ১৭৭৩ সালে রিয়াদের শাসক দাহ্হাম আবদুল ওহ্হাবের তীব্র বিরোধিতা করেন, কিন্তু আবদুল আজীজের নিকট পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। দলে দলে বেদুইনরা আবদুল ওহ্হাবের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে তাঁর শিরেই বিজয়মাল্য শোভিত হয়। উত্তরে কাসিম থেকে দক্ষিণে খরজ পর্যন্ত সমগ্র নেজদ ভূমিতে অবদুল আজীজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে আবদুল ওহ্হাব ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জান্নাতবাসী হন।

আবদুল আযীয ও তাঁর পুত্র সউদ অমিত বিক্রমে অভিযান চালাতে থাকেন। ১৭৯১ সালে মক্কায় হামলা চালানো হয়; ইরাকের নানাস্থানে বার বার অভিযান চলতে থাকে। তুর্কী সুলতান নতুন শক্তির অভ্যুদয়ে শংকিত হযে বাগদাদের পাশাকে নির্দেশ দেন, আর প্রশ্রয় না দিয়ে নবজাগ্রত শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু ১৭৯৭ সালে বাগদাদের পাশা উদের হাতে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন এবং এশিয়াস্থ সমগ্র তুর্কী অধিকার সউদের হাতে চলে যায়। ১৮০৩ সালে গালিব মক্কা থেকে পলায়ন করেন এবং

সউদ সদলবলে তথায় প্রবেশ করেন। সাময়িকভাবে সউদের বাহিনী মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হয়; কিন্তু তিনি নতুন বিক্রমে পুনরায় হেজাজ আক্রমণ এবং ১৮০৪ সালে মদিনা, ১৮০৬ সালে মক্কা ও পরে জেদ্দা সম্পূর্ণভাবে দখল করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে সমগ্র জাজিরাতুল আরব তাঁর পদানত হয়। ১৮১১ সালে ওহাবী সাম্রাজ্য উত্তরে আলেপ্পো থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং পারশ্য উপসাগর ও ইরাক সীমান্তের পরবর্তী পূর্বে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সউদের বেদুইন বাহিনীর বিরুদ্ধে এই সময় সমগ্র ইসলাম জগতে তীব্র আন্দোলন চলতে থাকে এবং এ আন্দোলনের প্রায় সমস্তটুকু তুর্কীরা ও তাদের ইউরোপীয় বন্ধুরা চালতে থাকে। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেই এই বিরুদ্ধ আন্দোলন এবং আলোড়ন, ক্ষোভ ও আতংক সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রচার করা হয়েছিল যে, ইসলামের কেন্দ্রস্থল পুন্যময় মক্কা ও মদিনা শহর দুটির যে কোনও অধিবাসী আবদুল ওহ্হাবের মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল, সমস্ত মাযার ও মকবেরা উৎখাত করা হয়েছিল; এমনকি হযরত মুহম্মদের রওজা-মুবারকও রেহাই পায়নি। ১৮০২ সালে কারবালা দখল করে সউদী বেদুইনরা সমস্ত মাযার ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং অধিবাসীদের হত্যা করেছিল। মসজিদে মসজিদে যে-সব কারুকাজ ছিল ও বহুমূল্য জিনিস শোভা বর্ধন করত, সেসবই বিলুপ্ত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ এগারো শতাব্দী ধরে নানা দেশ থেকে মুসলিম সুলতান, বাদশাহ্ ও ভক্তবৃন্দ স্বদেশের জন্যে যেসব বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য উপঢৌকন ভক্তির নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, সে সমস্তই মরুবাসী বেদুইনরা লুণ্ঠিত ও হস্তগত করেছিল।

আবদুল ওহ্হাবের অনুসারীদের এসব কাজ দারুণ মহাপাপ হিসেবে গণ্য হতে থাকে সারা মুসলিম জগতে; তাদের বিরুদ্ধে রোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে তারা মুসলিম জাহানের আতংক হয়ে ওঠে। তুর্কীর সুলতান কাবাশরীফ ও মক্কা মদিনার রক্ষক হিসেবে 'ওহাবীদলনে' অগ্রসর হন—সারা মুসলিম জাহান তাঁর স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। মিসরের পাশা মুহম্মদ আলির উপর 'ওহাবী' ধ্বংসের ভার অর্পিত হয়। তিনি ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত সৈন্য দিয়ে পুত্র তুসুনকে প্রেরণ করেন হেজাজ অধিকার করতে। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে মদিনা ও ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে মক্কা মিসর বাহিনী দখল করে। মুহম্মদ আলি স্বয়ং ১৮১৩ সালে মিসরবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের পহেলা মে সউদ ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ততো সাহসী বীর ছিলেন না। তিনি তুসুনের সংগে সন্ধি করেন এই শর্তে যে, তিনি অটোমান সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করবেন ও মিসরবাহিনী নেজদ ত্যাগ করে যাবে। কিন্তু মুহম্মদ আলি এ সন্ধি ভঙ্গ করে ১৮১৬ সালে পুনরায় নেজদ আক্রমণ করতে প্রেরণ করেন ইবরাহিম পাশাকে। ইব্রাহিম তীব্র যুদ্ধের পর ১৮১৮ সালের মে মাসে দারিয়ায় উপস্থিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানীটি ভূমিসাৎ করেন। আবদুল্লাহ বন্দী হয়ে কনস্টান্টিনোপলে প্রেরিত হন, সেখানে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। আরবের মরীচিকার মতোই সহসা চক্ষু ঝলসিয়ে দিয়ে 'ওহাবীদের' বিশাল সাম্রাজ্য ও ক্ষাত্র শক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল—তার কোনও অস্তিত্বই রইল না।

কিন্তু আরব জাতীয়তা-জ্ঞানের যে দীপশিখা আবদুল ওহ্‌হাব ও ইবনে সউদ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তা ছিল অনির্বাণ এবং পরবর্তী এক শতাব্দী ধরে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপটিকে তুর্কী সাম্রাজ্যিক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে। শেষে বিশ শতকের প্রথম পাদে '১৯০৪ সালে আবদুল আযীয ইবনে আবদুর রহমান সম্পূর্ণরূপে নেজদের তাবৎ অংশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন, যা তাঁর পিতামহ একদা নিরংকুশভাবে অধিকার করেছিলেন। পরবর্তী দুই দশকব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে তিনি ও তাঁর পুত্র ইবনে সউদ সমগ্র হেজাজ দখল করেন—১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে মক্কা, ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মদিনা ও জেদ্দা অধিকৃত হয়। এভাবে প্রায় সমগ্র জাজিরাতুল আরব (কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিরী অধিকার ব্যতীত) 'সউদী আরব' নামাংকিত আরবী জাতীয় রাষ্ট্রে রূপায়িত হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আবদুল ওহ্‌হাবের আরব জাতীয়তা জ্ঞান মধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষাভাষী দেশগুলিকে এভাবে সন্দীপিত করে তুলেছিল যে, এক এক করে যুক্তমিসর গণরাষ্ট্র, জর্দান, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর মানচিত্রে গৌরবময় স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

৩

আবদুল ওহ্‌হাবের ধর্মীয় শিক্ষা ও মতবাদের আলোচনায় প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আরবদেশে 'ওহাবী' নামাংকিত কোনও মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরবদেশের বাইরে এবং মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষত তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। কোনও কোনও ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীবর (Neibuhr) আবদুল ওহ্‌হাবকে পয়গম্বর বলেছেন। এসব উদ্ভট চিন্তারও কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে আবদুল ওহ্‌হাব কোনও মযহাবও সৃষ্টি করেননি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্‌বলের মতানুসারী ছিলেন তিনি, এবং তাঁর প্রযত্ন ছিল বিশ্বনবীর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সেই আদিম সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। তাঁর আরো শিক্ষা ছিল, ধর্ম কোনও শ্রেণীবিশেষের অধিকার নয়; কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়াও ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের একাধিকার নয়, কোনও যুগবিশেষের মধ্যেই সীমিত নয়—প্রত্যেক 'আলিম' বা শিক্ষিত ব্যক্তির অধিকার আছে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়ার। তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ প্রধানত ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন পুঁথিতে বিধৃত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত, যদিও আবদুল ওহ্‌হাব অনেক বিষয়ে তাঁদের সংগে একমত নন।

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের শিক্ষানুসারী আবদুল ওহ্‌হাব মরণের পর প্রত্যেক জীবের পুরস্কার না হয় শাস্তিলাভের দিকে বিশেষ জোর দেন এবং আল্লাহ্‌র বিচার দিনে তওবার উপর অকুণ্ঠ নির্ভর করতে বলেন। তিনি নামায ও রোযার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন এবং এ দুটির অমান্যকারীকে কখনও ক্ষমা করতেন না। যাবতীয় ধর্মীয় বিধিনিষেধ অনন্যমনে পালন করার প্রতিও তিনি খুবই জোর দিতেন। সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতিই অকুণ্ঠ নির্ভর ও একান্ত বিশ্বাস এবং

এজন্যে চাই কঠোর সংযমের সংগে জীবনযাপন। খাওয়া-পরায়, পোশাকে সাংসারিক জীবনের সর্বস্তরে বিলাসিতা ও সৌখিনতা একেবারে নিষিদ্ধ হয় এবং সুরা ও আফিম বিষবৎ পরিত্যক্ত হয়। তাঁর শিক্ষাসমূহ কালক্রমে একটা ধারাবাহিক রূপ গ্রহণ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা সেটিকেই 'ওহাবী' অপভ্রংশে প্রচারিত করে।

আবদুল ওহ্হাবের শিক্ষাসমূহ 'কিতাব অল-তওহীদে' বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে এবং সংক্ষেপে সেগুলি এই :

১. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত বা আরাধনা পাপ এবং যারাই অন্য কারও উপাসনা করে, তারা বধার্হ।
২. অধিকাংশ মানুষই তওহীদ বা একেশ্বরবাদী নয়, তারা ওলি বা সন্তদের মাযারে গমন করে ও আশীষ প্রার্থনা করে; তাদের এসব আচার কুরআনে বর্ণিত 'মক্কার মুশ্‌রেকীন'দের অনুরূপ।
৩. ইবাদতকালে নবী, ওলী, ফেরেশতাদের নাম গ্রহণ করে প্রার্থনা করা 'শির্‌ক' বা বহু দেবার্চনার মতোই নিন্দনীয়।
৪. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও মধ্যবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করা শির্‌ক মাত্র।
৫. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট উৎসর্গ বা মানত করা শির্‌ক মাত্র।
৬. কুরআন, হাদীস এবং যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ব্যতীত অন্য জ্ঞানের আশ্রয় করা কুফর বা অবিশ্বাস মাত্র।
৭. কদর বা আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে সন্দেহ প্রকাশ বা অবিশ্বাস করা ধর্মবিরুদ্ধতা (ইলহাদ)।
৮. কুরআনের 'তা' বিল বা উপাদানগত ব্যাখ্যাদন ধর্মবিরুদ্ধতা।

ইবনে হাম্‌বল থেকে আবদুল ওহ্হাবের বিরুদ্ধ মতামত নিম্নলিখিত বিষয়ে সুস্পষ্ট :

১. জামাতে সালাত আদায় অবশ্যকর্তব্য।
২. তামাক সেবন নিষিদ্ধ এবং এরূপ অপরাধে চল্লিশের অনধিক বেত্রদণ্ড যথেষ্ট। দাড়ী কামানো ও গালি দেওয়ার শাস্তি কাযীর ইচ্ছানুযায়ী।
৩. অপ্রকাশ্য মুনাফার, যেমন ব্যবসায়িক মুনাফার উপর যাকাত দিতে হবে। ইমাম হাম্‌বল মাত্র প্রকাশ্য আয়ের উপর যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
৪. কেবলমাত্র কলেমার উচ্চারণই মোমেন বা বিশ্বাসী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যাতে তার জবেহ্ করা জীব হালাল হতে পারে। তার চরিত্র নিখুঁত কিনা, তারও অনুসন্ধান করা উচিত।

আবদুল ওহ্হাবের অনুসারীদের মধ্যে এসব প্রথার প্রচলন দেখা যায় : তসবিহ গণনার নিষেধ, কারণ এ আচারণটি বৌদ্ধদের নিকট থেকে নেওয়া। তার বদলে আঙ্গুলের গিঁঠে গিঁঠে আল্লাহ্‌র নাম গণনা করা উচিত। মসজিদে, মাজারে যে-সব নক্‌শার কাজ ছিল সেসব তুলে ফেলা হয়েছে। তুর্কীদের প্রবর্তিত মিনারও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে অতি সাধারণ ও অলংকারশূন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। 'রওযাত-অল-আফফার' গ্রন্থে আবদুল ওহ্হাবের সময়ে কতকগুলি রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত থাকার উল্লেখ আছে, সেগুলি পৌত্তলিক বা প্যাগান-রীতির

অনুসরণমাত্র। যেমন কবরে ফুল দেওয়া, দীপ জ্বালানো, খাবার দেওয়া; বৃক্ষপূজা করা। বলা বাহুল্য, এসব আচার-রেওয়াজ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সুন্নাহ্ পরিত্যাগ করার অপবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন। তবে তিনি আবু হোরায়রা বর্ণিত বহু হাদিসে সন্দেহ করতেন এবং মিলাদুন-নবীর জনসমাবেশ করে সীরাতুন নবীর প্রচলিত-উৎসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুতাকাল্লামুনদের গ্রন্থাদির বহ্ন্যুৎসব করার অপবাদও ভিত্তিহীন। কিন্তু মাজারে-মকবেরায় সমস্ত সমাধিসৌধ ও অলংকরণ নষ্ট করে দিতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। জুবাইলায় জায়েদ-বিন-খাত্তাবের কবরের উপর নির্মিত সমাধিসৌধ তিনি নিজে ধ্বংস করেছিলেন এবং বর্তমানকালে তাঁর অনুসারীরা, মদিনায় অলবাকী অঞ্চলে এ কাজ করেছে ব্যাপকভাবে।

আবদুল ওহ্হাবের শিক্ষাসমূহ নিরাসক্তভাবে অনুধাবন করলে মনে হয়, যেসব বিদাত শিরক্ ও কুফরের প্রশ্রয় দেয় এবং 'ইলহাদ বা ধর্মবিরুদ্ধ, সেসবের উৎখাতকরণে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র তওহীদ-জ্ঞানে এতোটুকু অন্যভাব বা অনুভূতির প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তাঁর মৌল শিক্ষাই ছিল লা-শরীক আল্লায় একান্ত ও অকুণ্ঠ নির্ভর এবং স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে যাবতীয় মধ্যস্থতার অস্তিত্ব বা চিন্তার বিলোপসাধন—ওলি ও পীরদের প্রতি মুসলমানের পূজা, এমনকি হযরত মুহম্মদেরও আধা ঐশ্বরিক রূপকল্পনার[১] বিলোপসাধন। কবরে সৌধ নির্মাণ তাঁর মতে পৌত্তলিকতারই শেষ চিহ্নমাত্র, এজন্যে সেসব ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে মুসলমানরা সেগুলিকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাতে বা সেখানে যেয়ে নিজের মঙ্গলকামনা করতে না পারে। কারণ এরূপ মনোবৃত্তিই শিরক ও কুফরীর নামান্তর মাত্র। এই বিশ্বাসে চালিত হয়েই উনিশ শতকের প্রথম দশকে কারবালা, মদিনা ও মক্কার মাযার-মকবেরা উৎখাত করা হয়েছিল এবং সৌধ ও মিনারগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যেমন হয়েছিল ১৯২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান সউদী শাসন কর্তৃপক্ষের আমলে।

আবদুল ওহ্হাব ছিলেন ইজতেহাদের প্রধান সমর্থক। কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা বা নির্দেশের প্রত্যক্ষ বিপরীত বা পরিপন্থী না হলে যুগ ও পরিবেশের কারণোদ্ভূত সমস্যার সমাধান ইজতেহাদের বলে হওয়া উচিত, এ প্রত্যয়ে তিনি সুদৃঢ় ছিলেন। এবং তাঁর মতানুসারী বর্তমান সউদী আরবের শাসন কর্তৃপক্ষও এ প্রত্যয়ে আস্থাবান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বর্তমান কালের ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রসার ও মালামাল চলাচলের বিভিন্ন উপায় উদ্ভূত হওয়ায় মালামাল ইনসিওর করার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। আবদুল ওহ্হাবের একান্ত পাওবন্দ রাজা আবদুল আজীজ কাণ্ডজ্ঞানের অনুসারী হয়ে ইনসিওর করার প্রয়োজনীয়তা সম্যক অনুধাবন করেন এবং মক্কার বর্তমান মুফতী বিপক্ষতা করলেও ইনসিওর-নীতি গ্রহণ করেছেন।

বর্তমান যুগে ধর্ম ও বিজ্ঞানের ঘাত-প্রতিঘাত শিক্ষিত মনকে অহরহ আলোড়িত করছে, এবং এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে জ্ঞানদীপ্ত মনে চিন্তার উদয়ে অন্ত নেই। নেজাদী উলেমা সম্প্রদায় দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের শিক্ষা নিষেধ করেন, আরও করেন

---

[১] এ মতবাদেরও মুসলমানদের মধ্যে অভাব নেই, যেমন :
'আহ্মদের ওই মিমের পর্দা
রেখেছে তোমায় আড়াল করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিবিধ শিক্ষা—তার মধ্যে পৃথিবীর ঘূর্ণননীতিও একটি। তাঁরা সঙ্গীত ও চিত্রকলায় শিক্ষা দানও নিষেধ করেন, এবং এ সম্বন্ধে হাদীসের বাণীকে চূড়ান্ত হিসেবে মতপোষণ করেন। তবে অনেকে বর্তমানকালের ফটোগ্রাফির সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করেন। নেজদী উলেমা বৈজ্ঞানিক বিষয়কে—তা সে যতোই নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হোক না—কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার অনুগামী হিসেবে গ্রহণ করেন। এক কথায়, নেজদীরা শিক্ষাকে গোঁড়াভাবেই গ্রহণ করে থাকেন, এবং এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তিতর্ক বা শিথিল মনোভাব বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত নন। মনে রাখা উচিত, আবদুল ওহ্হাব ধর্মীয় বিষয়ে কঠিন অনমনীয় নীতি অনুসরণ করতেন।

৪

উনিশ শতকে আবদুল ওহ্হাবের মতানুসারীদের রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা অকৃতকার্য এবং রাজশক্তি নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁর পিউরিটানিক সংস্কারধর্মী আন্দোলন বেঁচে রইলো। ইসলাম প্রচারের পূর্বে জাহেলী জমানায় (অন্ধযুগ) যেমন যুগযুগ সঞ্চিত অনাচার, কুসংস্কার ও অধর্মের আবর্তে পড়ে মানুষ দিগভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলো, সেই রকম আবদুল ওহ্হাবের দৃষ্টিতে মুসলমানরা গোমরাহীর পথে এতো বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে ফেলেছিল—তার ফলে তাদের ঈমান ও আমান দুই-ই বরবাদ হতে বসেছিল। নয়ারূপে ইসলামী প্রাণধারায় তাঁর আন্দোলন মুসলমানদের অন্তরমন ভরিয়ে দিয়েছিল, সেজন্যে তাঁর আন্দোলনের রাজশক্তি নষ্ট হয়েও তাঁর শিক্ষার মহিমা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—মিসর, তুরান, ইরান, পাকভারত, এমনকি জাভা-মালয়েতেও তাঁর শিক্ষার বাণী আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল।

পাকভারত উপমহাদেশে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়েছিল। সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে এদেশটার শাসনদণ্ড একচ্ছত্রভাবে পরিচালনা করলেও তাদের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা নিরংকুশ হয়নি। প্রতিবেশী হিন্দুজাতি বিদেশী বণিকজাতি ইংরেজের সংগে ষড়যন্ত্র করে এদেশটার শাসনকার্য থেকেই মুসলমানদের বঞ্চিত করেনি, তাদের আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়েরও সূচনা করেছিল। এক কথায়, মুসলমানদের ঈমান ও আমান নিরংকুশ করে শত শত বছর ধরে বহির্বিশ্বে যে পাকভারত ছিল দারুল ইসলাম নামে সুপরিচিত, সেখানে বিধাতার অভিশাপ হিসেবে তার শিরে উদ্যত হয়েছিল বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও ক্ষয়ক্ষতির দুঃখের বোঝা। সংক্ষেপে বলতে হয়, সতেরোশো সাতান্নর পর পাক-ভারতীয় মুসলমানের ভাগ্যে সূচিত হয়েছিল ঘনতমসাবৃত পতন যুগ।

কিন্তু এ উপমহাদেশের মুসলমানরা অসহায় ক্লীবের মতো ভাগ্যের এ বিপর্যয় মেনে নেয়নি নির্বিকারভাবে। তারা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, দিল্লীর মুঘল বাদশাহীর নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। মারাঠারা 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র পাক-ভারতকে 'এক-ধর্ম পাশে' বেঁধে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে; বাংলাদেশে পলাশীর প্রান্তরে জয়লাভ করে বিদেশী বেনিয়ার জাত ইংরেজরা সারা উপমহাদেশের রাজদণ্ড অধিকার করবার জন্যে লোলুপ হস্ত প্রসারিত করছে এবং পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায় ও

নতুন রাজ্যস্থাপনের আশায় মেতেছে। ১৮০৩ সালে দিল্লী অধিকার করে ইংরেজরা বিশাল পাক-ভারতের বিভিন্ন অংশ নিজেদের নিরংকুশ দখলে আনয়ন করায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, বিশাল জমিদারীর ছিট মহলগুলোকে শায়েস্তা করে করায়ত্ত করার মতোই উদ্যম উৎসাহ নিয়ে। মুসলমানের তখন মোহ ভেঙে গেছে যে, তার আর শাহী বাদশাহী তো নেই-ই, তার ঈমান-আমানও সংশয়িত হয়ে উঠেছে।

মুসলমানের এই আত্মসচেতনতা জাগ্রত হওয়ার ফলে তার পরবর্তী জীবনও আবর্তিত হয়েছে দ্বিমুখী সংগ্রামে সংস্কার-আন্দোলনে। তার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সংস্কার সাধন করে তাকে যেমন খাঁটি মুসলমানে রূপান্তরিত করে সংহতি আনয়নের সাধনা করা হয়েছে, তেমনি ক্ষাত্রশক্তির আশ্রয় নিয়ে এ উপমহাদেশে পুনরায় ইসলামী শাসন প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করে এটিকে দারুল-ইসলামে কায়েম করে তার ঈমান-আমানও নিঃসংশয় করবার রক্তক্ষয়ী মরণপণ সাধনা চলেছে।

প্রথমেই সশস্ত্র জেহাদী আন্দোলনের কথা আলোচনা করা প্রশস্ত। কারণ এটাই ছিল বাহ্যত সবচেয়ে তীব্র এবং তার পরিচালনা ও পরিণাম ছিল পাক-ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যাকাশ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বেশি অর্থপূর্ণ।

নিঃসন্দেহে মুসলমানের এ বোধ, এ উপলব্ধি প্রথম থেকেই জন্মেছিল, ইংরেজ ক্রমশ সমগ্র পাক-ভারত অধিকার করে ফেলবে এবং নিরংকুশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত হিন্দুস্তানবাসীকেই স্বদেশে পরাধীন গোলামের জাতিতে পরিণত করবে। কিন্তু সমকালীন সমস্ত আলেম ও ধর্মনেতার মধ্যে দিল্লীর শাহ্ আবদুল আজীজই উনিশ শতকের প্রথমভাগে প্রকাশ্যে ফতোয়া জারী করেন : বিদেশীর শাসনাধীন হিন্দুস্তান হচ্ছে দারুল হরব, যেখানে জেহাদ করা অথবা বিধর্মী অত্যাচারীর হাত হতে যেখান থেকে হিজরত করাই খাঁটি মুসলমানের পক্ষে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এই উপলব্ধির দরুনই মুসলমানরা বারে বারে বিক্ষোভে, বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে ইংরেজশক্তির উপর। সতেরশো সাতান্নর পর পুরো একশতকেরও অধিককাল এই বিদ্রোহের অনলে দেশটিকে রাঙিয়ে রেখেছিল মুসলমানরা। এবং তারই চরম বিস্ফোরণরূপে দেখা দিয়েছিল আঠারশো সাতান্নর সারা দেশব্যাপী বিপ্লবের বহ্নিবন্যা। কিন্তু তার পরেও ছিল ১৮৬৪ সালের সীমান্ত অভিযান। পাবনা ও রংপুরের ১৭৬৫ সালের ফকির বিদ্রোহ দিয়ে এ-সংগ্রাম অধ্যায়ের ভূমিকা; মাঝখানে তিতুমীরের বিদ্রোহ; হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার আন্দোলন; সৈয়দ আহমদ শহীদের অভ্যুদয় ও বালাকোটের যুদ্ধ; পাটনায় শাহ্ ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির সংগঠন ও কার্যকলাপ : সিত্তানা, মূলকা, পঞ্জতরের ঘটনাসমূহে প্রভৃতি দিয়ে এর বিস্তৃতি। এবং ১৮৬৪ সালের সীমান্তের অভিযান ও সর্বশেষ পাটনা, আম্বালার ষড়যন্ত্র মামলায় সে সশস্ত্র সংগ্রাম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত মুসলমানদের উদ্যম উৎসাহের মূলকথা হচ্ছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ। সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে যে জেহাদী সংগঠন হয়, তার প্রথম আক্রমণ উদ্যত হয় উদ্ধত ও অত্যাচারী শিখদের বিরুদ্ধে। শিখেরা রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে একটা শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছিল; এমনকি আযান দেওয়া পর্যন্ত

বন্ধ করে দিয়েছিল। শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে প্রথমে বিজয়ী হলেও সৈয়দ আহমদ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও শহীদ হন বিশিষ্ট আলেম ও সহকর্মী শাহ্ মুহম্মদ ইসমাইলের সংগে (মে ১৮৩১)। কিন্তু পাটনার ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলি মুমূর্ষু জেহাদী আন্দোলনকে সংগঠন শক্তি বলে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন, ধূলা থেকে জেহাদী ঝাণ্ডা আকাশে তুলে ধরেন। এই সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা পাক-ভারতে আবার জেহাদীরা জেগে উঠে। তাঁরা বাংলাদেশে ও দক্ষিণ-ভারতে সফর করে মুজাহিদ ও রসদ্ সংগ্রহ করেন। তাঁদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় মহিলারাও শরীরের গয়না খুলে জেহাদ ভাণ্ডারে দান করতো। বাঙালি মুসলমানের কুটবুদ্ধির সঙ্গে উত্তর ভারতের মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি মিলিত হয়ে অভাবনীয় তেজের স্ফূরণ হয়। সম্মুখ সমরে বাঙালিও দুর্দান্তভাবে লড়তো; 'আম্বালা অভিযানে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা উপেক্ষণীয় নয়, এবং ক্ষেত্র উপস্থিত হলে ভীরু বাঙালিও আফগানের ন্যায় হিংস্রভাবে লড়তে জানে।' সিলেট মালদহ, রংপুর থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশের কৃষকসম্প্রদায় অপূর্ব নিষ্ঠার সংগে এই শতাব্দীর সংগ্রামে সৈন্য ও রসদ যুগিয়েছে। তখন বাঙালি মুসলমান পরিবারের প্রত্যেক সমর্থ যুবাটি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যেতো হাজার মাইল দূরবর্তী সীমান্তস্থ জেহাদী শিবিরে। প্রতিটি মুসলমান পরিবার থেকে মুষ্ঠিভিক্ষা নিষ্ঠার সংগে আদায় করা হয়েছে জেহাদভাণ্ডারে। আর জেহাদ শিবিরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জমায়েত হয়েছে মুসলমান সমাজের সর্বশ্রেণীর লোক—সর্বোচ্চ অভিজাত বংশের মওলানা, জঙ্গী কনট্রাক্টর, সিপাহী, সাধারণ চাষী, কসাই নির্বিশেষে। যুদ্ধের ময়দানে, জেহাদের শিবিরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে বাঙালী মুসলমানের পূত অস্থি। মালদহ, পাটনা, আম্বালার বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় বাঙালি, বিহারী, পাঞ্জাবী, সরহদ্দী মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে একই লক্ষ্যের অনুসারী হয়ে।

বাংলাদেশের বুকেও সশস্ত্র বিদ্রোহানল জ্বলে উঠেছিল মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের নেতৃত্বে, এবং ইংরেজ রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল খাস কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী একটা বৃহৎ অঞ্চলে কিছুকাল ইংরেজের শাসন খতম করে দিয়ে তিতুমীর আপন হুকুমত কায়েম করেছিলেন। তাঁর নির্মিত বাহাদুরপুরের নিকটবর্তী নারিকেল বেড়িয়ার বাঁশের কিল্লা আজ ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে। এখানে প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর শহীদ হন (১৮ই নভেম্বর ১৮৩১)। তাঁর অনুচরদের বিচার হলে সিপাহ্সালার মাসুম খাঁর ফাঁসির হুকুম হয় এবং ১৪০ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। আজাদীর সংগ্রামে প্রথম বাঙালি শহীদের গৌরব তিতুমীরের, অন্য কারও নয়।

সশস্ত্র না হলেও সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক আন্দোলন তুলেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ও তার উপযুক্ত পুত্র দুদু মিয়া ওরফে মহসীন। যে মেনোবৃত্তিতে চালিত হয়ে শরীয়তুল্লাহ্ জুম্মার ও দুই ঈদের নামাজ অসিদ্ধ হিসেবে প্রচার করেছিলেন, তা ছিল বাহ্যত ও বাস্তবত ইংরেজের হুকুমতকে অস্বীকার করারই নামান্তর। যে-সব অনৈসলামী আচার ও প্রথা হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তাঁর 'ফারাজী' অনুগামীদের বর্জন করতে বলেছিলেন, সেসবের মধ্য দিয়েই বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ সরকার মুসলমান কৃষক সমাজের দেহমনের উপর কর্তৃত্ব করে আসছিল। এবং একই উদ্দেশ্যে তিতুমীরও তাঁর

'হিদায়েতী' দলকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলে পূর্ণিয়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এই বিপ্লবী দলকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। তখন অন্যসব হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর ও কোম্পানী সরকার একযোগে তাঁর সহযোগিতা করেছিল। কৃষক শ্রেণীর আন্দোলনে স্বাভাবিক উগ্রতা ও আক্রোশ ছিল, সেজন্য আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক সরকার দুদু মিয়াকে ডাকাত ও কৃতঘ্ন দেশদ্রোহী অপবাদে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত বার বার কারান্তরালে নিক্ষেপ করেছিল।

কালক্রমে বাঙালি জেহাদীরা আহলে-হাদিস, লা-মজহাবী, মওয়াহেদ, মুহম্মদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের আকিদা ও শিক্ষার সংগে মুজাহিদের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় ইয়াহইয়া আলি তাদের সকলকে জেহাদ আন্দোলনে সংযুক্ত করেন। তারপর দেখা যায়, সীমান্ত প্রদেশের ইনকেলাবী সমর ঘাঁটিতে অথবা ইংরেজ সরকারের ফৌজদারী আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় ফারাজী ও অন্যান্য নামে চিহ্নিত বাঙালি মুজাহিদরা উত্তর ভারতের মুজাহিদ বাহিনীর সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ লড়তে বাঙালি মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অগণিত অর্থ ও সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েছে। সেকালীন বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে তাদের অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের ঘাঁটি ছিল, এবং কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে অত্যন্ত চতুরতার সংগে তারা যুদ্ধের এ দুটি অতি প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করতো সরবরাহকারীদের মধ্যে মালদহের রফিক মিয়া ও তাঁর পুত্র আমীরউদ্দীনের নাম ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে কতো মুজাহিদ প্রেরিত হয়েছিল, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের কোনও প্রামাণ্য দলিল বা তথ্য মেলে না; তবে মাত্র একটি ইনকেলাবী ঘাঁটির ৪৩০ জন যোদ্ধার মধ্যে শতকরা দশজন মালদহ কেন্দ্র থেকেই পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশের মুসলমানরা জেহাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কতখানি অংশগ্রহণ করেছিল তার বিস্তৃত ও যথাযথ ইতিহাস প্রণয়ন আজও হয়নি।

সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে পাক-ভারতের যে জেহাদী আন্দোলন গড়ে উঠে, তার প্রথম আক্রমণ উদ্যত হয়েছিল রণজিৎ সিংহের শিখরাজ্যের উপরে। পরে ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের সংগে মুজাহিদদের সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত ব্রিটিশবাহিনী কঠোর হস্তে জেহাদীদের দমন করে ও তাদের ঘাঁটিগুলি নির্মূল করে দেয়। কিন্তু তাতে জেহাদী-আন্দোলন বন্ধ হয়নি। সারা হিন্দুস্তানকে দারুলা-হরব ঘোষণা করে জেহাদ করবার অথবা এদেশ থেকে হিযরত করবার বাণী সৈয়দ আহমদের খলিফারা প্রচার করে বেড়াতে লাগলো, সীমান্ত প্রদেশে একটা ইনকেলাবী সমর ঘাঁটি স্থাপন করে সারা উপমহাদেশ থেকে অর্থ ও সৈন্য আমদানি করতে লাগলো। তাদের শায়েস্তা করতে ব্রিটিশ সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, তিনটি ভীষণ যুদ্ধ লড়তে হয়েছে এবং বহু বৎসর ধরে তাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত ও সশংকিত থাকতে হয়েছে। সমুদ্যত অস্ত্র ও আইনের শৃঙ্খল পর্যাপ্ত না হওয়ায় দেশপ্রসিদ্ধ আলেমদের, এমনকি মক্কাশরীফের চার মজহাবের প্রধান মুফতীদের ফতোয়া প্রচারেরও দরকার হয়েছিল ভারতীয় বিশেষত বাঙালী মুসলমানদের ধর্মবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবার জন্যে। বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসনাধিকারে চলে গেলেও এদেশটাকে দারুল ইসলাম হিসেবে মেনে নিয়ে

এখানে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বসবাস করতে ধর্মীয় অনুমোদনও এসব ফতোয়ার দ্বারা লাভ করা হয়েছিল।

যহোক, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'ওহাবী' নামাংকিত জেহাদী আন্দোলন এক বিশিষ্ট অধ্যায়। পলাশীর পর থেকে পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার প্রকাশ হতো মুসলমানদের দ্বারা। কোন রাজা, বাদশাহ্ বা রাজপুরুষের স্বার্থে এ আন্দোলন প্রচারিত হয়নি। বিধর্মী ও বিদেশী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাক-ভারতী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এ জেহাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নীচু, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর মুসলমান; এবং একে সংগঠন করেছিলো ও পরিচালনা করে নেতৃত্ব দিয়েছিলো এ যুগের ধিকৃত ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম-সমাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাজবংশের কয়েকজন এসে যোগ দিলেও এ আন্দোলনের কোনো সময় এর শক্তি কোনও নওয়াব-রাজার স্বার্থে কেন্দ্রীভূত হয়নি। দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না করলে ধর্মীয় সংস্কার করা যায় না। এবং দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে বিধর্মী রাজশক্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন, মুসলমানদের এ বোধ ও এ উপলব্ধি সম্যক জন্মেছিল এবং এ বোধ জন্মানোর সংগে আন্দোলনের রূপও বদলে তীব্রতর হয়েছিল। অবশ্য আন্দোলনের নেতাদের মনে দারুল ইসলামের কোনও পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে দানা বেঁধে ছিল কিনা, বলা শক্ত কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, এই মনস্বী নেতাদের মনে কোনও দুর্বলতা ছিল না; কোনও স্বার্থবুদ্ধির নীচতা তাঁদের বিবেককে, তাঁদের শুভবুদ্ধিকে মোটেই আচ্ছন্ন করেনি।

মুসলমানদের এই অনমনীয় মনোভাবকে লক্ষ্য করেই হাণ্টার সাহেব বলেছেন : 'আমাদের অধিকারে একটি চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র এবং আমাদের সীমান্তে একটা স্থায়ী বিদ্রোহী শিবির'। তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' নামাংকিত গ্রন্থটির রচনা সূচিত হয় তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো কর্তৃক (১৭৬৯—৭২ খৃঃ) উপস্থাপিত একটি প্রশ্নের জওয়াব হিসেবে : ভারতীয় মুসলমানরা কি ধর্মীয় অনুজ্ঞা হেতু মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য? যদিও গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল পাক-ভারতীয়, বিশেষত বাঙালী মুসলমানের উপর ইংরেজের অন্যায় অত্যাচারসমূহের একটা সাফাই প্রস্তুত করা, তবু তার প্রথম দুটি অধ্যায়ের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে সদ্য রাজ্যহারা একটা বিরাট জাতির অপরিসীম ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বহ্নি। হাণ্টার বলেছেন : ভারতীয় মুসলমানরা বহু বর্ষ ধরেই রয়ে গেছে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে একটা মহাবিপদের উৎস। নানা কারণেই তারা আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা করে আসছে; এবং যেসব পরিবর্তনকে নমনীয় ভাবাপন্ন হিন্দুরা আনন্দের সংগে গ্রহণ করেছে, সেগুলিকে মুসলমানরা তাদের উপর তীক্ষ্ণ অবিচার হিসেবেই বিবেচনা করে।

আঠারশো সাতান্নর মুক্তি সংগ্রামের সংগে জেহাদী আন্দোলনের যোগাযোগ ছিল, একথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন, কিন্তু তার বিস্তারিত তথ্য এখনও গবেষণার অপেক্ষায় আছে। বিলায়েত আলি বাদশাহ্ বাহাদুর শাহের সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এ প্রমাণ পাওয়া যায়। দীর্ঘ এক শতক ধরে জেহাদী মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বারে বারে ছোটখাট বহু বিস্ফোরণ ও প্রতিরোধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছিলো, তার সংগেই বহু দিনের ধূমায়িত অসন্তোষ সর্বভারতীয় বিরাট ও ব্যাপক আকারে ফেটে

পড়েছিলো, এ কথাটি অস্বীকার করা যায় না। বাইরের অবস্থা শান্ত বিবেচিত হলেও আসলে সারা দেশটা বারুদের স্তূপ হয়েছিলো এবং জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষই বিস্ফোরণে মূর্ত হয়েছিলো। মওলানা আহমদ উল্লাহ, মওলবী ফজলে হক খয়রাবাদী প্রমুখ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থবশে নয়, ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের দুর্বার বাসনা নিয়ে। আর এ আন্দোলনে মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলো মুসলমানরাই; এজন্যে সংগ্রাম শেষে ইংরেজ-রাজশক্তি নির্মমভাবে চন্ডনীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্বটা সৃষ্টি করেছিলো মুসলমানদের শির লক্ষ্য করে। সীমাহীন নির্মমতা দেখিয়ে কুখ্যাত হডসন শাহ্‌জাদাদের হত্যা করেছে; নীল গর্ব করে বলেছে, বিনাবিচারে শত শত মুসলমানকে ঈদুল আজহার দিনে ফাঁসি দিয়েছে, হত্যা করেছে। মুসলমান অভিজাতদের শুয়োরের চামড়ায় জীবন্ত সেলাই করে হত্যা করা হয়েছে। জোর করে তাদের শুকরের গোশত খাওয়ানো হয়েছে।

আফসোস এই যে, সে-জেহাদ আন্দোলনের, সে মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। যে অগণিত জনসমষ্টি সতেরোশো-সাতান্ন থেকে আঠারোশো-সাতান্ন পর্যন্ত বিদ্রোহে, সমরে, ফাঁসির মঞ্চে জীবনপাত করে গেছে, আজ তারা অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পশ্চাতে এ দাবী নিয়ে—তাদেরও মহৎ আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হবে।

সরকারী মামলাসমূহে কঠোর শাস্তিদান করা হলেও জেহাদী আন্দোলন একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সীমান্তের জেহাদী ঘাঁটির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, এবং পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গুপ্ত সংগঠন মারফত অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরণও বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে গেলেও কোনও কালেই জেহাদী আন্দোলনের বিভীষিকা দূরীভূত হয়নি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দেও অলিভার (Across the Border P. 29) সাহেব সীমান্তে জেহাদী ঘাঁটির অস্তিত্ব দেখেছিলেন, এবং তখনও তার আতংক স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষকে সশংকিত রেখেছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বসমর আরম্ভ হলে তুরস্ক ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন সরহদী জেহাদী ঘাঁটিতে তৎপরতা লক্ষিত হয়। ১৯১৫ সালে সীমান্তে কয়েকবার সংঘর্ষ বাধে; তার মধ্যে রুস্তম ও শবকদর এলাকার যুদ্ধ তীব্র ছিল। যুদ্ধশেষে কালো পোশাক পরিহিত ১২ জন জেহাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উক্ত সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে ১৫ জন যুবছাত্র এবং পেশোয়ার ও কোহাটের অনেক ছাত্র মুজাহিদের সংগে যোগ দেয়; পরে তারা কাবুল যাত্রা করে। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে দেখা যায়, রংপুর ও ঢাকা জেলার ৮ জন মুসলমান মুজাহেদিন দলে যোগ দিয়েছে। উক্ত সালের মার্চ মাসে দু'জন বাঙালী মুসলমান মুজাহিদ শিবিরে ৮০০০ টাকা গোপনে বহন করার সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক ঘাঁটিতে ধরা পড়ে। তারা বহু পূর্ব থেকে জেহাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলো।

এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলমান জাতির এক অংশ তখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত ছিলো। তাছাড়া আরও একদল মুসলমান বিদেশী রাষ্ট্র কাবুল ও তুর্কীর সাহায্যে ইংরেজ বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করতো। তাদের নেতা ছিলেন দেওবন্দ মদ্রাসার মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ এবং তাঁর সহকর্মী ছিলেন মওলানা

মাহমুদ হাসান। তাঁরা হেজাজে ও কাবুলে পাক-ভারতীয় মুসলিম প্রবাসীদের নেতৃত্ব দিয়ে সংঘবদ্ধ করতেন এবং কাবুলের আমীরের সাহায্যে বিদ্রোহ চালাবার ষড়যন্ত্র করতেন। কাবুলে একটা সামরিক সরকারও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মওলানা ওবায়দুল্লাহ ছিলেন তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এই ষড়যন্ত্রের কয়েকখানি চিঠি সিন্ধের একজন মুজাহিদ নেতার নিকট প্রেরিত হয়েছিল। চিঠিগুলি পরিচ্ছন্ন ফারসীতে হলদে রঙের রেশমী কাপড়ে লেখ ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠিগুলি ধরা পড়ে ও বিখ্যাত 'রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র' ফাঁস হয়ে যায়। এসব বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়, প্রথম বিশ্বসমর চলাকালে একদল পাক-ভারতীয় মুসলমান তুরস্ক, হেজাজ ও কাবুলের সাহায্যে এদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো।

এখানে জেহাদী আন্দোলন সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হেজাজে আবদুল ওহ্হাব যখন নিজ মতবাদ প্রচার করেন, তখন সেখানে কোনও ছাপাখানা ছিল না। এজন্যে তাঁর রচিত 'কিতাব অল-তওহীদ' ও অন্যান্য প্রচার পুস্তিকা হাতে-লেখা অবস্থায় জনসমাজে প্রচার করা হতো। পাক-ভারতের জেহাদী আন্দোলন সংক্রান্ত পুঁথি-পত্রিকা ছাপা হয়ে বা লিথোকপি প্রস্তুত করে প্রচারিত হতো। এজন্যে প্রচারকার্য আরও ব্যাপক হওয়ার সুযোগ ছিলো। হান্টার সাহেব তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থে তেরখানি 'ওহাবী' গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন, তাদের কোনটি আরবী, কোনটি ফারসী ও কোনটি উর্দু ভাষায় রচিত। পুঁথিগুলির সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হলো, 'পদ্যে বা গদ্যে লেখা ওহাবী পুঁথিগুলির—যার প্রত্যেকটিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদের জ্বলন্ত প্ররোচনা আছে—ক্ষুদ্রতমখানিও একখানি বৃহৎ গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার যোগ্য'। জেহাদী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমেদের শিক্ষা ও বাণী সংকলন ও ব্যাখ্যা করে শাহ্ ইসমাইল শহীদ প্রথমে 'সিরাতুল মুসতাকিম্' নামক ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। এখানিতে জেহাদ আন্দোলনের মূলতত্ত্বগুলি শক্তিশালী লেখকের হাতে প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠেছে। মুসলমান সমাজের সংস্কার মানস নিয়েও গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এখানিকে কেউ বলেছেন 'ওহাবীদের ম্যানিফেস্টো', কেউ বলেছেন বাইবেল। বলা বাহুল্য, এখানি সৈয়দ আহমদ-পন্থীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত ও সবচেয়ে প্রিয় পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ।

একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, জেহাদ সম্পর্কিত সাহিত্য পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। গদ্যে, কবিতায়, লোকগাথায়, সবদিকেই তার অপূর্ব উন্নতি হয়। এ সম্বন্ধে যতো পুস্তিকা লেখা হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় দিতে চেষ্টা করলে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনারই দরকার হয়ে পড়ে। এসব পুস্তকের শিরোনাম থেকে তার বিষয়বস্তুর পরিচয় মেলে। রিসালা-ই-জেহাদ, কাসিদা, শিররওকায়া, আসার-মাহশার, তাকিয়াতুল-ইমাম, নাসিহাতুল মুসলেমীন, হিদায়াতুল-মুমেনীন, তানবীর-উল-আইনাইন, তামবিহ্-উল-গাফেলীন, চিহিল হাদিস প্রভৃতি নামাংকিত অসংখ্য পুস্তক রচিত হয় ও সারা পাক-ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এসব কেতাবের ভাষা আরবী, ফারসী ও উর্দু হলেও তাদের কয়েকটি মুসলমানী বাংলাতেও তর্জমা করা হয়েছিলো। তাম্বিহোল-মোমেনীন নামক গ্রন্থটি 'মুসলমানী বাংলায়' (অর্থাৎ মিশ্ররীতির বাংলায়) পদ্যে রচিত হয়েছিলো জনৈক ওমর শাহ্ কর্তৃক ও ১৮৮০ সালে ঢাকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো। বলা

বাহুল্য, এসব 'ওহাবী' পুস্তিকা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াফত করা হয়েছিলো। তবুও সেগুলি হাতে লেখা অবস্থাতেই প্রচারিত হতো এবং তাদের পাঠকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি ছিলো। বাংলাদেশের প্রত্যেক জিলাতেই এসব কেতাবের রীতি মতো কদর ছিলো।

এখানে প্রশ্ন জাগে, কোন্ ভাষায় বাংলাদেশের জেহাদ আন্দোলনের প্রচার কার্য চালানো হতো? এ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণ্য দলিল হাতের কাছে না থাকলেও এ কথা অসংকোচে বলা চলে যে, জনগণের সম্মুখে প্রচার চলত মুসলমানী বাংলা ভাষাতেই; কিন্তু লেখাপড়ার সমস্ত কাজ ফারসী বা উর্দু ভাষাতেই করা হতো। বাংলার বাইরে থেকে যে-সব প্রচারক বাংলায় আসতেন, তাঁরা বহুদিন এদেশে বসবাস করে এদেশের ভাষা ও আদব-কায়দা রীতিমতোভাবে আয়ত্ত করে প্রচার-কাজে হাত দিতেন। লক্ষ্ণৌবাসী আবদুর রহমান সাহেব বাংলাদেশে প্রচারের জন্যে আদিষ্ট হয়ে মালদহ জিলায় হিজরত করেন এবং সেখানেই শাদী করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবে তিনি বাঙালী মুসলমানদেরই একজন হয়ে জেহাদ প্রচার করেছিলেন। সে আমলে শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের সংযোগ সূত্র উত্তর ভারতের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থাকায় বাঙালী মুসলমান মাত্রেই উর্দু ও ফারসী প্রাথমিক অবস্থা থেকেই স্বভাবতই শিক্ষা করত। এ থেকে আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, বাংলাদেশে জেহাদ আন্দোলনের লেখাপড়ার কাজটা এ দুটি ভাষার সাহায্যেই হতো। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ সংগঠন কার্যে 'দীন-কি-সরদার' 'দুনিয়া-কি-সরদার', 'ডাক-কি সরদার' প্রভৃতি উপাধি থেকেই আমাদের যুক্তির পোষকতা মেলে।

চলতি শতকে প্রথমেই বঙ্গভঙ্গ রদ নিয়ে আন্দোলনকালে বাংলাদেশে হিন্দু যুবকদের দ্বারা যে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ, সংগঠন শক্তি, প্রচারণা গুপ্তসমিতি, গুপ্তচরবৃত্তি, গুপ্ত শব্দ-সংকেত এবং গুপ্তভাবে অর্থ ও অস্ত্রাদি চলাচলের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করলে 'ওহাবী' চিহ্নিত উনিশ শতকের মুসলিম সশস্ত্র জেহাদীদের কথাই স্মরণে আসে। কারণ, এসব ক্রিয়াকর্মে দুটি দলের অনেক মিল আছে, যা থেকে নিরাসক্ত মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে— জেহাদীদের আদর্শের অনুকরণ করে বিশ শতকের বাঙালী হিন্দু সন্ত্রাসবাদ সংগঠিত হয়েছিলো কিনা। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, জেহাদীদের কর্মধারা ছিলো সাধারণ মানুষের অপরাধ ও পাপাচার বোধের সংগে পূর্ণ সংগতি রেখে, এবং তাদের সব প্রচেষ্টাই ছিলো প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে। ডাকতি, অর্থলুণ্ঠন, গুপ্ত খুন-জখম প্রভৃতি কর্ম ছিলো জেহাদীদের স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু দুটি আন্দোলনের কর্মীদের চারিত্রিক ঋজুতা ও দৃঢ়তা, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা ও দলগত অকুণ্ঠ বশ্যতা ছিলো। বিস্ময়কর। জেহাদী আন্দোলন সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে, এটি কোনও বিদেশীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি, এবং কোনও সময়ে কোনও বিদেশী শক্তির সাহায্য নির্ভর ছিল না। আর এ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা সম্বন্ধে ডক্টর চৌধুরী স্বীকার করেছেন : 'ব্রিটিশ শাসন আমলে যে-সব আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে, সে সবের মধ্যে ওহাবী আন্দোলন ছিলো তীব্রভাবেই ব্রিটিশ বিরুদ্ধ, এবং তার সর্বস্তরেই এই তীব্র বিরোধিতা পরিলক্ষিত হতো।'

পাক-ভারতীয় জেহাদী আন্দোলনের পরিক্রমা শেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ আন্দোলনের দুটি বিশেষ লক্ষ্য ও কর্মসূচী ছিল ঃ (১) ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার ও (২) রাজনৈতিক, অর্থাৎ বিদেশী শাসন উচ্ছেদ পূর্বক ইসলামী শাসন কায়েম করা। ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার প্রধানতঃ শুরু হয়েছিলো শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র সময় থেকে, এবং তাঁর পুত্র আবদুল আজীজের সময় 'তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া' সংস্কার-আন্দোলনের মারফত। সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভীর এদিকে কর্মসূচী ছিলো মুসলমানের সমাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে সব অনৈসলামিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ অনুপ্রবেশ করেছিলো, সেগুলির মূলোৎপাটন করা। বলাবাহুল্য, এই সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কার কর্মে কোনো বাধা উপস্থিত হয়নি; যদিও সৈয়দ আহমদকে একবার আদিবাসী মোল্লা ও স্বার্থভোজীদের তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।

জেহাদীদের সশস্ত্র আন্দোলন ছিলো নিঃসন্দেহে শিখ ও ইংরেজের বিরুদ্ধে এবং এদেশটাকে দারুল হরব্ থেকে দারুল ইসলামে পরিণত করার মহান ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। প্রসঙ্গতঃ এখানে পরিস্কৃন্ন হওয়া উচিত যে, কোনও রাজা-বাদশাহ্ বা আমীর-ওমরাহের স্বার্থে বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরে রাজবংশের কয়েকজন এতে যোগ দিলেও এ আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো সময়ই এর শক্তি কোনো রাজা-বাদশাহ্ বা আমীর-নওয়াবের স্বপক্ষে কেন্দ্রীভূত হয়নি। এ আন্দোলনকে সংগঠন ও পরিচালনা করেছিলেন ধর্ম শাস্ত্রবিদ্ মুসলিম আলেম সমাজ, এবং এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাক-ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র মুসলমান। আলেম সমাজ এ প্রত্যয়ে দৃঢ় ছিলেন যে, দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হলে খাঁটি ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয় না কিংবা ইসলামেরও সংস্কার করা যায় না এবং দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে বিধর্মী বিদেশী রাজশক্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় দিক নির্ণয়ে সৈয়দ আহমদ বা তাঁর অনুসারীদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। এ সম্বন্ধে নজীর হিসেবে উপস্থিত করা যায় সৈয়দ আহমদ কর্তৃক গোয়ালিয়রের মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধীয়ার শ্যালক রাজা হিন্দুরাওকে লিখিত এক পত্র থেকে :

> মহাশয় পরিস্কারভাবে জ্ঞাত আছেন যে, দূর দেশের বিদেশী লোকেরা এখন আমাদের দেশের ও যমানার শাসক পদে বরিত হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা ও পণ্যবিক্রেতারা এখন আমাদের প্রভুপদে উন্নীত হয়েছে ... কিন্তু একদল জেহাদী দুর্বল হলেও পার্থিব লোকসানের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে এই বিদেশীদের উৎখাত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে ... ... যতো শীঘ্রই হিন্দুস্থান এসব বিদেশী দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত হবে এবং জেহাদীদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে, ততো শীঘ্রই এ দেশের শাসনভার পূর্বতন মালিকদের হস্তেই ফেরত দেওয়া হবে এবং তাঁদে শক্তি ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা হবে।

সৈয়দ আহমদের আরও কয়েকটি পত্রের অংশ বিশেষ হতে পাওয়া যায় :

> আমার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেহাদ কায়েম করা ও হিন্দুস্থানে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করা ... ... যে সব বিধর্মী খ্রীষ্টান ভারত অধিকার করেছে তারা অত্যন্ত ধূর্ত ও প্রবঞ্চক ... ... দুষ্ট প্রকৃতির ইংরেজরা ও হতভাগ্য মুশরেকরা

ভারতের বিভিন্ন অংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে। তারা সিন্ধুনদের তীর হতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে।

সৈয়দ আহমদের চিঠিপত্রের এসব উদ্ধৃতাংশ হতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ন। তিনি অবশ্য প্রথমেই শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই তিনি নিহত হন। তার কারণ এই ছিলো যে, পাঞ্জাব অধিপতি রণজিৎ সিং বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানদের ধর্মকর্মে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন; এমনকি তাঁর হুকুমে পাঞ্জাবে আযান দেওয়াও নিষিদ্ধ হয়েছিলো।

একজন আধুনিক হিন্দু লেখক পাক-ভারতে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী যেসব আন্দোলন আঠার ও উনিশ শতকে উদ্ভব হয়েছিলো, সেসবের গুরুত্ব মূল্যায়ণকালে ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে এ সমতামত প্রকাশ করেছেন :

> ওহাবী আন্দোলনের প্রতি গণশক্তির সহানুভূতির নিদর্শন মেলে ঢাকা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত সমগ্র দেশের অভ্যন্তরে অর্থ ও জেহাদী সংগ্রহ পূর্বক এ আন্দোলনকে পুষ্টিদান করায়। এখানে একথাও স্বীকার করতেই হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনে যে সমস্ত আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে ওহাবী আন্দোলন ছিলো সর্বাপেক্ষা নির্দয়ভাবে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী এবং তাদের এ ভূমিকা শেষদিন পর্যন্ত তাদের সর্ব প্রচেষ্টায় অব্যাহত ছিল।*

জেহাদীদের আত্মত্যাগ অতুলনীয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অন্যসব চিন্তা ও বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব আত্মভোলা জেহাদীরা একমন একপ্রাণ হয়ে একমাত্র ব্রিটিশের উৎখাত মানসে জীবন ও যৌবন কোরবাণীর যে অনন্য ও অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তবুও আক্ষেপের সংগে স্বীকার করতেই হয়, এ আন্দোলন নিস্ফল হয়েছিল—বারে বারে ইংরেজ শক্তিকে উদ্ধত খজোর মতো আঘাত করেও ইংরেজকে এদেশ থেকে উৎখাত করার সাধনা জেহাদীদের পক্ষে সফল হয়নি। এবং তার কারণগুলি ছিল এইরূপ :

১. জেহাদীদের মধ্যে সংগঠন ও পরিচালনা শক্তি বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। জেহাদীদের প্রতিজ্ঞায় ও সংকল্পে কোন খাদ না থাকলেও ধর্মীয় খুঁটিনাটি মতবিভেদ ও তজ্জনিত মন কষাকষি নেতৃত্বদানে অনেক সময় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। 'রাফেয়াদান', 'লা-মযহাবী', 'গায়ের মাকাল্লিদ', 'আহলে হাদীস' প্রভৃতি ধর্মীয় প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের উৎকট রেষারেষি ও মন কষাকষিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আলেম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদ দেখা দেওয়ায় প্রকৃত জেহাদের ক্ষেত্রে বাধা-অসবিধাই সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে খোদ বিলায়েত আলি ও ইনায়েত আলি সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধ স্মরণীয়।

২. জেহাদী আন্দোলনের নিস্ফলতার সবচেয়ে মর্মান্তিক দিকএই ছিল যে, পাহাড়ী আদিবাসীরা এ আন্দোলনের খাঁটি উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে অপরাগ হওয়ায় আদিবাসীদের মধ্যে বারে বারে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে বহুবার বিশ্বাস-

---

★ Choudhury, S. B : Civil Disturbances During the British Rule in India, Calcutta 1955, P-50.

ঘাতকতা প্রতারণার দ্বারা জেহাদী আন্দোলনের উপরে কুঠারাঘাত করেছে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, পাহাড়ী অধিবাসীরা কখনও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিঃস্বার্থভাবে জেহাদের জন্য দণ্ডায়মান হয়নি; সুবিধাবাদী ও অর্থগৃধ্নুর ভূমিকা নিয়ে জেহাদীদেরই সর্বনাশ সাধনে উৎসাহী হয়েছে, পাহাড়ী আদিবাসীদের নিয়ে জেহাদ আন্দোলন করার এইটাই ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক দুর্বল দিক।

৩. জেহাদী আন্দোলনের লোক ও রসদ সরবরাহ হতো সারা পাক-ভারতের দূরদূরান্ত প্রত্যেক অঞ্চল হতে—হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী রংপুর, মালদেহ, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাংলাদেশের অঞ্চল থেকে এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকেও। এসব লোক ও রসদ সরবরাহ হতো সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ শাসনাধিকারের অভ্যন্তর দিয়ে; এবং তার দরুন রসদ ও জেহাদী সরবরাহটা বরাবরই বিপদসংকুল ছিলো এবং যে-কোন সময়ে যুদ্ধের অতি প্রয়োজনীয় এ দুটি উপকরণ বন্ধ হয়ে যেতো, কিংবা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো।

৪. সর্বশেষে বলা যায়, জেহাদীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিলো পুরোনো প্রণালীর। এজন্যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও কারিগরি বিদ্যায় অনেক উন্নত ইংরেজদের অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদীদের অস্ত্রশস্ত্র তুলনামূলকভাবে একেবারেই নিম্নমানের ছিলো। মালকায় জেহাদীদের যে পুরোন আমোলের বাবুদের কারখানা ছিলো এবং হস্তনির্মিত বংশদণ্ডের বন্দুকসমূহ প্রস্তুত করা হতো, সেগুলির আধুনিক বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে নির্মিত এনফিল্ড রাইফেলের সংগে মোটেই তুলনা করা চলে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগ্রাম সংঘাতে প্রাচ্যের এই অস্ত্রশস্ত্র শোচনীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতাই যে পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের উপর সাফল্যের সৌভাগ্যদান করেছে তার পরিণতি দেখা গেছে চীনের সংগে সংগ্রামে, আঠারোশো সাতান্নর বিপ্লবে এবং জেহাদীরাও এই অক্ষমতার শিকারে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, এই বিসদৃশ ও অসম অবস্থাটা মুসলমান ধর্মীয় নেতারা কোনও সময়ে অনুধাবন করতে পারেননি, এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক ধরনে উন্নয়ন করতে কিংবা যুদ্ধকালে আধুনিক কলা-কৌশল অনুসরণ করতে চেষ্টা করেননি।

৫

এবার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের আলোচনা করা যেতে পারে।

পাক-ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারের সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌র নাম। কারণ আঠারো শতকের মাঝামাঝি তিনিই প্রথমে এ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মনে রাখা ভালো যে, ঠিক এই সময়ে আবদুল ওহ্‌হাব হেজাজে তাঁর ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন এবং শাহ আবু তাহির নামক এক মশহুর আলেমের নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। মক্কা থেকে ১৭৩০ সালে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়। এমন কোনও প্রমাণ মেলে না যে, আবদুল ওহ্‌হাবের সংগে শাহ ওয়ালিউল্লাহর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। ওয়ালিউল্লাহ লক্ষ্য করেছিলেন, শরীয়তী ইসলামের প্রতি সূফীদের উদাসীনতা ও অবজ্ঞা ইসলাম ও মুসলিম সমাজ

জীবনের শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিলো, তাঁদের আচরিত ও বহু প্রচারিত ইসলামবিরুদ্ধ মতবাদের অনুপ্রবেশ মুসলিম ধর্মজীবনকে কলুষিত করেছিলো। পেশাদার সুফীর প্রার্দুভাব ও কবরপূজার প্রথাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছিলো। ওয়ালিউল্লাহ্ অবশ্য তাসাউফের উচ্ছেদ চাননি, তাঁর লক্ষ্য ছিলো সুফীবাদের সংস্কার। তিনি সুফীবাদকে সংস্কার করে তা সমাজের কল্যাণে লাগাতে চেয়েছেন। পেশাদার পীর-ফকির ও কবরপূজা, কেরামতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর 'ওসিয়তানামায়' বহু যুক্তি ও নির্দেশ আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর জবর-দস্তি করা তিনি অন্যায় মনে করতেন।

ওয়ালীউল্লাহ্র সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, মুক্তবুদ্ধি ও ধর্মীয় উদারনীতির শিক্ষা দিয়ে সমাজ সংস্কারের দিকে জোর দেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত সৈযদ আহমদ যে 'তারগিব-ই-মুহম্মদীয়া' নামক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন, তার বিস্তারিত কর্মসূচী মেলে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' নামক পুস্তকে; সৈয়দ আহমদ প্রথমে মুরীদদের বহুল প্রচারিত চারটি প্রধান সুফী তরিকায়—চিশতীয়া, কাদেরীয়া, নকশ্বন্দিয়া ও সোহ্রাওয়ার্দীয়া—দীক্ষা দিয়ে পরে মুহম্মদী তরিকায় দীক্ষা (তলকিন্) দিতেন। তাঁর তরিকার অনুসারী লোক এখনও আছে। তিনি ঈমানের দৃঢ়তা সাধনের ও ধর্মাচরণের উপরেই বেশি জোর দিতেন; তাঁর আদর্শিক সংস্কারযোগ্য বিষয়গুলি মোটামুটি এই : ঈমানকে দুর্বল করে এমন সব অভ্যাস, যেমন শরীয়তের বিধানকে অবজ্ঞা করা বা উপেক্ষা করা, পৌত্তলিক ও নাস্তিকসুলভ কথাবার্তা বা আচরণের প্রশ্রয়, আল্লাহ্ ও নবী সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথাবার্তা, কর্মফলের জন্য মানুষ ও আল্লাহ্র দায়িত্ব নিয়ে অর্থহীন চুলচেরা তর্কবিতর্ক, কদাচারী শিথিলবিশ্বাসী সুফীদের প্রভাবে পীরপূজা, কবরপূজা, শিরনী দেওয়া প্রভৃতি আচরণ যা থেকে ঈমানের ক্ষতি ও অপব্যয় হয় প্রচুর। সামাজিক কুসংস্কারেরও উল্লেখ আছে। বিয়েশাদী, নামকরণ, খাৎনা প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব আড়ম্বর করা অনাবশ্যক—কারণ সেসবেও অর্থের অপব্যয় হয়। দাফন উপলক্ষে নানারকম ব্যয়বহুল ও নিরর্থক অনুষ্ঠান। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ—এ কুপ্রথা রদ করতে সৈয়দ আহমদ নিজেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন।

উত্তর ভারতে শরীয়ত বিরুদ্ধ রীতি-নীতি মুসলমান সমাজে কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলো, আল্লামা ইকবালের একটি উক্তি থেকেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে : 'নিশ্চয়ই আমরা হিন্দুয়ানীতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দু'রকম জাতিভেদের কবলে পড়েছি—মজহাবী বিভেদ ও সামাজিক জাতিভেদ। আমরা এসব হিন্দুদের থেকে শিক্ষা করেছি, না হয় উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি। এটিই হচ্ছে একটি নীরব উপায়, যার দ্বারা বিজিত জাতি বিজেতার উপর চরম প্রতিশোধ নেয়।' মনে রাখা ভালো, ইকবাল এ খেদোক্তি করেছিলেন সৈয়দ আহমদের ওফাতের প্রায় একশো বছর পরে এবং তাঁর দ্বারা মুসলমান সমাজের সংস্কার সাধনেরও পর। শাহ্ আবদুল আজীজ ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য 'তারগিব-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলনের মারফত ইচ্ছা করেছিলেন, যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ কুসংস্কার, চালচলন ও আচার-নীতি সাধারণ মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ লাভ করেছে, সেগুলির মুলোৎপাটন করা ও খাঁটি ইসলামী শিক্ষাদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এই আন্দোলনের ফলে বহু লোক ইসলামের সত্যিকার

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানারূপ শরীয়ত বিরুদ্ধ ও কুসংস্কারমূলক অভ্যাস পরিত্যাগ করে। এক সুপরিকল্পিত উপায়ে সারা পাক-ভারতে এই আন্দোলন বিস্তৃত করা হয় এবং একাজে একদল নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তকর্মী লোক নিয়োগ করা হয়।

সৈয়দ আহমদ পাটনায় তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল করেন। এখান থেকেই তাঁর খলিফারা পাক-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারকার্য চালাতেন। তাঁর হুকুমে খলিফা মুহম্মদ আলি সর্বপ্রথমে পূর্ব বাংলায় জেহাদী আন্দোলন শুরু করেন। তখন বাংলাদেশের অনেকে নামেমাত্র মুসলমান থাকায় তাদের খাওয়া-পরায়, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে সনাক্ত করাই কঠিন ছিলো। মুহম্মদ আলি তাদের ইসলামী বিধি ব্যবস্থা শেখাতে লাগলেন এবং তাদের হিন্দুয়ানী আচার-নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। ১৮২০ সালে সৈয়দ আহামদের চারজন খাস খলিফার অন্যতম মওলবী বিলায়েত আলি বাংলাদেশে হিজরত করেন এবং জেহাদী আন্দোলনের বিশেষ অনুশাসন ও শিক্ষাগুলি বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে জোর দেন। নামাজে সুরা ফাতেহা পাঠশেষে প্রত্যেকবার উপর দিকে হাত তোলার ও উচ্চকণ্ঠে 'আমীন' বলবার বিধি তিনিই বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। তাঁর শিক্ষার সারমর্ম ছিলো, কোরআনের পরেই হাদীস মুসলমানের একমাত্র অনুসরণীয় ব্যবস্থাপত্র। বাংলাদেশে জেহাদী আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো প্রচারক ছিলেন মওলানা ইনায়েত আলি, মওলানা কেরামত আলি, মওলানা জয়নুল আবেদীন ও মওলানা সৈয়দ মুহম্মদ জামাল-উল-লায়ল আরাবী। ইনায়েত আলির কর্মক্ষেত্র ছিলো মালদহ, বগুড়া, রাজশাহী, নদীয়া ও ফরিদপুর জিলাগুলিতে। জয়নুল আবেদীনের কর্মক্ষেত্র ছিলো ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেট জিলায়। তাঁদের শিক্ষার মহিমায় পূর্ব ও উত্তর বাংলার অনেক অনেক মুসলমান জেহাদ-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পাক্কা শরীয়ত অনুসারী ইসলাম আমল করতে শেখে। চাষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তাঁদের প্রচারকার্য বেশ ব্যাপকভাবেই হয়েছিলো। তাঁদের প্রচারণায় বাংলার মুসলমান যেন হারানো সম্বিৎ ফিরে পেলো, এবং কতোবড় তাহ্জীব ও তমদ্দুনের তারা অধিকারী, তাই সম্যক উপলব্ধি করে তাদের ধর্মীয় জোশ শতগুণে বর্ধিত হয়েছিলো।

উনিশ শতকে যে-তিনজন মহাপ্রাণ বাংলাদেশের মুসলমানের জীবনের সামগ্রিকভাবে সংস্কারসাধন করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের নাম হাজী শরীয়তুল্লাহ, শহীদ তিতুমীর ও মওলানা কেরামত আলি। তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্মভূমি ছিলো নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষক ও কারিগর মুসলামন সমাজে—তিতুমীরের চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরে এবং অন্য দু'জনের সমগ্র পূর্ব বাংলায়। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কাহিনী বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ। একদিকে ধর্মীয় সংস্কার করে তারা ইসলামের আদি সূচিতা পুনর্নির্ণয় করেন; অন্যদিকে রাজনৈতিক ভূমিকায় তিতুমীর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ করেন; তাঁদের অর্থনৈতিক আন্দোলনও মুসলমানের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সূচিত করে।

এই ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হলে আমাদের ইতিহাসের আরও পশ্চাতে তাকাতে হবে। বাংলা যখন মুঘল বাদশাহীর সুবাহ্ হিসেবে ঢাকার নওয়াব নাজিমদের শাসনাধীনে ছিল (১৬১২—১৭০৪ খ্রীঃ) তখন তাঁদের নিয়োজিত

কাজী-মুফতী ও মুহতাসিব নামাংকিত বিশেষ কর্মচারীরা থাকতেন। তাঁদের বিশেষ কর্তব্য ছিল, মুসলমানের ধর্মীয় জীবন শরীয়ত মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের শিক্ষা ও কালচার উন্নয়ন করা। তাঁদের অধীনে পল্লী অঞ্চলে নায়েব থাকতেন; তাঁরা মুসলমানের ধর্মসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতেন, বিয়ে-শাদী পড়াতেন, জানাযা, জুম্মার নামাজের ইমামতি করতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর এসব পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় ইংরেজ শাসন আমলে। ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রার নামে কাযীদের অস্তিত্ব রাখা হলো, কিন্তু সমাজের উপর আর তাঁদের পূর্বের মতো কর্তৃত্ব রইলো না। পীর, ফকীর ও খন্দকার নামে মুসলমান ধর্মনেতাদের প্রার্দুভাব ঘটল, কিন্তু তাঁদের প্রভাব রইলো নিজ নিজ শিষ্যদের মধ্যেই সীমিত। আরও দুঃখের কথা, তাঁরা আপন আপন ডালরুটি রোজগারেই ব্যস্ত রইলেন, মুসলমান জনগণের ধর্মীয় জীবনের খবরদারী করার মহৎ কর্তব্যটা বিস্মৃত হলেন। তার ফল এই হলো যে, মুসলমানের ধর্মীয় জীবনে বহু বেদাতের অনুপ্রবেশ হলো, এবং আরও আক্ষেপের কথা, এসব পীর-ফকীর-খন্দকার স্বার্থান্ধ হয়ে এসব ইসলাম বিরুদ্ধ আচার-নীতিরও প্রশ্রয় দিতে থাকেন।

এরূপ বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ছিলো পলাশীর যুদ্ধের পর ষাট বছরেরও উপর। বাংলার মুসলমানরা বিপথগামী হলো, প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাবে ও অনুকরণে বহু কুসংস্কার ও শরীয়তবিরুদ্ধ প্রথার তারা অনুসারী হয়ে পড়লো। বহু হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক-অসামাজিক আচার প্রচ্ছন্নভাবে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং কালক্রমে তাদের ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। অনেক নও মুসলমান দুর্বলতা ও অশিক্ষার কারণে পূর্বের দেবদেবীর পূজায় ও কুসংস্কারপালনে অভ্যস্ত থাকে; আবার অনেকে সুবিধা মতো সেগুলিকে ইসলামী পোশাক পরিয়ে ধর্মীয় মর্যাদাসিক্ত করে ফেলে। মা-বরকত, ওলা-বিবি, শীতলাবিবির পূজা দেওয়া, সিন্নি দেওয়া (হরিলুটের মতো), তবররুক (প্রসাদ) বিতরণ করা মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। কোরআনের আয়েত লিখিত কিংবা হিন্দুধর্মের মন্ত্রলিখিত তাবিজ (কবজ) পরার প্রথা, কলেরা বসন্ত মহামারীর সময় হিন্দুর অনুকরণে মাটির পাত্রে এসব আয়েত বা মন্ত্র লিখে বাড়ির দরওয়াজায় টাঙানো, তেলপড়া, নুনপড়া, কালিজিরাপড়া প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ চলিত হয়ে উঠে।

এসব ইসলামবিরুদ্ধ প্রথা ও আচারের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রবল আপত্তি ওঠে হাজী শরীয়তুল্লাহর কণ্ঠে। ফরিদপুর যিলার বন্দরখোলার এক দরিদ্র অখ্যাত কুলে জন্মগ্রহণ করেও তিনি বাল্যকালেই সুদূর মক্কায় গমন করেন এবং কুড়ি বছর সেখানে বসবাস করে আরবী ভাষা, তফসীর, হাদিস, ফিকাহ্ পাঠ করে একজন মশহুর মুহাদ্দিস নামে পরিচিত হন। ১৮১৮ সালে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে স্বযিলা তাঁর প্রচারক্ষেত্র ছিলো, পরে ঢাকা যিলার নয়াবাড়িতে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি জিলার কৃষক এবং হস্ত ও কুটিরশিল্প সমাজে তাঁর শিক্ষা প্রচারিত হতে থাকে। হিন্দু জমিদাররা তাঁর অর্থনৈতিক আন্দোলনে ভীত হয়ে তাঁকে বাধা দিতে থাকে কিন্তু আপন কর্তব্যে নিষ্ঠা ও সংকল্পে দৃঢ়তার জোরে তিনি এসব বাধা তুচ্ছ করে সংস্কার কর্মে জীবনপাত করেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা ছিলো, 'ফরয' অর্থাৎ অবশ্যপালনীয় ধর্মানুষ্ঠানের অনুগামী করা। এজন্যে তাঁর শিষ্যদের বলা হয় 'ফারায়েযী'। তিনি পীর-মুরীদের বদলে

ওস্তাদ-সাগরেদ সম্বন্ধ প্রবর্তন করেন ও 'বয়েত' গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। তাঁর আর একটি শিক্ষা, এদেশ দারুল হরব হয়ে যাওয়ায় এখানে জুম্মার ও দুই ঈদের নামাজ অসিদ্ধ। মুহররম মাসে তাজিয়া উৎসব করা, গীতবাদ্য করা, বিবাহাদি উৎসবে অনর্থক অর্থব্যয় করারও তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা ছিল, 'তওবাহ্' অর্থাৎ সর্বপ্রকার পাপাচার ও ইসলামবিরুদ্ধ আচরণ থেকে নিবৃত্তিই প্রধান কাম্য।

তাঁর পুত্র দুধু মিয়া ওরফে মুহম্মদ মহসীন পিতার আরব্ধ কার্য আরও বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধভাবে আরম্ভ করেন। তিনিও বাল্যকালে মক্কায় কিছুকাল বাস করে আরবী ভাষা, তফসীর, হাদিস, ফিকাহ্ উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাঁর সংগঠনশক্তি এরূপ প্রবল ছিলো যে, তাঁর আদেশ পালনে ষাট হাজার কর্মী সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো। তাঁর আন্দোলন ছিলো প্রধানত অর্থনৈতিক—অত্যাচারী জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। হিন্দু জমিদার ও নীলকররা তাঁর অনুগামী মুসলমানদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালাতো, তার তুলনা নেই। দরিদ্র কৃষকদের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে নাকে মরিচের গুঁড়ো দেওয়া হতো; শ্যামচাঁদের প্রহারে জর্জরিত করত। দাড়ি রাখার জন্যে, শাদী, খাৎনার উৎসবকালে পৃথক আবওয়াব আদায় দিতে হতো। কিন্তু মুসলমান রায়তকে দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চাঁদা দিতে বাধ্য করা ও জমিদারীর মধ্যে গো-কোরবানী নিষিদ্ধ করার মতো অত্যাচার ছিলো দুধু মিয়ার চোখে একেবারে অসহ্য। তিনি সব অন্যায় ও ইসলামবিরুদ্ধ আবওয়াব আদায় দেওয়া একেবারে নিষেধ করেন।

তিতুমীরের ভূমিকা প্রধানত সশস্ত্র বিদ্রোহ হলেও তার পটভূমিকা ছিলো সমাজসংস্কার। তিনিও মক্কায় যান এবং সেখানে সৈয়দ আহমদের সংগে তার সাক্ষাৎ হয়। দেশে প্রত্যাগমন করে তিনি সংস্কারকর্মে প্রথম আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর শিষ্যদের দাড়ি রাখতে ও শরীয়তের পাওবন্দ হতে শিক্ষা দেন। রায়তদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে ব্যথিত হয়ে তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। পূর্ণার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় দাড়ি রাখার জন্য জনপ্রতি আড়াই টাকা কর ধার্য করেন, তখন জমিদারদের সংগে তাঁর বিরোধ বাধে। সে বিরোধ পরে নীলকরদের ও সরকারের সংগে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপ নেয়। তাঁর শিষ্যদের বলা হতো মওলবী বা হেদায়তী।

মওলানা কেরামত আলির জন্ম জৌনপুরে এবং তিনি ছিলেন শাহ্ আবদুল আজীজের প্রত্যক্ষ ছাত্র। সৈয়দ আহমদের একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগ দেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর কেরামত আলি বাংলাদেশে হিজরত করেন ১৮৩৫ সালে এবং এখানেই বাকী জীবন সংস্কারকর্মে অতিবাহিত করেন। রংপুরে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়, পূর্ববাংলা হয় তাঁর কর্মক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধ ছিল না এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ফতোয়া দেন, পাক-ভারত মুসলমানের পক্ষে দারুল ইসলাম। কেরামত আলি ছিলেন শুদ্ধচিত্ত সাধুপুরুষ, ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। তাঁর সংস্কারকর্ম ছিল শান্ত ও নির্বিরোধী। ধর্মীয় সংস্কারই ছিল তাঁর একমাত্র ভূমিকা এবং এ সাধনায় তাঁর কর্মপন্থা ছিল দ্বিমুখী : প্রথম, পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজে যেসব ইসলামবিরুদ্ধ আচার অনুষ্ঠান ঢুকে পড়েছে, সেগুলি নিঃশেষে নির্মূল করা, এজন্যে তিনি 'রদ্দেবিদা' নামে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয়, বাউল প্রভৃতি যেসব সম্প্রদায় ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, সেগুলিকে সুশিক্ষা দিয়ে

সংশোধন করে পুনরায় ইসলামের গণ্ডিতে আনয়ন করা; এজন্যে তিনি 'হিদায়াত-অল-রাফিদীন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মওলানা সাহেব দিবারাত্র পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে ফিরেছেন প্রতিটি মুসলমানকে হিদায়েত করার দুর্বার বাসনা নিয়ে। চল্লিশ বছর তিনি নিরলসভাবে এ মহান ব্রতে অবিচলিত থেকেছেন। তিনি 'ওহাবী' ছিলেন না, যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সৈয়দ আহমদ একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন। এই অজাতশত্রু নিরভিমানী ন্যায়দর্শী উদার মহৎপ্রাণ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মুসলমানের ভাগ্যে ছিলেন আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্বরূপ।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাক-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলনের জোয়ার এসেছিলো উপরে তার যথাযথ রূপ বর্ণনার প্রয়াস করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সশস্ত্র আন্দোলনটাকে 'জেহাদী-আন্দোলন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; কারণ এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, শিখ ও ব্রিটিশ রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধন করে পাক-ভারতকে দারুল-ইসলামরূপে কায়েম করা। ধর্মরাষ্ট্র স্থাপিত না হলে ইসলামী ঈমান ও আমান প্রতিষ্ঠিত করা যায় না এবং ধর্মীয় সংস্কার সাধনও সম্ভব নয়—এটাই ছিল সেকালীন মুসলমান নেতাদের বিশ্বাস আর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার-কর্মে তাঁরা কায়েমী স্বার্থভোজীদেরও সংগে সংঘাতে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন অর্থনৈতিক কারণে। এজন্যে এই আন্দোলনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক রূপের সংমিশ্রণ ঘটেছিলো, যদিও সামগ্রিকভাবে এ আন্দোলনকে 'জেহাদী আন্দোলন' হিসেবে চিহ্নিত করাই প্রশস্ত।

কিন্তু নেহাত মতলববাজিতে সুবিধার জন্যে এ আন্দোলনকে 'ওহাবী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবং বিদেশী শাসক ইংরেজরা মুসলমানদের সশস্ত্র আন্দোলনকে লোকচক্ষে হেয় করবার হীন মনোবৃত্তিতে 'ওহাবী' নামাংকিত করেছে। আসলে হেজাজে আঠারো শতকে মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্‌হাব যে পিউরিটানিকা বা অতিনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সংগে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। পাক-ভারতীয় আন্দোলনকারীরা কখনও নিজেদের 'ওহাবীদের' সংগে চিহ্নিত করেননি। এ দেশী আন্দোলনের জনক হাযী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহ্ আবদুল আযীয, সৈয়দ আহমদ শহীদ, হাযী শরীয়ত উল্লাহ্ বা তিতুমীর কেউই আবদুল ওহ্‌হাবের বা তাঁর অনুগামীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নি।

ইসলামের চারটি মযহাবের যে-কোনও একটির অনুসারী হওয়া সুন্নী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু আবদুল ওহ্‌হাব ইমাম হাম্‌বলের অনুসারী হলেও তাঁর অনুগামীরা বরং কুরআন-হাদিসেরই একান্ত অনুসারী। পাক-ভারতীয় জেহাদীরা নিষ্ঠার সংগে মযহাবপন্থী ছিলেন। পীর-ফকিরী, কবর-মাজার জিয়ারতের বিরুদ্ধাচরণ করা আরবী ওহ্‌হাব-পন্থীদের প্রধান নীতি। এগুলিকে তারা পৌত্তলিকা জ্ঞান করে এবং বিশ্বাসে তারা ১৮০৪ সালে মদিনায় বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের মাযার পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছিলো। এ দেশীয় জেহাদীরা কখনও কবর মাযার জিয়াতরের বিরুদ্ধতা করেনি। তাছাড়া বাংলাদেশে যে সংস্কারধর্মী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো, তার সংগে হেজাযী আন্দোলনের কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। হয়তো আরবী আন্দোলনের সংগে পাক-ভারতীয় জেহাদীদের ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টার কিছুটা মিল ছিল, কিন্তু সেহেতু

জেহাদী আন্দোলনকে 'ওহাবী' হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। জেহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করেছে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধিমূলে। এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে একশ্রেণীর মোল্লা-মওলবীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলো প্রচারণা কার্যে। কিন্তু দুটি আন্দোলনকে একধর্মী বলে চিহ্নিত করা কখনও যুক্তিনির্ভর বা সমীচীন নয়।

উপরোক্ত মতামতের পোষকতায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের এ উক্তিটি উদ্ধৃতির যোগ্য :

> "আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোনো সম্বন্ধ ছিল এমন কোনও প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তখনও তিনি আরবদেশে যাননি। তাঁহার দল অনেকটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম করে, তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোনও সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না—তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসেবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তিসংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

তথ্যপঞ্জী :

Ahmad Q. A
Wahabism in india. Calcutta 1957
Hunter. W. W.
Indian Musalmans আবদুল মওদুদ কর্তৃক অনুদিত ও বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত।
Hans Kohn
History of Nationalism in the East
Encyclopaedia of Islam
Majumdar R. C.
History of freedom Mavement. iii
Moudud. Abdul
A Facinating chapter of the History of Islam in East Pakisan (The is Islamic Review. June 1951
Hafiz Wahba. Sir Shaikh
What Actually is Wahhabism? (The Islamic Review. December 1949) Choudhury S. B.
Civil Disturbances during the British Rule in India. Calcutta.

আযাদীর অমর মুজাহিদ : সৈয়দ আহ্মদ শহীদ

[১২০১—১২৪৬ হিঃ ১৭৮৬—১৮৩১ খ্রীঃ]

দু'শো বৎসরের ঘৃণ্য বিদেশী গোলামির বিষময় ফলে এদেশীয় লোকদের দাস-মনোভাব এতোখানি চরমে উঠে যে, তারা মহৎ ব্যক্তি ও মহৎ কাজ সম্পর্কে একদম বিরুৎসাহ ও নির্বিকার হয়ে পড়ে। আর এই মনোভাব বেশি লক্ষ্য করা যায় সৈয়দ আহ্মদ শহীদ সম্পর্কে; অথচ এক হিসেবে তিনিই ভারতে সত্যিকারভাবে স্বাধীন ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার জন্য নিজের জীবনও দান করেন।

সারা পাক-ভারতে যেসব আলেম ও ধর্মনেতার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কারও প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার সৎসাহস ছিল না যে, বিদেশীর শাসনাধীন ভারত হচ্ছে দারুল-হর্‌ব্, যেখানে জেহাদ করা অথবা অত্যাচারীর হাত থেকে যেখান হতে হিজরত করাই প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। দিল্লীর শাহ্ আবদুল আযীযই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে প্রকাশ্যে ফতোয়া জারী করে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

স্বৈরাচারীর প্রভাব থেকে মুসলিম-ভারতকে মুক্ত করার আকুল আগ্রহে শাহ্ আবদুল আযীয প্রবর্তন করেন মশহুর সমাজ সংস্কারক আন্দোলন 'তারগিব-ই মুহম্মদীয়া'। এর উদ্দেশ্য ছিল, যেসব ইসলাম-বিরুদ্ধ কুসংস্কার, চাল-চলন ও রীতিনীতি সাধারণ মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় প্রবেশলাভ করেছে, সেগুলির মূলোৎপাটন করা ও খাঁটি ইসলামী শিক্ষাদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এই আন্দোলনের ফলেই বহু লোক ইসলামের সত্যিকার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানারূপ অনৈসলামিক ও কুসংস্কারমূলক অভ্যাস পরিত্যাগ করতে শিখে। এক সুপরিকল্পিত নিয়মে শাহ্ সাহেব সারা ভারতে এই আন্দোলন শুরু করেন, এবং এ-কাজে একদল নিঃস্বার্থ ও অক্লান্তকর্মা লোক নিয়োগ করেন। কালক্রমে শীঘ্রই 'তারগিব-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে অত্যাচারী শিখ ও বৃটিশের বিরুদ্ধে আজাদীর আন্দোলনে পরিণত হয়।

কিন্তু জেহাদ-আন্দোলনকে লোকপ্রিয় করে তুলতে এবং বাস্তবভাবে জেহাদী অভিযান পরিচালনা করতে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন শাহ্ আবদুল আযীযের ভাইপো ইসমাইল শহীদ ও তাঁর মুর্শেদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী। সৈয়দ আহ্মদও শাহ্ আবদুল আযীযের মুরীদ ছিলেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এক মশহুর সুফী পরিবারে সৈয়দ আহমদের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ সৈয়দ ইব্‌নউল্লাহ্ রায়বেরেলীর প্রান্তভূমে বাদশাহ্ আওরঙজেব আলমগীরের সময় বাসস্থান কায়েম করেন। সেখানে তিনি হজরত ইব্রাহীমের মতো নিজের বংশের জন্য একটা মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান বালক ছিলেন; তাঁর দৈহিক শক্তি ও মনোবল ছিল অসাধারণ। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল না, তার দরুন তাঁর পিতার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সৈয়দ আহ্মদ কৈশোরে আশপাশের গ্রামে কিংবা সায় নদীতীরে সমবয়সীদের

সংগে ঘুরে বেড়াতেন, এবং কপাটি খেলা, মল্লক্রীড়া, সাঁতার ও ঘোড়দৌড়ে প্রচুর আনন্দ পেতেন। কিন্তু খেলাধূলায় যেমন তাঁর তীব্র নেশা ছিল, লোকসেবায়ও তাঁর তেমনি প্রচুর আগ্রহ ছিল। গরীব গ্রামবসীদের ছোটখাট কাজ করে দিতে পারলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না। অথচ তাঁর স্বভাবের দরুন তাঁর মুরুব্বিদের মাথাব্যথার অন্ত ছিল না, কারণ, তাঁদের মতে তাঁর মতো একজন আশরাফ কুলোদ্ভবের এসব কাজ করা মর্যাদার হানিকর ছিল। কিন্তু এসব তুচ্ছ পারিবারিক রুচি ও নীতির কাছে নতি স্বীকার করা সৈয়দ আহমদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি বেপরোয়াভাবে লোক-সেবায় ও সমাজ উন্নয়ন কাজে লিপ্ত হতেন, আবার খেলাধূলায়ও মশগুল থাকতেন। এভাবে তাঁর জীবনের সতেরো বৎসর কেটে গেলো, তিনি বেশ ব্যক্তিত্বশালী ও সংবেদনশীল তরুণ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর কেতাবী শিক্ষা লাভ কিছুই হলো না।

যখন তাঁর বয়স সতেরো বছর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তার দু'-তিন বৎসর পর কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এই গেঁয়ো তরুণ সভ্যতাভিমানী লক্ষ্ণৌ শহরে উপস্থিত হলেন দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য এবং সম্ভব হলে কোনও চাকুরী জোগাড়ের উদ্দেশ্যে। সে সময়টা ছিল খুব টানাটানি ও অভাবের। সৈয়দ আহমদ তাঁর পিতার জনৈক মুরীদের নিকট আশ্রয় পেলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ শহরের জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসারতায় তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেলো। তিনি শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে দিল্লী চলে গেলেন, এবং এভাবে দুনিয়াবী শান-শওকতের তৎকালীন লীলানিকেতন লক্ষ্ণৌ শহর, তার থেকেও পিছন ফিরলেন।

অনেকখানি রাস্তা পায়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে সৈয়দ আহমদ শাহ্ আবদুল আযীযের দরবারে এসে জোর গলায় জানালেন—'আসসালামু আলায়কুম'। বিশ বৎসরের যুবকের মুখে এই বলিষ্ঠ সম্ভাষণ 'আদাব ও তসলিমাত' অভ্যস্ত শহুরে ভদ্রশ্রেণীর কানে খুবই অদ্ভুত শোনালো। কিন্তু তাঁর নিরভিমান সারল্য সহজ ও ব্যক্তিত্বশালী চেহারা ও গভীর দৃষ্টিতে 'শেখুল হিন্দ্' মুগ্ধ হলেন এবং সহজেই উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর নতুন শিষ্য পালিশহীন হীরার একটি টুকরা।

উর্দু ভাষায় কোরআন শরীফের প্রথম তর্জমাকারী আবদুল কাদির তখন আকবরী মসজিদের মশহুর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করতেন। সমজিদের বহির্দেশে বহু কুটুরীতে অবস্থান করে শাহ্ আবদুল কাদিরের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাসাউফ-তত্ত্বে তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করলেন খোদ শাহ্ আবদুল আজীজ সাহেব।

মাত্র দুই বৎসরের সাধনায় সৈয়দ আহমদ ইসলাম জগতের অসামান্য মনীষা হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠলেন। এই সময়ের একটি দৃষ্টান্তে তার আধ্যাত্মিক গুরু লক্ষ্য করলেন যে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণে তাঁর পরম জ্ঞান অসাধারণ। সুফী সাধনানুযায়ী শাহ্ আবদুল আযীয তাঁর মুরীদকে শিক্ষা দিলেন যে, পীর মুর্শেদের চিন্তায় মনের এতোখানি একাগ্রতা আনতে হবে যে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। সৈয়দ আহমদ আপত্তি তুলে প্রমাণ চাইলেন যে, এ পদ্ধতি কেন পৌত্তলিকতার পর্যায়ে পড়বে না? শাহ্ সাহেব তাঁর সাধু সন্দেহের মুক্ত প্রকাশে ও

বিষয়টার তাত্ত্বিক সূক্ষ্মজ্ঞানে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শীঘ্রই শাহ্ আবদুল হক প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সৈয়দ আহমদের কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ্ তাঁকে এতখানি পরমজ্ঞান দান করেছেন যে, কেতাবী শিক্ষা তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। এর পর থেকে সৈয়দ আহমদকে অধ্যয়ন করতে না দিয়ে স্বাধীন এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, এই সময় সৈয়দ আহমদ স্বপ্ন ও অন্য উপায়ে তার উপর আল্লাহ্‌র অপার করুণার যেসব বাস্তব চিহ্ন পান, সে অন্য কোনও দরবেশের পক্ষে এত অল্প সাধনায় লাভ করা সম্ভব হয়নি।

অতঃপর ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ মাতৃভূমি রায়বেরেলীতে ফিরে আসেন ও জোহরা বিবিকে শাদী করেন। পর বৎসর তাঁর একটি কন্যার জন্ম হয়। প্রায় দুই বৎসর গৃহবাস করে তিনি দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে বেশিদিন না কাটিয়ে তিনি মধ্য ভারতে টংকে গমন করেন ও নওয়াব আমীর খাঁর অধীনে সামরিক বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদ ও সংস্কারক হতে হলে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষালাভের দরকারও তাঁর ছিল।

নওয়াব আলী খাঁ তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, এবং তৎকালীন ডামাডোলের সময় একটা বিশিষ্ট স্থানও অধিকার করেছিলেন। তার দরুন সৈয়দ আহমদের আশা হলো যে, তাঁকে দিয়ে ইসলামের কাজ করানো অনেকটা সহজ হবে। অতএব, সৈয়দ আহমদ নওয়াব সাহেবের অধীনে সাময়িকভাবে সামরিক কাজে নিযুক্ত হলেন ও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পেলেন। তাছাড়া, তিনি নওয়াবের বিশ্বাসও অর্জন করলেন এবং খাস পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর পাশে পাশে রইলেন। এভাবে প্রায় ছয় বৎসর তিনি বিশ্বস্তভাবে নওয়াবের সেবা করলেন। কিন্তু নওয়াব সাহেব যখন মধুপুর আক্রমণের সুবিধার্থে ইংরাজের সাহায্য গ্রহণে লালায়িত হলেন, তখন সৈয়দ আহমদেরও টংকে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠলো। তিনি বার বার নওয়াব সাহেবকে বোঝাতে চাইলেন যে, একবার ইংরেজের অর্থ গ্রহণ করলে তাঁর পক্ষে আর তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা অসম্ভব হবে। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, ইংরেজের বিপুল অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করা নওয়াবের পক্ষে সুকঠিন। সুতরাং তিনি নীরবে দিল্লী ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর হেফাজতে ও শিক্ষাধীনে ন্যস্ত শাহজাদাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে সৈয়দ আহমদের তৃতীয়বার দিল্লী আগমন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তখন তিনি আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের শিখরে উঠেছেন। তাঁর প্রস্তুতির সময় শেষ হয়ে এখন গঠনমূলক কাজের পালা শুরু হয়েছে। আগের মতো তখনও তিনি আকবরী মসজিদের কুটুরীতেই থাকতেন। সেখানেই হাজার হাজার লোক ভিড় জমাতো তাঁর উপদেশ শুনতে ও সঠিক পথের অনুবর্তী হতে। তাঁর আধ্যাত্মিক সাফল্যের কামালিয়াতের কাহিনী নানামুখে শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু শাহ্ আবদুল আজীজ ও শাহ্ আবদুল কাদিরের মতো মহৎ ব্যক্তির সামনে সাধারণ লোক তাঁকে গ্রহণ করতে কিছুটা দ্বিধাবোধ করলো।

তারপর একদিন দেখা গেলো শাহ্ আবদুল আজীজের জামাতা শাহ্ আবদুল হাই ও ভাইপো শাহ্ ইসমাইল তাঁর পেচনে নামায পড়ছেন। তার ফল এই দাঁড়ালো যে, লোকে তাঁর শিষ্য হতে ব্যাকুল হয়ে উঠলো এবং তাঁর সেবায় তারা এতোখানি দেহমন সমর্পণ করলো যে, বারো তেরো বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে একই সময়ে বালাকোটের ময়দানে যুদ্ধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিলো (১৮৩১ খৃঃ)।

মশহুর আলেম ও শ্রদ্ধেয় মানুষ হিসেবে আবদুল হাই ও শাহ্ ইসমাইলের প্রচুর খ্যাতি ছিলো। অতএব, সৈযদ সাহেবকেই মুর্শেদ হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করায় সাধারণ লোকও তাঁদের অনুবর্তী হলো। তাঁছাড়া তাঁদের বংশেই শাহ্ আবদুল আযীযের মতো সুবিখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সৈয়দ সাহেবকে গ্রহণ করেছেন দেখে লোকের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এইসব কারণে সারা মধ্যভারতে বিদ্যুৎগতিতে সৈয়দ সাহেবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। চারিদিক থেকে জনসাধারণ তাঁকে আহ্বান জানালো। তিনি ওস্তাদ আবদুল আজীজের অনুমতি নিয়ে এসব জায়গায় সফর করতে আরম্ভ করলেন।

দোয়াব অঞ্চলের গাযিয়াবাদ, সইদাম মীরাট, মুজফফরপুর, সাহারানপুর, দেওবন্দ প্রভৃতি স্থানে সৈয়দ সাহেব ব্যাপকভাবে সফর করলেন (১৮১৯)। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি যেখানেই গেছেন, অলৌকিকভাবে জীবনে বিপ্লব এনেছেন, তাদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই যেন আল্লাহ্র আশীষ ও করুণা ঝরে পড়তো। ঘোর পাপীও তওবা করলো, পথভোলা মানুষ দিশা পেলো এবং সাধুলোকও মহত্তর জীবন অনুশীলনে নতুন প্রেরণা লাভ করলো। তাঁর জনৈক জীবনীকার আবদুল আহাদ বলেন যে, প্রায় চল্লিশ হাজার হিন্দু ও অন্যান্য বিধর্মী তাঁর শিক্ষার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সফরকালেই সৈয়দ সাহেব শিখদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতনের কাহিনী প্রথম শুনলেন, তাঁর অন্তর-মন সমবেদনায় ভরে গেলো। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ বারের মতো দিল্লীতে ফিরে গেলেন এবং শীঘ্রই স্বদেশে গমন করলেন। সেখানে প্রথম তাঁর অগ্রজের মৃত্যুসংবাদ পেলেন।

রায়বেরেলীতে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানে এই খোদাভক্তদের জীবনযাত্রা ছিল আদর্শস্থানীয় এবং দর্শকদের শিক্ষার যোগ্য। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে প্রায় সত্তর-আশিজন লোক সায় নদীর তীরবর্তী সৈয়দ বংশের পুরোন মসজিদের চারিধারে নিজ হাতে কুটীর তৈরী করে বাস করতেন। সে-বৎসর (১৮১৯ খৃঃ) গ্রীষ্মকালে জোর বৃষ্টি নামলো এবং নদীগুলোতে প্রবল প্লাবন এলো। খাবার হয়ে পড়লো দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু সৈয়দ সাহেব নির্বিকার চিত্তে তাঁর আশীজন খোদাপ্রিয় ও খোদাভক্ত সংগী নিয়ে এবাদত-বন্দেগীতে, লোকসেবা ও প্রচারকার্যে দিনরাত ব্যস্ত রইলেন। তাঁর তখনকার কর্মব্যস্ততায় হযরত 'সারমান-অব দি মাউন্টের' বিখ্যাত উপদেশাবলীর আক্ষরিক প্রতিপালনই লক্ষ্য করা যায় : তোমার নিজের জীবনে কি খাবে কি পান করবে সে বিষয়ে কোনো চিন্তা করো না—এমন কি দেহের চিন্তাও করো না যে, কি পরবে। কিন্তু আল্লাহর প্রেমের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করো তাহলে তোমার এ-সবই হবে।

ইসলামজগতের এতগুলো জ্ঞান-জ্যোতিষ্কের যেখানে সমাবেশ হয়েছিলো, সেখানে শিক্ষার চর্চা বাদ যেতে পারে না। সেখানে ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল—অসীম পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যিনি আজীবন ছায়ার ন্যায় নীরবে সৈয়দ সাহেবের মতো অশিক্ষিত পীরের অনুগামী হতেন; শেখুল-ইসলাম মওলানা আবদুল হাই, কুত্‌ব-ই-ওয়াখত মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ, শেখুল-মাশায়খ হাজী আবদুল রহীম, শেখুল-শেখ ও আরও অনেকে। তাঁরা সবাই শিক্ষা ও মর্যাদার মোহ্ বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় সৈয়দ সাহেবের তল্পীবাহক ও পদানুসারী হয়েছিলেন। এসব মনীষীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও খোদ সৈয়দ সাহেবের উদ্দীপনাময় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাবলী বাস্তবিকই মন ও আত্মার খোরাক ছিল। সৈয়দ সাহেবের নির্দেশক্রমে মওলানা ইসলাইল কর্তৃক সে সবের অনেকাংশ 'সিরাত-উল-মুস্‌তাকিমে' লেখা রয়েছে।

প্রাতঃকালে প্রচারণা, দিবাভাগে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম ও সারারাত্রি তহজ্জুদ ও এবাদতে জাগরণ—এসব ছিল এই খোদাভক্তদের দৈনন্দিন সাধারণ কর্মসূচী। ইসলামের খাঁটি গণতান্ত্রিক নিয়মে তাঁরা মস্‌জিদের মেঝেয় বসে একত্র খানাপিনা করতেন। সৈয়দ সাহেবের সাহচর্যে পূণ্য সঞ্চয় ও আল্লাহ্‌র করুণাভিক্ষা ছাড়া তাঁদের আর কোনও খেয়াল ছিল না। একই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা পরস্পরের উপদেশ-নির্দেশও অসংকোচে গ্রহণ করতেন। শাহ্ ইসমাইল অন্যসব মহৎ ব্যক্তির দুর্বলতাও অসংকোচে দেখিয়ে দিতেন, এমনকি তাঁর পীরকেও রেহাই দিতেন না। তিনি অসংকোচে সৈয়দ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, তাঁর বংশে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ্ না দেওয়ার শরীয়তী বরখেলাপ রেওয়াজ রযে গেছে। সৈয়দ সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁর মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন, এবং তাঁর পরিবারের এই ইসলাম-বিরুদ্ধ প্রথা রহিত করতে চেষ্টিত হলেন; আর তার প্রমাণ হিসেবে নিজেই প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবাকে পুনর্বিবাহ্ করলেন।

সৈয়দ সাহেবের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম থেকে ভণ্ডামি ও জাঁকজমক দূর করা, এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিশ্বনবীর সহজ সরল জীবনধারা অনুসরণ করা। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন তওহীদপন্থী, আল্লাহ্‌র একত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাসী—সবরকম শির্‌ক যেমন পীর আওলিয়ার বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সুন্নার পাওবন্দ হওয়া এবং হযরতেরই একান্ত অনুসারী হওয়া। মোট কথা, তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের চেয়ে প্রকৃত সাধু জীবন যাপনের দিকেই বেশি জোর দিতেন—কারণ তার ফলেই মানুষ একটা মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে ও কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র করুণারই ভিখারী হয় এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তিনি নিজের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর এতদূর সমর্পণ করেছিলেন যে, কাজে ও বিশ্রামে, অনুরাগে ও বিরাগে সব সময় তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী চলতে প্রস্তুত থাকতেন।

সৈয়দ সাহেব যখন হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ও তাঁর শরীক হতে সকলকে অনুরোধ জানালেন, তখন দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাঁর পাশে জমায়েত হতে লাগলো। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈদের নামাজের পর প্রায় চারশো স্ত্রী-পুরুষের একটি কাফেলা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলো। এলাহাবাদে পৌঁছবার পূর্বেই কাফেলাটি সাতশোতে

দাঁড়ালো। নদী পারাপার হতে নৌকার অভাবে তার গতি শিথিল হলো, তার উপর পথে নানা শহর থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগলো সেখানে তশরীফ নেওয়ার জন্য। এতে আর একটা সুবিধা হলো যে, বহুস্থানে তিনি তাঁর বাণী প্রচারের অবকাশ পেলেন। তিনি মানুষকে সহজ, সরল ও মহৎ জীবনের পথে আহ্বান করলেন, এবং হজ্জের প্রয়োজনীয়তাও প্রচার করলেন। হাজার হাজার লোক তাঁর নিকট বয়াত গ্রহণ করলো ও তাঁর শিক্ষা বুকে ধারণ করলো। এখান থেকে কলকাতা ও সেখান থেকে মক্কাশরীফ পর্যন্ত তাঁর আসা-যাওয়ার প্রশংসামুখর সফরের বিশদ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এখানে এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে, হেজাজে চৌদ্দমাস অবস্থানের পর তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রায়বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন করলেন সুদীর্ঘ পথে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে খাঁটি ইসলামের নরনারী করে ও তাদের ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসকে সুসংস্কৃত করে, আর অসামান্য সম্মানের পশরা মাথায় নিয়ে।

পাক-ভারতে প্রত্যাগমন করে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে সৈয়দ সাহেব আত্মনিয়োগ করলেন শিখদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার উপযুক্ত মানুষ ও অর্থসংগ্রহ করতে। তিনি দেশের প্রত্যেক ধর্মনেতার নিকট পত্র পাঠালেন ফরয হিসেবে জেহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে ও জেহাদের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করতে। এইরকম একখানি চিঠিতে তিনি নওয়াব সুলেমান-জাকে লিখেছিলেন :

> আমাদের বরাতের ফেরে হিন্দুস্তান কিছুকাল খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের শাসনে এসেছে, এবং তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম শুরু করেছে। কুফরী ও বেদাতীতে দেশ ছেয়ে গেছে এবং ইসলামী চালচলন প্রায় উঠে গেছে। এসব দেখেশুনে আমার মন ব্যথায় ভরে গেছে, আমি হিজরত করতে ও জেহাদ করতে মনস্থির করেছি।

তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তার দরুন বরাবর প্রচার করেছিলেন যে, প্রকৃত মুসলিম সমাজ সংগঠন করতে হলে শক্তি ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার দরকার। তিনি সীমান্তে কাজ শুরু করেন এই উদ্দেশ্যে যে, কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হলে একটা স্বাধীন এলাকার দরকার। তা'ছাড়া তিনি ভেবেছিলেন যে, সীমান্তের যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলি তার বিশেষ সহায়ক হবে।

এভাবে ভারতের প্রত্যেক অংশে জেহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা শেষ করে সৈয়দ আহমদ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রায়বেরেলী ত্যাগ করেন। তারপর জীবনের বাকী ছয় বৎসর ধরে চললো আল্লাহর সত্য মহিমা প্রচারের ও পাঞ্জাবে নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারের জন্য বিরামহীন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

চারদিক থেকে টাকাকড়ি আসতে লাগলো। যুদ্ধের হাতিয়ার, সরঞ্জাম ও ঘোড়াও আসতে লাগলো। হাজার হাজার মুজাহিদ তাঁর ঝাণ্ডার নিচে জমায়েত হতে লাগলো। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষের দিকে এই বাহিনী যখন যাত্রা শুরু করলো, তখন তার সংখ্যা দাঁড়ালো বারো হাজার। পরবর্তীকালে আরও বহু মুজাহিদ ছোট ছোট দলে এসে যোগ দিলো। সৈয়দ সাহেবের অনুরক্ত মুরীদ টংকের নওয়াব এই মুজাহিদ বাহিনীকে প্রথম টংকের দাওয়াত দিলেন, এবং জেহাদের যাবতীয় আঞ্জাম নিজের তত্ত্বাবধানে শেষ করে দিলেন।

কয়েক মাসের মধ্যে মুজাহিদ বাহিনী বেরেলী থেকে টংকে, তারপর মারিভানের মরুভূমি পার হয়ে সিন্ধুর মরুভূমিতে, তারপর হায়দরাবাদ ও শিকারপুর হয়ে বোলানপাসের ভিতর দিয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহারে এবং শেষে নওশেরার নিকটে উপস্থিত হলো। পথে অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্টও কম ছিল না। তবে শুক্রুরের পর থেকে পূর্বকার গঙ্গানদী বেয়ে ডালমাওন থেকে কলকাতা পর্যন্ত নৌকায় যাত্রা বিজয় যাত্রার মতো সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিলো। চারিদিক থেকে সরদারগণ, শাসকগণ ও স্থানীয় কর্মচারিগণ এবং সাধারণ লোক তাঁকে আনুগত্য জানিয়েছিলো—কেউ বা নজরানা দিয়ে, কেউ বয়াত গ্রহণ করে, আবার কেউ বা বাহিনীতে যোগ দিয়ে। গযনী কাবুল ও পেশোয়ার পার হয়ে বাহিনী নওশেরায় হাজির হলে পর শিখদের প্রকাশ্যে আহ্বান জানানো হলো ইসলাম গ্রহণ করতে, অথবা বশ্যতা স্বীকার করতে অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। শীঘ্রই এক নৈশযুদ্ধে মাত্র নয়শত মুজাহিদবাহিনী এক বৃহৎ শিখ বাহিনীকে এমন অনায়াসে পরাস্ত করলো যে, সারা সীমান্ত প্রদেশ তাদের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো। অতঃপর বহু স্থানীয় সরদার বিশেষ করে ইউসুফজায়ীরা সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিলো।

কিছুদিন পর শের সিংহ ও একজন ফরাসী জেনারেলের অধীনে প্রায় তিরিশ হাজার শিখ সৈন্য পেশোয়ারের মোহাম্মদ খাঁ ও ভ্রাতাদের নিকট কর দাবী করলো। খুবী খাঁ মনপুরী আক্রমণ করতে শিখবাহিনীর সাহায্য চাইলেন, এবং তিন হাজার শিখ তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হলো। কিন্তু মুজাহিদবাহিনী মনপুরী রক্ষার্থে অগ্রসর হলে শিখরা পঞ্চতরে সরে পড়লো, এবং সেখান থেকেও খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো।

শিখদের বিরুদ্ধে এই বিরাট সাফল্য সাধারণ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করলো, এবং গরহি-ইমাজির প্রায় দশ হাজার যুদ্ধপ্রিয় লোক সরওয়াব খাঁর অধীনে সৈয়দ সাহেবকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করলো। এমনকি পেশোয়ারবাসীরা তাঁকে নওশেরায় ঘাঁটি করতে ও শিখদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে অভিযান চালাতে আহ্বান জানালো। এই সময় প্রায় একলক্ষ মুজাহিদ সৈয়দ সাহেবের ঝাণ্ডার তলে জমায়েত হয়। কিন্তু শেখ সেনাপতি বুধসিংহের প্রলোভন পেশোয়ারের সরদারগণকে বশীভূত করে ফেললো। এমন কি তারা যুদ্ধের পূর্বে সৈয়দ সাহেবকে গোপনে বিষ দানও করে ফেলে। যা হোক, সৈয়দ সাহেব তীব্র বমি করে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন, এবং একরকম অচৈতন্য অবস্থাতেই হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু সম্মুখ সমরেও পেশোয়ারের সরদারগণ শিখদের সঙ্গে যোগ দেয়, এবং এভাবে মনোবল হারিয়ে মুজাহিদরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে।

এভাবে মারাত্মক আঘাত খেয়ে মুজাহিদবাহিনীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়লো। তখন তাদেরকে তিনটি দুশমনের মুকাবেলা করতে হয়—শিখ, পেশোয়ারের বিশ্বাসঘাতক সর্দারগণ ও হুন্দের দুর্গ-মালিক খুবী খাঁ। সৈয়দ সাহেব তখন সমগ্র সরহদ এলাকায় সফর করে ফিরলেন, এবং নাবিরা ও সোয়াতের দরবারেও উপস্থিত হলেন। টংকের নওয়াবকে এই সময়ের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে, প্রায় তিন লক্ষ লোক তখন সৈয়দ সাহেবের নিকট বয়াত গ্রহণ করে।

যুদ্ধশিবিরের জীবন ছিল বড়ো আশ্চর্য ধরনের। পারস্পরিক সাহায্য ও সেবা, এবং সর্বোচ্চ নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকেই সেখানে বাস করতো। তার দরুন যুদ্ধশেষে যারা জীবিত ছিল, তারা যেখানেই গেছে, সেখানেই নয়া জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ বহন করে নিয়ে গেছে '

স্থানীয় মুজাহিদরা অবশ্য আপন আপন গৃহে বাস করতো। প্রবাসী মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার, তারা বালাকোটের আশেপাশে বাস করতো। তাদের মধ্যে তিনশত বাস করতো সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে পঞ্জতর শহরের মধ্যে, এবং বাকী সাতশত বাস করতো চারদিকের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে। তাদের রসদ জোগান হতো সারা ভারতব্যাপী 'তরগিব-ই-মুহম্মদীয়া' প্রতিষ্ঠানের গোপন কর্মকুশলতায়। শাহ্ আবদুল আজীজের দুই মশহুর পৌত্র মওলানা ইসহাক ও মওলানা ইয়াকুব ছিলেন তাঁর কর্ণধার। দূর দূর অঞ্চল থেকে কাফেলার দল আসতো মানুষ নিয়ে, টাকা-কড়ি, রসদ ও চিঠিপত্র নিয়ে। এভাবে সারা ভারত থেকে যতো টাকাকড়ি ও রসদ আসতো, এবং যুদ্ধে যেসব মালামাল লুট করা যেত (মাল্-ই-গণিমাত) সবই বায়তুল মালে রাখা হতো। আর তার হেফাজতকারী ছিলেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র ভাইপো মুজাহিদ বাহিনীর কুতব মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ। তিনি এতোদুর ন্যায় নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষভাবে টাকাকড়ি ও রসদ ভাগ করে দিতেন যে, খোদ সৈয়দ সাহেবও একজন সাধারণ মুজাহিদের চেয়ে বেশী অংশ পেতেন না।

স্থানীয় বাশিন্দারা মুজাহিদদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতো—অবশ্য তাদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। যেখানে বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ছিল সেই পঞ্জতরের শাসকদের, বিশেষতঃ ফতেহ্ খাঁ ও আশরাফ খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। সবরকম দৈহিক কাজ—যেমন, মেথরের কাজ থেকে ঘরামীর কাজ সবই মুজাহিদদের করতে হতো, অথচ তাঁদের মধ্যে দিল্লী আগ্রার এমন বহু শরীফ লোক ছিলেন, যাঁদের জীবন কেটে গেছে আরাম আয়েশে প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সঙ্গে। তবু তাঁরা এসব কাজ হাসিমুখে অসংকোচে করতেন কেবল আল্লাহ্ প্রীতিতে মশগুল হয়ে। তাঁদের জীবনও ছিল বড়ো কষ্টের। যখনই বাইরের রসদে টানাটানি পড়তো ও স্থানীয় লোকদের সাহায্য মিলতো না, তখন জীবন হয়ে উঠতো আরও দুঃখময়। স্যাইদুর যুদ্ধের পর শীতকালটা বড়ো কঠিন সময় হয়ে পড়েছিলো। প্রায়ই মুজাহিদগণকে গাছের ছাল, পাতা ও ঘাস খেয়ে কাটাতে হতো। অথচ তাদের দেখে ভ্রম হতো যেন সবাই উৎসব করতে এসেছে। এতো হাসি, এতো আনন্দ নিয়ে তারা নিজের নিজের কাজ সমাধা করে যেতো।

ভদ্রতা ও সামাজিক সদ্‌ব্যবহার, নৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তারা কখনও অবহেলা করতো না। প্রত্যেকেই যেন সেবা করতে ও ত্যাগ করতে তৎপর থাকতো। তারা জেহাদ করতো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আর সেই সঙ্গে জেহাদ করতো হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেও। কুকথা, কুচিন্তা ও কুকাজ তারা সর্বতোভাবে পরিহার করতো। মশহুর আলেম ও ফাযিলদের সাহচর্যে অশিক্ষিতের দলও শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলো। শাহ্ ইসমাইল প্রতিদিনই কোরআনের তফসীর শোনাতেন, ফলে শ্রোতারা পরবর্তীকালে সারা ভারতময় তাঁর বাণী ছড়িয়েছিলো।

এই সময়ের মধ্যে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। তাতে বাংলা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের হালকা গঠনের মুজাহিদরা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই শক্তিমত্তা প্রকাশ করতো—শিখ ও বিশ্বাসঘাতক পাঠান গোত্রগুলি সমানভাবে তাদের হাতে মার খেতো। পেশোয়ারের দুররানী সরদারেরা এরপর প্রকাশ্যভাবেই শিখদের সঙ্গে যোগ দিলো, কারণ শিখদের টাকাকড়ির লোভ তারা দমন করতে পারলো না। তারা বারে বারে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হামলা চালাতো, কিন্তু প্রত্যেকবারই তারা প্রতিহত হতো। খুবী খাঁ প্রকাশ্যে স্থানীয় লোকদের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন।

সৈয়দ্ সাহেব প্রথমে স্থির করলেন যে, খুবী খাঁকে শায়েস্তা করতে হবে। তিনি শাহ্ ইসমাইলকে মাত্র দেড়শত মুজাহিদ নিয়ে হুন্দ কিল্লাহ্ অধিকার করতে পাঠালেন। শাহ্ ইসমাইল রাত্রির অন্ধকারে অন্তরালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলেন এবং প্রভাতে দ্বার খোলা হলেই নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করে তিনি কিল্লাহ্টা দখল করে ফেললেন। খুবী খাঁ নিহত হলেন। শাহ্ ইসমাইল দৃঢ়হাতে সব গোলযোগ দমন করলেন। খুবী খাঁর ভাই ইয়ার মুহম্মদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হুন্দ কিল্লাহ্ পুনর্দখল করতে অগ্রসর হলেন। পঞ্জতরের শাসক আশরাফ খাঁর দুই পুত্র ইসলাম খাঁ ও ফতেহ্ খাঁর অনুরোধক্রমে সৈয়দ সাহেব নিজে হুন্দের দুই-তিন মাইল দূরবর্তী জায়গায় ছাউনি ফেললেন। বিপক্ষদলের তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য কিল্লাহ্টা আক্রমণ করলো কিন্তু বিফল মনোরথ হলো। তখন দুইপক্ষ হারয়ানার প্রান্তরে সৈন্য বিন্যাস করলো। শাহ্ ইসমাইলও কিল্লাহ্র ভার মওলানা মযহার আলীর হাতে দিয়ে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। একটা আপোশের কথাবার্তা চললো, কিন্তু কোনও মীমাংসা হলো না। তখন মুজাহিদরা ক্ষিপ্রগতিতে রাত্রিকালে হামলা চালায় ও দুশমনদের কামান দখল করে ফেলে। তার দরুন শত্রুপক্ষ সহজেই পরাজিত হলো। এই সময় বহু মালামাল মুজাহিদর্দের হাতে পড়ে, কিন্তু স্থানীয় বাশিন্দারাই অধিকাংশ লুট করে নিয়ে পালায়। ইয়ার মুহম্মদ খাঁ নিহত হলেন। আমীর খাঁর ভাগ্যও অনুরূপ হলো। তখন শিখরা ও পেশোয়ারের সুলতান মুহম্মদ সৈয়দ সাহেবের বাকি প্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেলো।

অতঃপর সৈয়দ সাহেব কাশ্মীরে প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আম্বের পায়েন্দা খাঁ বাধা দিতে চেষ্টা করলে শাহ্ ইসমাইল আম্ব অধিকার করেন ও সেখানেই প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে শিখ নেতা রাজা রণজিৎ সিংহ একটা শান্তির প্রস্তাব পাঠান। তবে তাঁর দূতের পেছনে একজন ফরাসী সেনাপতি ও শের সিংহ একদল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীকে একরোখা দেখে তারা পিছু হটাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। তখন ইয়ার খাঁ স্থানীয় সরদারদের সঙ্গে মিলিত হন, এবং সমগ্র দূররানী গোত্র এক জোট হয়ে প্রায় বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণ করে। তারপরও সন্ধির সলাপরামর্শ চলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ রাত্রি পর্যন্ত। কিন্তু তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন মুজাহিদ বাহিনী প্রাণপণে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে ও বিধ্বস্ত করে ফেলে এবং যায়দার যুদ্ধের মতো তাদের সব কামানও দখল করে।

অতঃপর নির্বিঘ্নে পেশোয়ার প্রবেশ করতে সৈয়দ সাহেবের আর কোনও অসুবিধা হলো না। সকলেই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। তিনিও একটা বিশাল অঞ্চলে শরীয়তী শাসন প্রবর্তন করবার পূর্ণ সুযোগ পেলেন। আম্ব থেকে মর্দান পর্যন্ত তাঁর অধিকার স্বীকৃত হলো।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার চরম মার তখনও হয়নি। সব রকম চালাকি ও চতুরতা খাটিয়ে সুলতান মুহম্মদ সৈয়দ সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। সৈয়দ সাহেবও তার কথায় ভুললেন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শাসন চালাবার শপথ গ্রহণ করায় তাকে ক্ষমাও করলেন। মওলানা শাহ্ মযহার আলী কাজী নিযুক্ত হলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় সৈয়দ সাহেবের কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাশা ছিল না, শুধু আল্লাহ্র বাণী প্রচার করা এবং শরীয়তী শাসন প্রবর্তন করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শুধু রাজনৈতিক গরজেই তিনি একজন স্থানীয় শাসক নিযুক্ত করেছিলেন, অন্যথায় সামাজিক হিংসারই প্রশ্রয় দেওয়া হতো।

যা হোক, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আল্লাহ্র দেওয়া অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে সৈয়দ সাহেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এবং ইসলামী সমাজ ও ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তনে বিশেষ চেষ্টিত হলেন। পেশোয়ারের নিযুক্ত কাজী সাহেব ও আরও বহু কর্মী সারাদেশে প্রচারকের আগ্রহ নিয়ে রাতদিন কাজ চালাতে লাগলেন। কিন্তু আফসোস এই যে, স্থানীয় লোকের জড়তা ও বহুদিনের কুসংস্কার তাঁদের উচ্চমান কর্মব্যস্ততার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো; তাদের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা, কু-আচার ও বর্বর প্রকৃতির প্রতি স্থানীয় দেশাচার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের সমর্থনও ছিল। অতএব, সংস্কারকের দল যখন এ গুলোকে নির্মূল করতে চেষ্টিত হলো, স্থানীয় লোকেরা করলো অসহযোগ, এবং অজ্ঞতা ও সুকংস্কারজ্ঞাত ক্ষমতালোভী মোল্লার দল করলো তীব্র বিরোধিতা। তার দরুন একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ সৈয়দ সাহেবের প্রতি ফেটে পড়লো। বিশ্বাসঘাতক সুলতান মুহম্মদও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো—এক রাত্রিতে সৈয়দ সাহেবের নিঃস্বার্থ কর্মীদল চক্রান্তমূলে নিহত হলেন!

এই বিষম বিপদে সৈয়দ সাহেব চরম আঘাত পেলেন। মাত্র এক আঘাতেই তিনি কতকগুলো মহৎ সহকর্মী হারালেন এবং একটি বিস্তৃত এলাকা থেকেও বঞ্চিত হলেন। আর তার ফলে একটা আদর্শ সমাজ গঠনের আশাও বিলীন হয়ে গেল। এভাবে মোহভঙ্গ হওয়ার দরুন বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি স্থির করলেন যে, এই নিষ্ফলা নিমকহারামের দেশ ত্যাগ করে কাশ্মীরেই কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। নওয়াব উযির-উদ্দৌলাকে বালাকোট থেকে ১২৪৬ হিজরীতে ১৩ই জিলকদ তারিখের (১৮৩১ খ্রীঃ) লেখা শেষ চিঠিতে তিনি বলেছিলেন :

> পেশোয়ারের লোকেরা এমনই হতভাগ্য যে, তারা জেহাদে আমাদের মুজাহিদবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলো না, উপরন্তু তারা প্রলোভনে পড়ে গেলো এবং সারা দেশময় নানা কাজে আমাদের যেসব মহৎ লোক ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই হত্যা করে ফেললো। আমাদের আসল সৈন্যবাহিনী অবশ্য অক্ষত

> ছিল, এবং আল্লাহ্‌র রাহে শহীদদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেও তারা তৎপর ছিল। সেখানে আমাদের অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদে বহুসংখ্যক স্থানীয় মুসলিমের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে, কিন্তু বর্তমানে যখন আর কোনও আশা নেই, তখন আমরা স্থির করলাম যে, সেখান থেকে পাখ্‌লির পাহাড়ী অঞ্চলেই স্থান বদল করবো। এখানকার বাসিন্দারা অবশ্য আমাদেরকে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছে, জেহাদে যোগ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে এবং বসবাস করতে আমাদের জমিজায়গাও দান করেছে। এখন আমাদের ঘাঁটি এমন নিরাপদ স্থানে অবস্থিত যে, আল্লাহ্‌র মরজি দুশমনরা আমাদের সন্ধানও পাবে না। তবে আমাদের মুজাহিদরা বের হলেই যুদ্ধ বেধে যাওয়া সম্ভব, এবং দু'তিন দিনের মধ্যেই এমন একটা কিছু করবার ইচ্ছাও তাদের আছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, করুণাময় আল্লাহ্ তাদের ভাগ্যে জয়ের দরওয়াজা খুলে দেবেন। আল্লাহ্‌র রহমত আমাদের উপর বজায় থাকলে, এবং এই হামলায় আমরা জয়ী হতে পারলে ইন্‌শাল্লাহ্ ঝিলাম পর্যন্ত অঞ্চল ও সারা কাশ্মীরটা আমাদের অধিকারে এসে যাবে। ইসলামের তরক্কীর জন্য ও মুজাহিদ বাহিনীর সাফল্যের জন্য মেহেরবানী করে আল্লাহ্‌র দরবারে দিনরাত মোনাজাত করতে থাকুন।

এই সময় শের সিংহের সৈন্যবাহিনী মুজাহিদদের মুখোমুখি ছিল। তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সামগ্রিক শক্তি প্রয়োগে শেষ হামলা করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে আমলে বালাকোটে যাওয়ার যে দু'টি রাস্তা ছিল তার একটি জংগলে এমন ভর্তি হয়ে উঠেছিল যে, স্থানীয় দু'একজন বাসিন্দা ছাড়া অন্য কেউ তার অস্তিত্বও জ্ঞাত ছিল না; এবং দ্বিতীয় পথটি এমন একটা সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে ও সেতুর উপর দিয়ে ছিল যে শত্রুপক্ষকে খুব সহজেই বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল। এই দু'টি পথই খুব সাবধানে পাহারা দেওয়া হলো। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক গোপনে শিখদেরকে জঙ্গলাকীর্ণ পথটির সন্ধান দিলো। তার ফলে শিখরা অতর্কিতে মুজাহিদবাহিনীকে বেষ্টন করে ফেললো। কিন্তু কিছুমাত্র দমিত না হয়ে মুজাহিদরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলো, এবং যে মহান ব্রতের জন্য তারা আজীবন সংগ্রাম করে আসছিলো, তার জন্যই অবশেষে জীবনদানও করলো। খোদ সৈয়দ সাহেবও তাঁর বাহিনীর পুরোভাগে জেহাদ করতে করতে শহীদ হন। (১৮৩১ খ্রীঃ, মে)।

এভাবে এই উপমহাদেশে একটি আজাদ ইসলামী রাষ্ট্র গঠনপ্রয়াসী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শহীদের জীবনাবসান হয়। জীবনে তিনি নির্মম ভাবে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রতারিত হয়েছেন, আর মরণের পরেও তিনি উপেক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুসৃত বৃহৎ আন্দোলন স্তব্ধ হয় নাই। এই বিধন যজ্ঞের পরেও যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই টংকে অথবা বিহারশরীফের সাতানায় সৈয়দ সাহেবের বিশ্বস্ত খাদেমের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল স্থাপন করলেন। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা যখন শিখদের ন্যায় অত্যাচার শুরু করে, তখন মুজাহিদদের সর্বরোষ তাদের উপর উদ্যত হয়। কিন্তু তার দরুন তাদের ভাগ্যে জোটে কারবাস, উৎপীড়ন ও ফাঁসিকাষ্ঠে

মৃত্যুবরণের নির্মম শাস্তি, এবং তারও চেয়ে হীনতম ছিল নিম্নশ্রেণীর মোল্লা ও তথাকথিত আলেমদের দ্বারা এসব সংগ্রামী অগ্রপথিকদের নামে অযথা কুৎসা রটনা ও মিথ্যা ভাষণ। তাঁদের আন্দোলন নাকি ওহাবী আন্দোলনের নামান্তর এবং জেহাদ ঘোষণাও নাকি শরীয়ত বিরুদ্ধ। অবশ্য স্যার সৈয়দ আহমদের মতো সদিচ্ছা প্রণোদিত বন্ধুদের ভূমিকা অনভিপ্রেত ছিল না; কারণ, তাঁরা বাস্তবিকই এসব বীর মুজাহিদের কার্যকলাপ এমন ভাবে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন যে, তারা ইংরেজদের ক্ষতি বা অনিষ্টকামী নয়, এবং তারা বিদেশী শাসকদের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বাসীও বটে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য এরকম ছলনাময় ভূমিকার কোনও দরকার নেই। এখন সময় এসেছে এসব বীর মুজাহিদের গৌরবোজ্জ্বল অসমসাহসিক কার্যাবলীকে স্বীকৃতি দেওয়া ও শ্রদ্ধা করা, কারণ তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশে বহু পূর্বেই পাকিস্তানের বুনিয়াদ স্থাপনে সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন। যদিও সৈয়দ সাহেবের প্রতিষ্ঠানের মারফত পাকিস্তান হাসিল হয় নি, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, তার মধ্যেই ছিল বীজমন্ত্র; আর ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, রায়-বেরেলীর সৈদয় আহমদ শহীদের দান ছিল এই চেতনা উজ্জীবনে অপরিসীম।

বালাকোট বিপর্যয়ের পটভূমি

বালাকোটের বিপর্যয় আকস্মিক নয়, অভাবনীয়ও নয়। সাম্প্রতিককালে যেসব প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, সেসব থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ১৮৩১ সালের ৬ই মে (২৪শে জিল্‌কদ, ১২৪৬ হিজরী) তারিখে বালাকোটে সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ কয়েক শ' মুজাহেদীন নিয়ে যে মৃত্যু-যজ্ঞের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা ছিল কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার মতোই পূর্বনির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। মুজাহিদদের আজাদী-আন্দোলনের প্রায় পৌণে এক শতক ব্যাপী কর্মতৎপরতার প্রথম বিপর্যয় ঘটে বালকোটে। দ্বিতীয় বিপর্যয় ঘটে ১৮৫৭ সালের আজাদী-সংগ্রামে। আর তার শেষ পরিণতি হয়েছিল ১৯১৯ সালের খেলাফত-আন্দোলনে।

একথা সর্ববাদীস্বীকৃত যে, এ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে ছিলেন ভারতীয় আলেম, সম্প্রদায়, যাঁরা পরবর্তীকালে গোঁড়া, সংকীর্ণমনা, অপরিণামদর্শী ও প্রতিক্রিয়াশীল 'মোল্লা' হিসেবে ধিকৃত ও উপহাসিত হয়েছেন। কিন্তু একথা আজ তর্কের বিষয় নয় যে, পাক-ভারতে প্রথম বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহ আন্দোলনকে সংগঠন ও পরিচালনা করেছিলেন মুসলিম আলেম সম্প্রদায়। বস্তুতঃ পাক-ভারতীয় বাসিন্দাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মচেতনার উদ্‌গাতা হিসেবে এই আলেম সমাজকে বিবেচনা করা অত্যুক্তি হলেও আংশিকভাবে বাস্তব অবস্থাকেই স্বীকার করা হয়। কোনও রকম স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় চালিত না হয়ে এই আলেম সমাজ আজাদীর ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন ইসলাম রক্ষা, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এবং ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। হয়তো তাঁদের মানসে কোনও বাস্তব ধর্মরাষ্ট্রের চিত্র বা পরিকল্পনা দানা বাঁধেনি এবং এই বিদ্রোহ-আন্দোলন উপযুক্তভাবে সংগঠন ও পরিচালনা করবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও রচিত হয়নি। হয়তো তাঁদের ধর্মবুদ্ধি ও ইসলাম প্রীতি সমকালীন সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করতে বাস্তব ও যুগোপযোগী পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভংগি অর্জনে অক্ষম ছিল। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এই মুসলিম আলেম সমাজই—যাঁদের নেহাত সুবিধার জন্যে সমকালীন শক্তিলোভী শাসকসম্প্রদায় 'ওহাবী' নামে চিহ্নিত করেছিলো—পলাশীর পর আঠারো শ' সাতান্নর সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবের পূর্বে ও পরবর্তী কালের আম্বালা ও সিয়াকোহ্ অভিযানের যুগ পর্যন্ত পাক-ভারতীয় জনগণের অন্তরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও অসন্তোষের তীব্র বহ্নি ধূমায়িত ও প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। তাঁদের সে দেশপ্রেমে খাদ ছিল না, সে দেশপ্রেম সৌখিন বা নকল ছিল না। বাস্তব সত্যোপলব্ধির আন্তরিকতার উপরেই ছিল তার জ্বলন্ত প্রতিষ্ঠা।

পাক ভারতীয় মুসলমানদের এই রাষ্ট্রীয় চেতনার মূল উদ্‌গাতা ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর হাতেই মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংস্কারের যে কাজ আরম্ভ হয়, তাঁর উপযুক্ত পুত্র 'শামসুল হিন্দ' শাহ্ আবদুল আজীজের সময় সে কাজ আরও প্রসারিত ও কর্মমুখর হয়ে ওঠে। তাঁরই দুই উপযুক্ত শিষ্য সৈয়দ আহমদ ও শাহ

ইসমাইলের হাতে এই আন্দোলনের ক্ষাত্রশক্তি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। তাঁদের অস্ত্র প্রথমে উদ্যত হয় ক্ষমতাগর্বী শিখদের উপর; কারণ শিখরাই তখন মুসলমানদের 'ঈমান' ও 'আমান' বিপন্ন করে তুলেছিলো। এজন্যে এই জাতীয় সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করি, মুজাহিদরা শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

এই জেহাদের প্রথম স্তরে মুজাহিদরা আশ্চর্যজনক জয়লাভ করলেও এমন একটা মারাত্মক ভুল করে বসে, যার দরুন ১৮২৯ সালের প্রথম ভাগে তাদের অবস্থা আশ্চর্যরূপ সুবিধাজনক হলেও শীঘ্রই সঙ্গীন ও সংকটজনক হয়ে ওঠে, এবং শেষে বালাকোটের বিপর্যয়ে তাদের সব আশা-ভরসার সমাধি হয়ে যায়। এই মারাত্মক ভুলটিকে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেন, আন্দোলনের স্বরূপটিকে 'ইমারাত-ই-জেহাদ' বা জেহাদের ডাক থেকে 'ইমারাত-ই শরীয়ত' বা শরীয়তী শাসনের জিগীরে পরিবর্তন করা।

এই মারাত্মক পরিবর্তিত পদক্ষেপের পূর্বে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর জন্যে শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাক-ভারতীয় প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে। আবার সে আসন সবচেয়ে নিরংকুশ ছিল সীমান্তবাসী আদি জাতিদের মধ্যে। আদি জাতিরা তখন তাঁকে এতোখানি শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো যে, ১৮২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তিনি পেশোয়ার থেকে সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত সাম্মা সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষ 'সৈয়দ বাদশার' ঘোড়ার পায়ের ধূলিতে চুমা দিতে থাকে, এবং তাঁর উটের কাপড়খানিকে টুকরা টুকরা করে সংগ্রহ করে 'তবররুক' হিসেবে তাবিজ বাঁধবার জন্যে। যদিও এই প্রথম কাফিলার গাজীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫০ জন, তবুও তারা স্থানীয় সরদারদের সহায়তায় শিখদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আকোরা ও হুজরোর নৈশ আক্রমণে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করে। তার দু'তিন মাস পরে সিন্ধুনদের তটস্থ ছন্দে স্থানীয় বাসিন্দারা সৈয়দ বাদশার নিকট 'ইমামত-ই-জেহাদের' বয়েত বা শপথ গ্রহণ করে। তার ফলে ১৮২৭ সালের সাইদুর যুদ্ধের সময় সৈয়দ আহমদ প্রায় আশী হাজার আদিবাসী-বাহিনী সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তার ষাট হাজার ছিল ইউসুফজাই ও বজৌর এলাকার এবং বাকী বিশ হাজার ছিল পেশোয়ার ও হাশ্তনগরের শাসক ভ্রাতৃদ্বয় ইয়ার মুহম্মদ ও সুলতান মুহম্মদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে।

গাজীরা যদি সাইদুর যুদ্ধে জয়লাভ করতো, তাহলে শিখদেরকে সিন্ধুনদের পূর্ব দিকে বিতাড়িত করে দেওয়া সহজ হতো এবং তার ফলে হাজারা জিলা শিখদের হামলা থেকে একেবারে নিরাপদ করে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শিখদের অত্যাচার থেকে একেবারে রক্ষা করা সম্ভবপর হতো। কিন্তু গাজীদের ভাগ্যই ছিল বিরূপ। তার কারণ এই নয় যে, গাজীরা সংখ্যায় শক্তিমত্তায় শিখদের চেয়ে দুর্বল ছিল। তার কারণ ছিল দুররানী সরদার ইয়ার মুহম্মদের দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং আদিবাসী বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব। স্থানীয় শিখ ও ইংরেজ লেখকদের

সাক্ষ্যেই একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধজয় যখন প্রায় নিশ্চিত, এই সঙ্গীন কঠিন মুহূর্তে ইয়ার মুহম্মদ বিষ প্রয়োগ করে সৈয়দ আহমদকে অজ্ঞান করে ফেলেন এবং তার দরুন মুজাহিদ বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। আর ইয়ার মুহম্মদও খটক পার্বত্য অঞ্চলের কূটনৈতিক অবস্থাপূর্ণ স্থানটি পরিত্যাগ করে ভ্রাতা সুলতান মুহম্মদসহ শিখদের সংগে যোগদান করেন এবং মুজাহিদ শিবিরের সমস্ত গুপ্তসংবাদ ফাঁস করে দেন। তাদের পলায়নের সংগে সংগে সমগ্র আশি হাজার আদিবাসী-বাহিনী যেন কর্পুরের মতো চারদিকে মিলিয়ে গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র নয়শো মুজাহিদ টিকে রইলো। গাজীরা অবশ্য প্রাণ তুচ্ছ করে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

সাইদুর যুদ্ধক্ষেত্রে আদিবাসী-বাহিনীর এই পাঁচটি স্বাভাবিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে :

১. আদিবাসী সরদাররা, বিশেষত: সরদাররা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, আর তার প্রধান কারণ ছিল তাদের সর্বদাই স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তি।

২. আদিবাসীরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল সত্য, কিন্তু তার নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মোটেই ধার ধারতো না। আর এজন্যে হুন্দ, জায়দা, পঞ্জতর প্রভৃতির খানরা দৃঢ়ভাব অবলম্বন করেও অনুগামীদের সঙ্গীন মুহূর্তে ইতস্ততঃ পলায়ন প্রতিরোধ করতে পারতেন না।

৩. আকোরা ও হুজরোর যুদ্ধকালে লক্ষ্য করা গেছে যে, আদিবাসীরা অত্যন্ত লুণ্ঠনপ্রিয়। এমনকি ভীষণ যুদ্ধের সংকট মুহূর্তেও তাদের এ মনোবৃত্তি প্রদমিত করা সম্ভব হতো না, আর এজন্যে প্রায়ই যুদ্ধজয়ের সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতো।

৪. আদিবাসীরা প্রায়ই যুদ্ধকালে সংখ্যাল্প গাজীদেরকে পুরোভাগে থাকতে বাধ্য করতো এবং নিজেরা যথাসম্ভব নিশ্চেষ্ট থাকতো।

৫. মুজাহিদরা ছিল সংখ্যায় অল্প এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবাগত। আর তার দরুন আদিবাসীদের যুদ্ধকালীন বা শান্তির সময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

সাইদুর যুদ্ধক্ষেত্রে আদিবাসীদের এসব চারিত্রিক দুর্বলতা যদি মুজাহিদ নেতারা সম্যকভাবে অনুধাবন করে সেগুলির সংশোধন ও দূরীকরণ করবার এবং উপযুক্ত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করবার চিন্তা করতেন, তাহলে হয়তো এই পরাজয়ের শোচনীয় ধাক্কা কাটিয়ে উঠিতে পারতেন। কিন্তু এরকম কাররওয়াই বা কূট-কলাকৌশল ছিল এসব ধর্মভীরু নেতার একেবারে অজানা। তার দরুন এসবের পরিবর্তে তাঁরা নিজেরা আরম্ভ করলেন কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন ও নিয়ম পালন এবং আদিবাসীদের ধর্মীয় অনুরাগ উদ্দীপন করবার সবরকম উপায় অবলম্বন। রণনীতি ও রাজনীতির নিয়মানুসারে তখন কর্তব্য ছিল শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই পুনর্গঠন নয়, রাষ্ট্রীয় ও রণচাতুর্যেরও সম্পূর্ণ নয়ানীতি অনুসরণ করে অবস্থার সুশৃঙ্খলা আনয়ন করা। সৈয়দ আহমদ ও তাঁর খলিফারা তখন

যেরূপ আশ্চর্য প্রভাভ বিস্তার করেছিলেন অনুগামীদের উপর, তার দরুন এমন অবস্থা আনয়ন করা মোটেই কঠিন ছিল না। সৈয়দ বাদশা ও শাহ্ ইসমাইল তখন জনগণের নয়নমণি এবং সরদাররাও ছিলেন একান্ত বশংবদ। আকোরা ও সাইদুর যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদ বাহিনী যে নির্ভীকতা, ধর্মের জন্যে প্রাণের তুচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল তার দরুন সাধারণ আদিবাসীদের চোখে তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল। আদিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলীর শ্রদ্ধা করা এমন কি ধার্মিকের চেয়েও। শাহ্ ইসমাইল ছিলেন মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠার ও বলবীর্যের মূর্ত প্রতীক। এমন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে শুধু প্রয়োজন ছিল আদিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্যক অনুধাবন করা এবং তার সুবিধা গ্রহণ করা। কিন্তু মুজাহিদ নেতাদের এখানেই ছিল শোচনীয় দুর্বলতা। আর তার দরুন একের পর এক নির্মম পরাজয় ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের।

তাদের ভুলের সংখ্যাও ছিল মাত্রাবিহীন। মুজাহিদরা প্রথম কালে কোনো ছাউনি প্রস্তুত করতো না। অথচ পরবর্তী কালে যখন তাদের প্রভাব একেবারে ক্ষয়িত হয়ে যায়, তখন তারা ইসমত ও চমরকন্দে নিজস্ব ছাউনি করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তারা সরদারের গৃহেই আতিথ্যগ্রহণ করে কাজ চালিয়ে নিতো। তার দরুন স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম অবাঞ্ছিত জটিল অবস্থার উদ্ভব হতো।

সৈয়দ আহমদ প্রথম তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন হুন্দের দুর্ধর্ষ ইউসুফজাই সরদার খাদি বা গাদী খানের মেহমান হিসাবে। পরে পঞ্জতরের ফতেহ্ খানের ধর্মপ্রীতি ও জায়দার আশরাফ খানের ভক্তি-শ্রদ্ধা তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং কোনও উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে তিনি সহসা পঞ্জতরে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করেন। অথচ এ দুজন সরদার ছিলেন খাদি খানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এ জন্যেই খাদি খান সৈয়দ আহমদর উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। আরও এক সমস্যা ছিল যে মুজাহিদদের সংখ্যা ক্রমাগতই বর্ধিত হতে থাকতো, আর তার দরুন তাদের আহার ও আশ্রয় যোগানো এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো; ফলে সবচেয়ে অতিথিবৎসল সরদারকেও নাজেহাল হয়ে পড়তে হতো।

যা হোক, এই সময় সৈয়দ আহমদ একদল মুজাহিদ সোয়াত, চামলা ও বনায়ের সফর করলেন 'হিদায়াত' বা ধর্মশিক্ষা দানের উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্য দিকে শাহ্ ইসমাইল বাকী মুজাহিদের বৃহৎ বাহিনী নিয়ে অভিযান চালাতে লাগলেন শিখদের অধিকার থেকে আম্ব ও হাজরা মুক্ত করতে। শাহ্ ইসমাইলের এ উদ্যম কিছুটা সফল হয় এবং সাময়িকভাবে তিনি কয়েকটি কিল্লাহ্ অধিকার করে ফেলেন দুশমনের কবল থেকে।

মুজাহিদদের ইতিহাসে এটাই ছিল গৌরবমণ্ডিত কাল। তাদের কর্মকেন্দ্র প্রথমে পঞ্জতরে ও পরে খেহ্রে থাকাকালে তাদের একাধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে হাজারা, আম্ব, সোয়াত, ও দক্ষিণে নওশেরা ও আকোরা পর্যন্ত। সৈয়দ আহমদ এই সময় কিছুদিন একদল বেতনভোগী সৈন্য রাখতেও সক্ষম হয়েছিলেন এবং তখন একমাত্র দুররানী সরদাররা ব্যতীত আর কারও সাধ্য ছিল না তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করার।

'সৈয়দ বাদশারও' তখন ছিল সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত সময়। তখন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন এবং অনুগামী হিসেবে গর্ববোধ করতেন সমকালীন এসব আদিবাসী সরদারগণ ঃ অম্বের পায়েন্দা খান, মজফফরাবাদের জবরদস্ত খান্দ ও নজব খান, জায়দার আশরাফ খান, সরবলন্দ খান তানোলী, আগরোরের গফুর খান, হাবিবুল্লাহ খান, শেবার আনন্দ খান, মিশকার খান, পঞ্জতরের ফতেহ্ খান, খানখেলের আমানউল্লাহ খান, ভাতগ্রামের নাসির খান, কাগান ও সিত্তানার সৈয়দগণ, তেহ্কালের আরবার বাহরাম, চারগ্লাইয়ের মনসুর খান, তুংগীর মাহমুদ খান, আলাদন্দের ইনায়াৎউল্লাহ খান ইত্যাদি। হুন্দের খাদি খান যদিও অসন্তুষ্ট ছিলেন, তবুও তিনি সৈয়দ বাদশার বশ্যতা অস্বীকার করবার সাহস পেতেন না।

তখন ছিল শিখদের বিরুদ্ধে ছোটখাট অভিযান চালানোর চেয়ে ব্যাপক আক্রমণ করবার উপযুক্ত সময়। তার ফলে দুররানী সরদাররা ও পেশোয়ারের ইয়ার মুহম্মদ শিখদের সংগে গোপন ষড়যন্ত্র চালাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো এবং সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। কিন্তু সৈয়দ আহমদ অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, বরকজাই দুররানীদেরকে প্রথমে শায়েস্তা করে পশ্চাদ্ভাগ নিরঙ্কুশ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। তাঁর এ কাজের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে হয়তো মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাঁর পক্ষে অসুবিধাই সৃষ্টি হয়েছিল।

ইয়ার মুহম্মদ ও সুলতান মুহম্মদ শিখদের আজ্ঞাবহ হয়ে এবং তাদের সহযোগে সিন্ধু রাজপুতনার মধ্য দিয়ে পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে মুজাহিদ শিবিরে টাকা-কড়ি ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের পথে বারবার বিঘ্ন সৃষ্টি করছিলেন। এজন্যে দুররানীদেরকে শায়েস্তা করতে মুজাহিদ নেতারা প্রথমেই পেশোয়ার দখল করতে চেষ্টা করেন। শাহ্ ইসমাইলের পক্ষে এটা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেশোয়ার দখল করা মুজাহিদদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারা উৎমনজাই পর্যন্ত অগ্রসর হলো এবং সরদায়ের ছ'খানি বৃহৎ কামান দখল করে নিলো। কিন্তু এই যুদ্ধজয়ে পশ্চিম দিকের বিপদ দূরীভূত না হয়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হলো। এখন ইয়ার মুহম্মদ প্রকাশ্যে সৈয়দ আহমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আর তার ভাই সুলতান মুহম্মদ বিশ্বাসঘাতকতা করে মুজাহিদদের সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে শিখদের সংগে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

ঠিক এই সময়ে মুজাহিদ শিবিরে আত্মকলহ শুরু হয়ে গেল, যার ফল হলো অত্যন্ত বিষময়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা মাহবুব আলী মুজাহিদদের জীবনধারার কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি তুললেন শরীয়তের প্রশ্ন নিয়ে এবং শেষে বিরক্ত হয়ে শিবির ত্যাগ করে দিল্লীতে ফিরে গেলেন। উত্থাপিত প্রশ্নে হয়তো সত্য উভয় দিকেই ছিল এবং মাওলানা মাহবুব আলীকে একক দোষী করা নিশ্চয়ই সমীচীন হবে না। কিন্তু আত্মকলহের ফল এই হলো যে, দিল্লী থেকে মুজাহিদ শিবির একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অথচ তখন দিল্লীই ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। শাহ্ আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর তাঁর গদ্দিনশীন শাহ্ ইসহাক মুজাহিদদেরকে

সাহায্য পাঠাবার সবরকম চেষ্টা করতেন। কিন্তু মাহবুব আলীর মতো নেতৃস্থানীয় মওলানার প্রত্যাবর্তনে আন্দোলনটাই অনেকখানি আঘাতপ্রাপ্ত হলো। অতঃপর ভারত থেকে মুজাহিদ শিবিরে মানুষ ও রসদ প্রেরণ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এবং সীমান্ত থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ছাড়া সৈয়দ আহমদের আর কোনও উপায় রইলো না। তিনি কিছুদিন একদল বেতনভোগী সৈন্য পোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁকে এই সৈন্যদলও ভেঙে ফেলতে হয়।

দিল্লী থেকে মুজাহিদ শিবির বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আরও কয়েকটি সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। অতঃপর পঞ্জতর অন্যান্য স্থানের উপর দিল্লীর নৈতিক প্রভাব একেবারে ক্ষয়িত হয়ে যায়। তার উপর ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যতম মশহুর আলেম ও নেতা মওলানা আবদুল হাই-এর সহসা মৃত্যু হওয়ায় মুজাহিদ শিবিরের এক বিরাট ব্যক্তিত্বের তিরোধান হয়। তার ফলে তাদের মনোবলও অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। গোলাম রসুল মেহের প্রমুখ লেখকরা 'মনজুরা' ও 'ওয়াকেয়ার' ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, দিল্লীর তেমন কিছু প্রাণ-সঞ্জীবনী প্রভাব ছিল না মুজাহিদ শিবিরের উপর। কিন্তু এসব একদেশদর্শী বিবরণীর উপর নির্ভর না করে যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগিতে যাবতীয় প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করা হয়, তাহলে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, দিল্লীই ছিল মুজাহিদ শিবিরের প্রাণ-সঞ্জীবনী সূত্র এবং এ সূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদরা স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

কিন্তু অবস্থা চরমভাবেই খারাপ হয়ে ওঠে আর একটি বেদনাদায়ক কারণে। তখন শিবিরে বাস করতেন ইয়ামেন দেশাগত আল্লামা শওকতনী নামক একজন জবরদস্ত আলেম। তাঁহার প্রভাবে ও উদ্দীপনায় মওলানা মুহম্মদ আলী রামপুরী, বিলায়েত আলী আজিমাবাদী ও আওলাদ হোসেন কনৌজী বেদাত-অবেদাতের প্রশ্ন তুলে মুজাহিদ শিবিরকে দ্বিধাবিভক্ত করতে উদ্যত হলেন। তখন অনন্যোপায় হয়ে সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল এই তিন জন উগ্রপন্থী মওলানাকে শিবির থেকে বের করে দিয়ে ভারতে চালান দেন। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও জটিল হয়ে ওঠে। তাঁরা এক এক জন হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে হাজির হয়ে নিজ নিজ কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং নতুনভাবে মজহাবী বিরোধের সৃষ্টি করতে থাকেন। তার ফল এই হলো যে, নয়া উদ্যমে তাঁরা বেদাতী আলেমদের নামে ফতোয়া প্রচার করতে লাগালেন; আর সেই ফতোয়াগুলোকে ক্ষমতাগর্বী দুররানী সুলতান মুহম্মদ নিরীহ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকেন। অথচ মুজাহিদরা কোনও ওহাবী বা আহলে-হাদীস মতবাদের অনুসারী ছিল না। বরং একথা সত্য যে, মুজাহিদ-বাহিনী তখন পর্যন্ত এবং পরে নাসিরউদ্দীন দেহলবীর সময়ে ও ১৮৫২ খ্রষ্টাব্দে মওলানা বিলায়েত আলীর মৃত্যুসময় পর্যন্ত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র মৌল আন্দোলনের সংগে নিবিড়ভাবেই জড়িত ছিলেন। একথাও সঠিকভাবে বলা যায় না যে, ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের সংগে পরবর্তীকালে চিহ্নিত আহলে-হাদীস কিংবা তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল।

তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুজাহিদ বাহিনীর উপর অন্ততঃ ১৮৪০ সাল পর্যন্ত সুপণ্ডিত 'মওলানা' ও ধর্মনিষ্ঠ 'সুফী'-দের প্রভাব বারবারই ছিল অব্যাহত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে তাঁরা ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, শাহ্ ইসমাইল, শাহ্ আবদুল হাই, 'কুতব-ই-ওয়াক্ত' ইউসুফ ফুলাতী, নিজামউদ্দীন চিশতী, ইমামউদ্দীন বাঙালি, ওয়ালী মুহাম্মদ ফুলাতী, নাসিরউদ্দীন মাংগালরী ও নাসিরউদ্দীন দেহলবীর মতো সর্বজনমান্য আলেম ও সুফী। শাহ্ আবদুল আজীজের গদ্দিনশীন ও ওয়ারিস শাহ্ ইসহাক মুজাহিদ-বাহিনীকে বরাবরই সাহায্য করে গেছেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর হেজাজে হিজরত করার সময় পর্যন্ত। তবে তিনিও সৈয়দ আহমদ কর্তৃক বহিষ্কৃত উপরোক্ত তিনজন মওলানার মজহাবী বিরোধের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হননি।

আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয় এই মজহাবী বিরোধের বিশ্লেষণ করা। ওহাবী হিসেবে চিহ্নিত সম্প্রদায়ের কিংবা মওলবী নজীর হোসেন দেহলবীর অনুসারীর আজাদী সংগ্রামের ভূমিকা অস্বীকার করার অর্থই হবে প্রকৃত ও বাস্তব ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করা। আবার তেমনই ভুল হবে মজহাবী দৃষ্টিভংগি দিয়ে মুজাহিদ আন্দোলনকে মৌল ওয়ালীউল্লাহ্ আন্দোলনের একাংশ হিসেবে বিবেচনা না করে পৃথকভাবে দেখা।

যা হোক, কাহিনীর মূলসূত্রে ফিরে আসা যাক। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, পঞ্জতরে অবস্থিত মুজাহিদ শিবিরের দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা খুবই মারাত্মক হয়েছিল। তার ফলে মুজাহিদ শিবির ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তাধারা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন শাহ্ শিবকাতুল্লাহ্ রাশদী প্রতিষ্ঠিত সিন্ধুকেন্দ্র ও সিন্ধুনদের অপর তীরস্থ টংক রাজ্যই মুজাহিদদের প্রধান সাহায্য উৎস ছিল।

১৮২৯ সালে মুজাহিদ শিবিরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যেটি মোটেই সময়োপযোগী হয়নি এবং যার ফলে এই বিচ্ছিন্ন ভাবটা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে। সেটি হলো পঞ্জতরকে কেন্দ্র করে 'ইমারত-ই শরীয়ত' বা শরীয়ত শাসন প্রবর্তন করা।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, আদর্শ হিসেবে এটি একটি উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সমকালীন অবস্থা বিবেচনা করলে একথা অনস্বীকার্য যে, ক্ষমতাগর্বী শিখদের এবং রাজ্যলোলুপ ব্রিটিশের সংগে সর্বাত্মক মুকাবিলা করতে হলে আদিবাসি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন ও সামাজিক ধর্মীয় সংস্কারসাধন ছিল প্রথম কর্তব্য। তখনকার সীমান্ত এলাকা ছিল আদিবাসীদের গোত্রে গোত্রে ও মানুষে মানুষে অহরহ রক্তক্ষয়ী কলহ-দ্বন্দ্বের এক শোচনীয় লীলাভূমি। আঞ্চলিক বাশিন্দাদের শৌর্যবীর্য ও যুদ্ধপ্রিয়তা ছিল অতুলনীয়, কিন্তু শতাব্দী ধরে তারা গোত্রীয় আত্মকলহে মগ্ন থাকায় সে শক্তি সাহস শোচনীয়ভাবে অপব্যয় হয়ে হয়ে অবক্ষয় হয়ে পড়েছিল। বাসিন্দারা ছিল অবশ্য ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আজাদী সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা। কিন্তু তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন আরবের ইসলামপূর্ব 'আইয়ামে জাহেলিয়া'র চেয়ে কোনও অংশে উন্নত ছিল না।

এই রকম পরিস্থিতিতে সহসা 'শরীয়তী শাসন' প্রবর্তন কতো দূর সমীচীন হয়েছিল, বিবেচনার যোগ্য। ইতিহাসের শিক্ষা ও দূরদর্শিতার মাপকাঠি বিচার করলে মনে হয়, এই পরিবর্তন সময়োপযোগি হয়নি। সহসা কোনও জাতির জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় না। ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের ধারাকে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করতে হয় লোকমানসের সংগে তাকে উপযোগিভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। লোকমানসকে উপেক্ষা করে রাতারাতি তার পরিবর্তন করতে গেলে সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে জনমন তার প্রতি বিমুখই হয়ে ওঠে, অন্তরের সংগে তা গ্রহণ করতে পারে না। লোকমানস ও পরিবেশকে অবহেলা করে দ্রুত জীবনধারার পরিবর্তন সাধানের প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই বেদনাদায়কভাবে ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

বর্তমানক্ষেত্রে আদিবাসীদের সংস্কার ও মন-মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রমে ক্রমে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সংস্কার সাধন ও শরীয়তী শাসন-প্রবর্তন প্রচেষ্টা সবচেয়ে সমীচীন নীতি ছিল। তখন শিখরা বলদৃপ্ত হয়ে মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করে ফেলে শিখসাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখছিল। অন্যদিকে বিদেশী বণিকজাতি তুলাদণ্ড পরিত্যাগ করে। রাজদণ্ড ধারণ পূর্বক সমগ্র উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। আদিবাসী সরদারের মধ্যে মোটেই ঐক্য ও সদ্ভাব ছিল না। সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্যক অনুধাবন করে ও বিবেচনা করে মুজাহিদ নেতাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল, জনমানসকে এতোটুকু বিক্ষুব্ধ ও প্রতিকূল না করে সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, শিখ ও ব্রিটিশ শক্তির সম্যক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে সকল সরদারকে এক পতাকাতলে আনয়ন করা ও সর্বাত্মক জনযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং জনমানস শিক্ষিত করে তোলার সংগে একটু একটু করে শরীয়তী নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত করে শরীয়তী শাসন প্রবর্তনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া। শিখদের বিরুদ্ধে একটা নিঃসন্দেহ যুদ্ধজয় এবং সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার মধ্যেই ছিল তখন মুজাহিদদের শক্তিসঞ্চয় ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপনের উপযুক্ত কৌশল। তার ফলে যে আবেগ উত্তেজনা সৃষ্টি হতো, মুজাহিদদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতো, তার দ্বারাই উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যেতো ক্রমে ক্রমে লোক জীবনকে শরীয়তী পন্থী করে নিয়ে প্রকৃত শরীয়তী শাসন প্রবর্তন করার।

মুজাহিদ কর্তৃপক্ষের এরূপ দূরদৃষ্টি ছিল না। এজন্যে শরীয়তী শাসন প্রবর্তনই প্রথম প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হলো। আদিবাসী চরিত্র অভিজ্ঞ হিতাকাঙ্ক্ষী পঞ্জতরের ফতেহ্ খান ও জায়দার আশরাফ খান এরূপ পন্থা সহসা অনুসরণ করার বিরুদ্ধে বার বার উপদেশ দিলেন জোরালো যুক্তি দেখিয়ে। কিন্তু তাঁদের সব উপদেশ ও সাবধানবাণী অগ্রাহ্য হলো। অবশ্য প্রধান সরদাররা উদ্বিগ্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও সৈয়দ আহমদের প্রতি বিশ্বাসী রইলেন। এমন কি খাদি খান যিনি হুন্দ থেকে পঞ্জতরে প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনিও সৈয়দ আহমদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার করে কিছু দিন চুপচাপ রয়ে গেলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পাঠান সরদারদের সাবধানবাণীর চেয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠান আলেম সম্প্রদায়ের জিদই প্রবল হয়েছিল। ১৮২৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বাদ জুমা এক আজীম উশ্-শান জলসা বসে। সে জায়গায় শরীক হন প্রায় দু'হাজার আলেম, কয়েক হাজার আদিবাসী এবং সোয়াত ও সাম্মা অঞ্চলের সমস্ত সরদার। বহু বাক-বিতণ্ডার পর সর্বসম্মতিক্রমে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১. ইমামের নিকট বয়েত বা আনুগত্য স্বীকার করার পর তাঁর না-ফরমানী করা গুনাহ্ কবীরা ও শক্ত অপরাধ।

২. দলত্যাগীকে সৎপথে আনয়নের সব রকম চেষ্টা আপোষে ব্যর্থ হলে তার সংগে জেহাদ জায়েজ।

৩. এ রকম জেহাদে যারা মৃত্যু আলিংগন করে, তারা বেহেশতে শহীদের মর্যাদা পায় এবং বিরুদ্ধবাদীরা অনন্ত কাল দোজখে নিক্ষিপ্ত হয়।

বলাবাহুল্য, এরকম জলসা মাঝে মাঝে বসতো ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। পরবর্তী ২০শে ফেব্রুয়ারীর জলসায় সৈয়দ মুহম্মদ হাব্বান নামে একজন স্থানীয় মশহুর আলেম নিযুক্ত হলেন কাজী-উল-কুজ্জাত এবং কুতুবউদ্দীন নাংগাশারী নামে এক স্থানীয় মোল্লা হলেন প্রধান কোতোয়াল।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, সাম্মা ও সোয়াতের সরদারগণ বিশেষতঃ হুন্দের খাদি খান, জায়দার আশরাফ খান প্রথম থেকেই শরীয়তী শাসনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন। ফতেহ্ খান অবশ্য বিনা প্রতিবাদে এসব সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এই সময় তিনি যা বলেছিলেন, তার দ্বারা বাস্তব অবস্থাই প্রকাশ পেয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন :

> এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই কঠিন কাজ। শরীয়তী শাসন প্রবর্তনের প্রধান লক্ষ্য হলো, সব রকম ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তি ত্যাগ করা। তার দরুন আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায় নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমাদের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত বহু রীতি ও প্রথাও বাতিল হবে। তবুও আমি সব রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছি। আমি অকুণ্ঠভাবে ইমামের আনুগত্য স্বীকার করে নিচ্ছি; কারণ আমাদের শিক্ষাই হচ্ছে যে, এ পথেই আল্লাহ্র করুণা মিলবে ও মৃত্যুর পর নাজাত মিলবে।

শেষ পর্যন্ত আশরফ খান, খাদি খান ও ফতেহ্ খান প্রমুখ আদিবাসী সরদারগণ একখানি একরারনামা সহি করলেন ও অঙ্গীকার করলেন :

১. উলেমা জলসায় তাঁরা যে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন, বিনা প্রতিবাদে তা পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন।

২. তাঁরা সৈয়দ আহমদকে ইমাম হিসেবে স্বীকার করলেন এবং বিনা প্রতিবাদে সর্বদাই তাঁর হুকুম মেনে চলবেন বলে স্বীকৃত হলেন।

৩. শরীয়ত-বিগর্হিত যেসব রীতি ও প্রথা আদিবাসীদের মধ্যে চলিত আছে, তাঁরা সেগুলি বর্জন করলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরা কুরআন ও সুন্নার নির্দেশ মুতাবেক চলতে বাধ্য থাকবেন।

নয়া পদ্ধতিতে যে হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলো, তা আধুনিক পরিভাষায় একটি যুক্তরাজ্য, যেখানে প্রত্যেক সরদারের থাকবে স্বশাসন এবং স্থানীয় শাসনকার্যে এক রকম দ্বৈতশাসন থাকবে, যাতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শক্তির নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

শরীয়ত শাসনে এইসব নিয়ম গৃহীত হয় :

১. একমাত্র খলিফার জেহাদ ঘোষণার অধিকার থাকবে এবং এজন্যে তিনি 'ওশর' (উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ) ও জাকাত আদায়ের হকদার হবেন।
২. দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্যে শরীয়তী আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে।
৩. একটি বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখান থেকে মুজাহিদ ও অন্যান্য সকলের মধ্যে সমান হিস্‌সায় মালামাল বণ্টন করা হবে।
৪. স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী আদিবাসীদের মধ্যে কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে তার চরম নিষ্পত্তির অধিকার থাকবে খলিফার।
৫. শরীয়ত বিরুদ্ধ সব রকম আচার, রীতি-নীতি ও প্রথা একেবার বাতিল গণ্য হবে।
৬. একটি 'ইহতিসাব' (পুলিশ) দফতর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার কর্তব্য হবে সাধারণের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা এবং প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানকে 'সিয়াম' (রোজা) ও 'সালাত' (নামাজ) পালন করতে বাধ্য করা।
৭. শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে সরকারের দায়িত্ব। প্রত্যেক মহল্লায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কেবলমাত্র কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ্ শিক্ষা দেওয়া হবে।
৮. সব মুজাহিদ ও সরকারী কর্মচারীকে গণ্য করা হবে আল্লাহ্‌র রাহে স্বেচ্ছাসেবক এবং পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলকে সমান আহার ও বসন দেওয়া হবে।
৯. কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আলেম ও সরদার নিয়ে একটি 'মজলিস-ই-শুরা' গঠিত হবে।

সামাজিক ন্যায়-নীতি ও সাম্যনীতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একথা নিঃসন্দেহ যে, এ ছিল এক আদর্শিক পদ্ধতি, যা বিশ্বনবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনপদ্ধতির আদর্শেই গঠিত হয়েছিল। এ শাসনব্যবস্থায় উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র কোনো ভেদাভেদ একেবারেই ছিল না। খোদ খলিফাও সাধারণ ভাণ্ডার থেকে বরাদ্দ পেতেন হীনতম ব্যক্তির মতোই মাত্র দৈনিক এক সের আটা, মোটা কাপড়ের দু'খানি পোশাক ও একখানি কম্বল। তাঁর কোনও বিশেষ ভাতা ছিল না, সুবিধা ছিল না বা আইনের চোখে রেহাই ছিল না। তিনি 'মজলিস-ই-শুরা'র নির্দেশমতো শাসন চালাতে বাধ্য থাকতেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁর মতের বিরুদ্ধেও 'মজলিস-ই-শুরা'র সিদ্ধান্ত চরম হিসেবে গণ্য হতো।

এরকম গণকল্যাণাভিসারী সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তনে প্রথমে বেশ সুফলই দেখা গিয়েছিলো। আদিবাসী অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার বালাই ছিল না। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম এলাকাটিতে আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হলো। মানুষের জীবনও হলো মর্যাদাসিক্ত, আর বিনা কারণে কিংবা অতি তুচ্ছ কারণে মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করা চলতো না। শতাব্দী ধরে যেসব আদিবাসীদের পারিবারিক বিরোধ ও রক্তের প্রতিশোধ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি চলতো, সহসা সে সব বন্ধ হয়ে গেলো। শরীয়তী আইন প্রবর্তনের পূর্বে আদিবাসীদের মধ্যে এ রীতি চলিত ছিল যে, কেউ যদি কোনও অপরাধ করে, তা সে যতোই গুরুতর হোক না, যদি কোনও গোত্রের নিকট আশ্রয় লাভ করতো, তাহলে আর কেউ তার কেশ স্পর্শ করতে পারতো না এবং এরকম চেষ্টা করলে সারা গোত্রটি অপরাধীর আশ্রয়দাতা হিসেবে তাকে রক্ষা করতো তার ফলে বংশাবলীক্রমে বহু শতাব্দী ধরেও খুনখারাবি চলতো। এখন অপরাধীরা এরকম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হলো। বরং সকলের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো, অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সাহায্য করা।

অদিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক রেওয়াজ ছিল, যা নীতি-বিগর্হিত, সামাজিক শৃংখলা বিপরীত ও শরীয়তের বরখেলাফ। যেমন বলপূর্বক বিবাহ করা, বিবাহার্থে কন্যা বিক্রয় করা, সাধারণ তৈজসপত্রের মতো বিধবাগণকে মৃতের ওয়ারিশানের মধ্যে ভাগ-বাঁটায়োরা করে নেওয়া, চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা, বলপূর্বক স্ত্রীকে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ না দেওয়া, মৃতের নাজাতের জন্যে মোল্লাদেরকে নির্দিষ্ট অর্থ দান করা, ইচ্ছামতো চুক্তিভংগ করা ইত্যাদি। এসব অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত থাকার দরুন অদিবাসীদের নীতিজ্ঞান ছিল নিম্নস্তরের ও জীবন হয়ে উঠছিলো অভিশপ্ত। যাহোক, এসব কুপ্রথা যতোই প্রাচীন ও সর্বজন-গ্রাহ্য হোক, নিশ্চয়ই শরীয়তের বরখেলাফ এবং কোনও শরীয়তপন্থী এসব কুপ্রথার প্রচলন সহ্য করতে পারে না। অতএব এসব কুপ্রথার বিলোপ সাধন সকল ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরই কাম্য। কিন্তু এ কাজ সহসা ও একদিনে করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত ছিল না। আদিবাসীরা ছিল অশিক্ষিত এবং বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত এসব রেওয়াজকে তারা ধর্মীয় অনুশাসনের মতোই শ্রদ্ধার সংগে পালন করতো। অতএব এখানে উচিত ছিল, ধীরে ধীরে জনমানসকে এসব কুপ্রথার কুফল সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অবহিত করে তোলা এবং ক্রমে ক্রমে এগুলির বাতিল করার চেষ্টা করা, যেন জনমানস সহসা বিক্ষুব্ধ না হয়ে ওঠে। কিন্তু কাজে প্রকৃত তাই করা হয়েছিল। এতোটুকু দূরদর্শিতা বা সাবধানতা অবলম্বন না করে মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিকে শীঘ্রই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তোলা হয়েছিল। আর তার দরুন যতোই কল্যাণাভিসারী হোক, এই সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টায় আদিবাসিগণ শরীয়তী শাসনের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলো।

তাছাড়া আরও একটি প্রবল কারণ ছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সকলকে একটি কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের অধীন করা হয়েছিল। অথচ আদিবাসীদের মজ্জাগত প্রবৃত্তিই ছিল কারও হুকুমের তাঁবে না হওয়া। তাদের নিকট স্বাধীনতা ছিল স্বেচ্ছাচারিতা। যারা

এতোটুকু নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মিতকরণ মোটেই বরদাশ্‌ত করতে পারতো না। কিন্তু কোনও সভ্য সরকারই বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতে পারে না। এজন্যে শরীয়তী শাসনকর্তৃপক্ষ যখন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলো, তখন আদিবাসীরা ক্রোধে ফেটে পড়লো।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এ নয়া প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থা যতোই গণকল্যাণাভিসারী ও আদর্শিক হোক, বাস্তব ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়নি এবং মুজাহিদ আন্দোলনের পক্ষে শুভও হয়নি।

প্রথম রূঢ় আঘাত এলো খাদি খানের নিকট থেকে। মানেরী নামক গ্রামের স্বত্বাধিকার নিয়ে বিরোধটা ওঠে। এই গ্রামখানি একটি আদিবাসী গোত্রে প্রায় নব্বই বছর ধরে আইনতঃ মালিকদেরকে বলপূর্বক বেদখল করে নিজেদের নিরংকুশ স্বত্বে ভোগ করতো। এ নিয়ে বহু মারামারি ও রক্তপাতও হয়েছিল। আদিবাসীদের প্রথানুযায়ী যারা একবার রক্তের বিনিময়ে কোনও জমি দখল করে তাতে তাদের স্বত্বাধিকার জন্মে যায় এবং আর তাদেরকে বেদখল করা চলে না। সৈয়দ আহমদের নিকট মানেরী গ্রামের আদি মালিকরা গ্রামখানির স্বত্ব দাবী করলো এবং তিনি ইসলামী আইনানুযায়ী গ্রামটি তাদেরকে প্রত্যার্পণের নির্দেশ দিলেন। এতেই খাদি খান বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, কারণ তিনি বিপক্ষদলের সাহায্যকারী ছিলেন।

খাদি খান ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুশিবিরে যোগ দিলেন। তিনি শিখদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, এবং একদল শিখবাহিনীকে পঞ্জতর মুজাহিদবাহিনী আক্রমণ করতে সাহায্য করেন। কিন্তু শিখদের আক্রমণ কার্যকরী হয়নি। তাদেরকে গাজীরা সহজেই বিতাড়িত করে দেয়।

অতঃপর সৈয়দ আহমদ আলেমদের ও খানদের একটি মজলিস আহ্বান করেন দলত্যাগীদেরকে কাফের হিসেবে ফতোয়া দিতে ও তাদের হত্যা করা শরীয়তসম্মত রূপে ঘোষণা করতে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য ছিল স্বয়ং খাদি খান ও তাঁর দলবল। মজলিশে এ নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয় ও খাদি খানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন খানরা মজলিশ ত্যাগ করেন।

এর পর খাদি খান ও তাঁর দলভুক্ত সরদাররা শিখদের সংগে প্রকাশ্যে যোগ দেয়। মুজাহিদরা তখন সিন্ধু নদের অপর তীরস্থ আটক আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, কিন্তু খাদি খানের বিরুদ্ধতা ও শিখদেরকে উপযুক্ত সময়ে সতর্ক করার ফলে মুজাহিদদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সৈয়দ আহমদ অবশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে খাদি খানের সংগে একটা আপোষ মীমাংসা করতে বার বার চেষ্টা করেছেন। এজন্যে উভয় পক্ষে কয়েকটা বৈঠক হয় এবং খাদি খান এক পক্ষে এবং সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল অন্য পক্ষে নেতৃত্ব করেন। খাদি খানকে ইসলামের দোহাই দিয়ে, ন্যায় ও নীতির দোহাই দিয়ে পুনরায় মিলিত হতে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু হুন্দের খান বরাবরই একরোখা রয়ে গেলেন। তাঁর জওয়াবও ছিল পরিষ্কার ও অর্থপূর্ণ। তিনি 'ইমারত-ই-শরীয়ত' সোজাসুজি অস্বীকার

করেন এবং 'মোল্লাদের' ফতোয়ার বিরোধিতা করেন ও বলেন যে, এগুলি আদিবাসীদের উপর বলবৎ হতে পারে না। কারণ সরদারই এসব অঞ্চলের মালিক ও শাসক এবং তারা কারও হুকুমের তাঁবেদার নয়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ব্যংগভরে বলেন :

> মোল্লারা তো আমাদের এঁটোকাঁটা খুঁটে খায়। আমরা ভিক্ষে দিই, ওশর দিই, ইসকাত দিই, আর তাই তারা কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচে। শাসননীতি তারা কী বোঝে? আমরা তাদের ফতোয়া মানি আমাদের সুবিধামাফিক। কিন্তু তাদের হুকুম আমরা মোটেই গ্রাহ্য করিনে। আমাদের শক্তি আছে, সাহস আছে, সামর্থ্য আছে আর আছে সমস্ত আদিবাসীরা আমাদের পিছনে। আমরা কারও অধীন নই। মোল্লারা আমাদের প্রজা, আমরা তাদের প্রজা নই।

এভাবে বিরোধটা দাঁড়ালো চরমে। খাদি খান পুনরায় শিখদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। জেনারেল ভেণ্টুরার অধীনে একটি শিখবাহিনী হুন্দের খানের প্রদর্শিত পথে পুনরায় মুজাহিদশিবির আক্রমণ করলো। কিন্তু এবারেও আক্রমকরা পরাজিত হয়।

সৈয়দ আহমদ তখনও আশা ছাড়েননি। তিনি খাদি খানের সংগে মিলনের এক বার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু খাদি খান তখনও রইলেন একগুঁয়ে হয়ে। শাহ্ ইসমাইল এবার শর্ত দিলেন, কেবলমাত্র 'তওবাহ' করেই খাদি খান পুনরায় দলে ফিরতে পারবেন। কিন্তু জেদী খান উত্তর দিলেন : আমি তো কোনও পাপ করিনি। আমরা দেশেরে শাসক, সৈয়দ বাদশার মত 'মোল্লা' 'মওলবী' মানুষ নই। আমাদের জীবনই পৃথক ধরনের। আমরা পাঠানরা সৈয়দ বাদশার শরীয়তী পথে চলতে অভ্যস্ত নই, প্রস্তুত নই।

তখন মুজাহিদ কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখে হুন্দের আপদ নিশ্চিহ্ন করাই সাব্যস্ত করেন। প্রাচীনকালের ভারতবিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আমল থেকে শিখদের কাল পর্যন্ত যে মশহুর কিল্লাহ্টি এই উপমহাদেশের প্রবেশপথে অবস্থিত ছিল, এক অতর্কিত আক্রমণে মুজাহিদরা সেটি দখল করে ফেলে এবং খোদ খাদি খানও যুদ্ধে নিহত হন।

নানা কারণে এই বিজয় গুরুত্বপূর্ণ। শাহ্ ইসমাইলের যুদ্ধকৌশল, রণনীতি জ্ঞানের এটি একটি চূড়ান্ত পরিচয়। হুন্দ কিল্লাহ্টির অবস্থান ছিল সিন্ধুনদের মুখে সমগ্র পাঞ্জাব ও ভারতে প্রবেশদ্বারপথে। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিতির দরুন অতঃপর আদিবাসী এলাকা বার বার শিখ হামলার সম্ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত হল। এরকমও সম্ভাবনা দেখা দিল যে, ভবিষ্যতে শিখদের সীমান্ত বিজয় স্বপ্ন একেবারে বিলীন হয়ে গেছে মুজাহিদদের হাতে। কিন্তু আফসোস এই যে, মুজাহিদদের অদৃষ্টই ছিল অপ্রসন্ন। খাদি খানের মৃত্যুতে এমন কয়েকটি ঘটনার সূত্রপাত হয় যার ফলে বালাকোটের শোচনীয় বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

খাদি খানের মৃত্যুর পর মুজাহিদ কর্তৃপক্ষ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আটক করেন গোলমাল নিবারণের অজুহাতে। তার দরুন খাদি খানের শ্যালক ও জায়দার নয়া সরদার মুকাররব খাঁর মুজাহিদদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, অথচ ইতিপূর্বে তাঁর পিতা আশরাফ খান বরাবরই মুজাহিদদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। মুকাররব পলায়ন

করে শত্রুপক্ষে যোগ দিলেন। সৈয়দ বাদশা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জায়দার সরদার নিযুক্ত করেন।

এদিকে খাদি খানের ভাই আমীর খান উপস্থিত হলেন পেশোয়ারের দুররানী সরদার ইয়ার মুহম্মদের দরবারে। ইয়ার মুহম্মদ মুজাহিদশিবিরে হামলা করবার সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি আমীর খানকে সংগে নিয়ে শিখদের দরবারে উপস্থিত হলেন ও মিত্রমূলক সন্ধি করলেন। নিজের বিশ্বস্ততার প্রমাণ স্বরূপ তিনি হুন্দের কিল্লাহ শিখদেরকে অর্পণ করলেন, নিজের পুত্রকে জামীন হিসেবে লাহোরে শিখ দরবারে প্রেরণ করলেন এবং অতিপ্রিয় মশহুর অশ্বিনী 'লায়লা'কে উপহার দিলেন রণজিৎ সিংহকে। বলাবাহুল্য, বহু দিন থেকেই রণজিৎ সিংহের এই বিখ্যাত অশ্বিনীর উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। শিখরা ইয়ার মুহম্মদকে বহু যুদ্ধাস্ত্র দান করলো। এভাবে সুসজ্জিত হয়ে স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক দুররানী সরদার মুজাহিদ শিবির আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন।

১৮২৯ সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর জায়দার বিখ্যাত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শাহ্ ইসমাইল একটি ক্ষুদ্র মুজাহিদবাহিনী নিয়ে দুররানী সরদারের মুকাবিলা করেন। এই যুদ্ধে তাঁর রণচাতুর্য চরমভাবে প্রকাশিত হয়। ইয়ার মুহম্মদ নিহত হন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী একেবারে বিধস্ত হয়। মুজাহিদরা ছয়টি বৃহৎ কামানসহ তাঁর সমস্ত সমরোপকরণ হস্তগত করে।

·জায়দার যুদ্ধ মুজাহিদ সংগ্রামের এক স্মরণীয় অধ্যায়। ইয়ার মুহম্মদ খান মৃত এবং কুচক্রী সুলতান মুহম্মদ অবস্থার চাপে মুজাহিদদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য। মুজাহিদদের শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আপাততঃ কেউ আর সাহসী নয়। গুরুত্বপূর্ণ কিল্লাহ্ হুন্দ হস্তগত হওয়ায় এবং কুচক্রী দুররানী সরদাররা একেবারে বিধস্ত হওয়ায় সিন্ধুনদের পূর্ব দিক শিখদের হামলা থেকে একেবারে সুরক্ষিত হয়ে ওঠে। এদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে শাহ্ ইসমাইল তখন পূর্ব-উত্তর দিকের পুখলি অঞ্চলে অর্থাৎ হাজারা ও বর্তমান আজাদ কাশ্মীরের মুজফফরাবাদ জিলায় দৃষ্টিপাত করলেন। সৈয়দ আহমদ এবার স্বয়ং মুজাহিদ বাহিনীর সংগে রইলেন। প্রথমে তারবেলায় হামলা চালানো হয় এবং শিখদের হাত থেকে খাবুবল অধিকার করে নেওয়া হয়। তখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে, এই অভিযানে আম্বের শাসক পায়েন্দা খানের সংগে সাহায্যের শর্তাবলী সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল। ঠিক এই সময়ে সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত জয়লাভ অসম্ভব। অতএব পায়েন্দা খানের সংগে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মুজাহিদবাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুলতান মুহম্মদ অতর্কিতে হুন্দ দখল করে নিয়েছেন ও পঞ্জতর আক্রমণের চেষ্টা করছেন। তখন সৈযদ আহমদ তাড়াতাড়ি পঞ্জতরে ফিরে এলেন শাহ্ ইসমাইলের উপর অভিযান চালাবার ভার দিয়ে।

পায়েন্দা খান কেবলমাত্র সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেননি, তিনি বাধা দিতেও প্রস্তুত হলেন। শাহ্ ইসমাইল তাঁকে কানেরী, আশরা, কোটারিয়া ও আম্বের যুদ্ধে একে একে পরাজিত করেন ও সন্ধি করতে বাধ্য করেন। পায়েন্দা খানের সংগে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সৈয়দ আহমদ সাময়িকভাবে আম্বের মধ্যে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

অতঃপর শিখদের অধিকারে অবস্থিত ফুলরার দিকে মুজাহিদবাহিনী অগ্রসর হয়। তখন শিখরা একটি সন্ধির প্রস্তাব করে। তারা সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকস্থ সমস্ত অঞ্চল সৈয়দ আহমদকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় এই শর্তে যে, মুজাহিদরা হাজারা জিলায় কোনও হামলা চালাবে না এবং একটিমাত্র অশ্ব শিখদেরকে বশ্যতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ দান করবে! বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব ঘৃণার সংগে প্রত্যাখ্যাত হয়।

শাহ ইসমাইল পুখলির দিকে অভিযান চালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চার দিকে পরিস্থিতি সবই অনুকূল ছিল মুজাহিদ পক্ষে। কিন্তু সহসা রূঢ় আঘাতের মতো সংবাদ এলো, সাম্মার আদিবাসীরা 'ওশর' আদায় দিতে অস্বীকার করেছে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

এ সংবাদ বজ্রাঘাতের মতোই মুজাহিদ শিবিরে পৌছে। সৈয়দ আহমদ শীঘ্রই একদল বাহিনীসহ কাজী সৈয়দ হাব্বানকে পঞ্জতরে পাঠান পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে। কিন্তু তার ফলে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে ওঠে যে, পরবর্তীকালে সৈয়দ বাদশার পতন অনিবার্য হয়ে যায়।

কাজী সৈয়দ হাব্বান খুবই গোঁড়া 'মোল্লা' হলেও বেশ কর্মকুশল ছিলেন। তিনি প্রথমেই শিখদেরকে সুলতান মুহম্মদ কর্তৃক ন্যস্ত হুন্দের কিল্লাহ্‌টি অধিকার করেন। তারপর তিনি প্রচণ্ড তেজে বিদ্রোহী সরদারগণকে শায়েস্তা করতে অগ্রসর হন। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন খালাবাত, মারখাজ, থান্তকুই, টপ্পা ওৎমাননামাহ, চার্গলাই, সুদ্দুম, শেখজানা, ইসমাইলিয়া, নবাকলাই প্রভৃতি কবিলার উপর। তাদের সরদাররা ও মোল্লারা সামান্য যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করেন। কেবল হোতিমর্দান আয়ত্তের বাইরে রইলো।

কাজী হাব্বানের এ কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি এই উপদ্রুত অঞ্চলে অতি শীঘ্র কঠোর হস্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তাঁর কার্যক্রমেও এতোটুকু অন্যায়ের প্রশ্রয় ছিল না। কিন্তু তা ছিল কঠোর ও জবরদস্তিমূলক। তাতে এতোটুকু দয়ামায়ার স্পর্শ থাকতো না। শক্তি ও জবরদস্তি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। কিন্তু দুটি মিষ্টি কথা, শান্তির কথা কিংবা হার্দ্যনীতির বালাই কাজী সাহেবের মোটেই ছিল না। অতি তুচ্ছ অপরাধে, এমনকি নগ্নদেহে কেহ পুকুরে-নদীতে গোসল করলেও তাকে বেত্রাঘাত করা হতো, জরিমানা আদায় দিতে হতো। 'কন্যাপণ' আদায় না দেওয়ার জন্যে যেসব পিতা বিবাহিতা কন্যাদেরকে ঘরে আটক রাখতো বহু কালের চলিত প্রথা হিসেবে, সেসব কন্যাকে বলপূর্বক স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তরুণী বিধবাদের জোরপূর্বক পুনর্বিবাহ দেওয়া হতো। সেনাবাহিনীর কেউ সামান্য কিছু জোরপূর্বক গ্রাম থেকে আদায় করলে যেমন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হতো, তেমনি ওশরের কড়াক্রান্তি পর্যন্ত আদায় করে গ্রামবাসীদেরকে উত্যক্ত করা হতো। মৃতের নাজাত ক্রয়ের জন্যে ওয়ারীশানের নিকট থেকে মোল্লারা যেসব 'ইসকত' আদায় করতেন বহুকালীন প্রথা হিসেবে, তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে কোনও মোল্লা সাহেব তর্ক তুললে তাঁকে রীতিমতো প্রহার করা হয় এবং 'আস্‌তগাফার' ও 'কলেমা' পড়ানো হয় ধর্মত্যাগীকে ইসলামে দীক্ষিত করার মতো।

এসব জবরদস্তিমূলক কাজের জন্যে সারা অঞ্চলে বিরক্তি ও চাপা বিদ্রোহের ঢেউ উঠতে থাকে। মোল্লারা ব্যক্তিগতভাবে ওশর ও ইসকাত আদায় করে নিজেরাই ভোগ করতেন। কিন্তু সরকার ওশর আদায়গ্রহণ করায় ও ইসকাত একেবারে বন্ধ হওয়ায় মোল্লাদের রুজি-রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে গেল, অথচ তাঁদের জীবিকার কোনও দ্বিতীয় ব্যবস্থা করা হলো না। তার দরুন প্রথমে যে মোল্লাদের আগ্রহে ও সহযোগিতায় শরীয়তী শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল, এখন তাঁরাই একযোগে সে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আর সরদারদের বিদ্রোহের হেতু পূর্বেই বিশদ হয়েছে। এভাবে কাজী হাব্বানের জবরদস্তি-শাসনে বাহ্যিক শান্তভাব দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগে সমগ্র সামা অঞ্চলে ও পেশোয়ারে বিদ্রোহের ধুমায়িত বহ্নি জ্বলে উঠেছিল।

এরকম জংগী শাসনে অঞ্চলটিকে শায়েস্তা করে কাজী হাব্বান নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হলেন হোতি ও মরদান দমন করতে। কারণ হোতির সরদার আহমদ খান ও মরদানের সরদার রসুল খান ওশর আদায় দিতে অস্বীকার করেছিলেন। মুজাহিদবাহিনী এই অভিযানেও জয়ী হয়েছিলো, কিন্তু কাজী হাব্বান নিজেই নিহত হন

বিপদ কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। পেশোয়ারের সুলতান মুহম্মদ প্রায় আট হাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে চামকানির নিকট যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। পঞ্জতর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং সৈয়দ আহমদ পুনরায় আম্ব থেকে কর্মকেন্দ্র সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হলেন। প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র হলো মাআর তোরার মাধ্যবর্তী সমতলভূমি। শাহ ইসমাইলের অপূর্ব রণচাতুর্য আর একবার কার্যকরী হলো এবং সংখ্যায় কম হয়েও মুজাহিদবাহিনী পুনরায় জয়ী হলো। হোতি ও মরদান পুনরায় অধিকৃত হলো। সুলতান মুহম্মদ অতি কষ্টে পেশোয়ারে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু পেশোয়ারও মুজাহিদদের অধিকারপথে এসে গেল। তখন অনন্যোপায় হয়ে 'তওবাহ' করে সুলতান মুহম্মদ আত্মসমর্পণ করলেন ও সন্ধি প্রার্থনা করলেন।

সৈয়দ আহমদ সুলতান মুহম্মদের চাতুরীতে ও মিষ্ট কথায় পুনরায় ভুললেন এবং একটা মারাত্মক ভুল করে বসলেন। মুজাহিদ কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণে সাহসী, নির্ভীক ও রণনিপুণ ছিলেন, তার উপযুক্ত কিছু পরিমাণেও রাজনীতির কূটচাল বুঝতেন না। সীমান্তে দীর্ঘকাল বাস করেও তাঁরা এই দুররানী সরদারের কূটচাল বুঝতেন না। সীমান্তে দীর্ঘকাল বাস করেও তাঁরা এই দুররানী সরদারের কুটনৈতিক কুবুদ্ধি এতোটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। সুলতান মুহম্মদ বারে বারে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, তবুও তাঁরা কুচক্রী স্বভাবের সম্যক পরিচয় পাননি। এজন্যে যখনই অনন্যোপায় হয়ে সময় কাটাবার মতলবে সুলতান মুহম্মদ সন্ধি প্রার্থনা করলেন, সৈয়দ আহমদ সহজেই তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। শাহ ইসমাইল ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা বার বার সৈয়দ আহমদকে বুঝালেন এই বিষধর সর্প প্রকৃতির দুররানী সরদারের কাতর বাক্যে বিগলিত না হতে। তাঁরা একটি একটি করে সুলতান মুহম্মদের পূর্বতন বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। এমনকি নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় আযীম খান ও আমীর দোস্ত মুহম্মদের সংগেও তিনি কী ভাবে চরম

বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সে সব নজীরও তুলে ধরলেন। কিন্তু সরলমনা সৈয়দ আহমদ এসব মোটেই আমল দিলেন না। তিনি করুণা দেখিয়ে পেশোয়ার প্রত্যার্পণ করলেন সৈয়দ মুহম্মদকে। সুলতান মুহম্মদের আনুগত্য স্বীকারে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে নিজের একান্ত অনুগত কাজী মজহার আলীকে পেশোয়ারে রেখে হৃষ্টমনে ফিরে এলেন নিজের স্থায়ী কর্মকেন্দ্রে।

সুলতান মুহম্মদ পেশোয়ারের গদি ফিরে পেয়ে নিজের মূর্তি ধরলেন। এবার অতি গোপনে বাঁকাপথে তিনি মুজাহিদ সংগঠনের সর্বনাশ সাধনে তৎপর হলেন। প্রথমে তিনি ব্রিটিশ ভারতের কয়েকজন ভাড়াটিয়া আলেমের এক 'মজহার' বা প্রচারপত্র সংগ্রহ করলেন। এতে সৈয়দ আহমদের দলকে একটি অভিযানপ্রয়াসী কাফেরের দল ও সুন্নাত জামাতের বহির্ভূত হিসেবে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। এসব আলেমের অনেকেই ছিলেন ইংরেজের বৃত্তিভোগী। সৈয়দ আহমদের দলত্যাগী কয়েকজন পূর্বতন অনুসারীও ছিলেন এই ফতোয়ার সমর্থক। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তাঁর দল ত্যাগ করে বিলায়েত আলী আজীমাবাদী, মুহম্মদ আলী রামপুরী ও আওলাদ হোসেন কনৌজী দক্ষিণ ও পূর্বভারতে মুজাহিদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মজহাবী প্রশ্ন তুলে বিদ্বেষবীজ ছড়াচ্ছিলেন। তাঁদেরই অবিমৃষ্যকারিতায় মুজাহিদ আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন হিসেবে স্বার্থান্ধ বিদেশী শাসকদের দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং হানাফী-ওহাবী মতবিরোধের প্রবল তরঙ্গ তোলা হয়। যাহোক, একথা অনস্বীকার্য যে, মজহাবী বিরোধই আর একবার ইতিহাসে সপ্রমাণ করলো যে, মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছে মুসলমানরাই, বাইরের শত্রুর চেয়েও।

এরকম সর্বনাশা ফতোয়া হস্তগত করে সুলতান মুহম্মদ কয়েকজন মোল্লা সংগ্রহ করলেন এবং মুজাহিদ সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে পাঠিয়ে দিলেন। মোল্লারা গ্রামে গ্রামে সফর করে অশিক্ষিত অধিবাসীদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে। এই বিদ্বেষ প্রচারণার খবর যথাসময়ে সৈয়দ আহমদের কানে পৌঁছালো। কিন্তু সুলতান মুহম্মদ সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে বাহ্যিক এবং মৌখিক এমন সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন যে, তিনি এসব সুলতান মুহম্মদের বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা গুজব হিসেবে উড়িয়ে দিলেন।

এভাবে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য চালিয়েই সুলতান মুহম্মদ ক্ষান্ত থাকেননি, তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবার এক গোপন পরিকল্পনাও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। এজন্যে তিনি গোপন সাংকেতিক শব্দও ব্যবহার করতেন। তার একটি ছিল 'খুন্দরুশ কোবী' অর্থাৎ জোয়ার ভাঙার প্রস্তুতি। একটি নির্দিষ্ট রাত্রে সমস্ত মুজাহিদকে একযোগে হত্যা করে ফেলাই হলো এই সাংকেতিক কথার ইংগিত। এ সম্বন্ধে সৈয়দ আহমদকে পূর্বেই সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ সংবাদও বিশ্বাস করতে পারেননি।

নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ উপস্থিত হলে সুলতান মুহম্মদ কাজী মজহার আলীকে ডেকে পাঠালেন পরামর্শ গ্রহণের অছিলায়। কাজী সাহেব সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলেই

সংকেত দেওয়া হয় এবং দশবারো জন ঘাতক সহসা তাঁকে হামলা করে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। কাজী মজহার আলীর হত্যাকাণ্ড ছিল মোল্লাপ্রচারিত বিদ্রোহের প্রধান ইংগিত। সেই রাত্রেই সারা অঞ্চলব্যাপী মুজাহিদরা যখন নিশ্চিন্তমনে কেউ ইশার নামাজে, কেউ ঘুমে, আবার কেউবা গল্পগুজবে মত্ত ছিল, তখন তাদেরকে একযোগে হামলা করে হত্যা করে ফেলা হয় এবং ঘোড়া ও খচ্চর দিয়ে তাদের মৃতদেহগুলি পিষে ফেলা হয়। এভাবে 'খন্দরুশ কোবী'র বীভৎস অভিনয় চলে সাম্মা, হশ্তনগর ও পেশোয়ারের সারা অঞ্চল জুড়ে। এখানে প্রায় কয়েক হাজার মুজাহিদ মৃত্যু আলিংগন করে।

এ সংবাদ বজ্রাঘাতের মতোই পঞ্জতরে পৌঁছে। তখন মাত্র এই এলাকাটি ব্যতীত সমগ্র আদিবাসী অঞ্চল হিংসায় মেতে উঠেছে মোল্লা ও মালিকদের প্ররোচনায়। সৈয়দ আহমদ পরিণতির গুরুত্ব সম্যক বিবেচনা করে আম্ব ও পুখলি অঞ্চল থেকে মুজাহিদবাহিনী পঞ্চতরে ফিরিয়ে আনেন। এত দিনে তাঁর চৈতন্য হলো এবং বেশ বুঝলেন যে, গত চার বৎসর ধরে মুজাহিদবাহিনী কঠোর কৃচ্ছতা ও পরিশ্রম করে যা কিছু করতে সক্ষম হয়েছিলো, সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই গুরুতর অবস্থায় কী করা সমীচীন, সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যে অনুগত সরদারদের এক জলসা ডাকা হয়। কোনও কোনও সরদার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু ফতেহ্ খানের মতো জবরদস্ত সরদার কোনও ভরসা দিতে পারলেন না। সব দিক বিবেচনা করে তিনি সৈয়দ আহমদকে যুক্তি দিলেন শীঘ্রই পঞ্জতর ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে।

ভারাক্রান্ত মনে, ভগ্নহৃদয়ে সৈয়দ আহমদ বাকী মুজাহিদদেরকে একত্রিত করলেন, এবং নয়শো অনুচরসহ দ্বিতীয় হিজরত শুরু করলেন পঞ্জতর ত্যাগ করে পুখলির দিকে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। তখন কঠোর শীত এবং তাঁর যাত্রাপথ ছিল দুর্গম গিরিপথ দিয়ে। আম্বের শাসক পায়েন্দা খান তাঁকে সোজাপথে ছাড়পত্র দেননি। এজন্যে মুজাহিদদেরকে উত্তর দিকে দুরতিক্রম্য পথ বেছে নিতে হয়েছিল। এ পথে তাদেরকে বহু হিমবাহ অতিক্রম করতে হয়েছে এবং আঁকাবাঁকা বন্ধুর গিরিপথে সাচ্চুন্ হয়ে কাড়ান উপত্যকার প্রবেশমুখে বালাকোটে হাজির হতে হয়েছে। বহু ভারবাহী পশু পথে মারা পড়েছে, বহু আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, মৃতপ্রায় মুজাহিদগণ এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে বালাকোটে উপনীত হন। তাঁদের গন্তব্যস্থান ছিল মুজাফ্ফরাবাদ। কিন্তু সৈয়দ আহমদ তখন যেন অন্য ভাবে বিভোর। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন যে, শিখদের সংগে প্রথম সাক্ষাতেই যুদ্ধ করবেন এবং শহীদ হয়ে মুসলমানদের অর্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। পুখলির দিকে গমনপথে তিনি বহুবার অনুগামীদেরকে 'নসিহত' দেওয়ার সময় এ অভিমত সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। হাজারা অঞ্চল তখন সর্বদাই অন্তর্বিদ্রোহে আক্রান্ত থাকতো এবং অস্থিরমতি সরদাররা শিখদের অনুচর হিসেবে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনতো। পুখলি সে সময় ঘন ঘন শিখ বিদ্রোহের শিকার হয়েছিল। এই রকম একটা অভিযানে সৈয়দ আহমদ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হবেন, এ অভিপ্রায় তিনি বহুবার মুজাহিদদের নিকট প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু তাঁর নিয়তিই ছিল বালাকোটের ময়দানে শহীদী সম্মান লাভ করা। জেনারেল শের সিংহ এক বৃহৎ শিখবাহিনী নিয়ে খোরারীর সরদার সজফ খানের প্রদর্শিত গুপ্তপথে বালাকোটে উপস্থিত হলেন ও মুজাহিদ বাহিনীকে ঘেরাও করলেন। সজফ খান অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সরদারদেরই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন, সৈয়দ আহমদের মৃত্যু চাননি কিংবা তার বাহিনীকেও ফাঁদে ফেলতে চাননি। কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি সৈয়দ আহমদকে বাঁচাতে চাইলেন এবং অবস্থার গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মুজাহিদদেরকে একটি গুপ্তপথেরও সন্ধান দিলেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে। শেষ পর্যন্ত কাগান উপত্যকার দিকে পালিয়ে যাওয়ার একটি নিরাপদ পথও খোলা ছিল মুজাহিদদের সামনে। এবং তাঁরা ইচ্ছা করলে পাহাড়ের অপর পাশে দ্রুত পালিয়ে যেয়ে আত্মরক্ষা করতেও পারতেন। কিন্তু কোন মুজাহিদের তখন এ মনোবৃত্তি জাগেনি। তাঁরা সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসেছেন, প্রয়োজন হলে জান কুরবানী দিতে। আর বালাকোটের শহীদী দরগাহে যখন সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তখন কোন্ মুজাহিদ সে সুযোগ অবহেলা করতে পারেন?

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে এই যুদ্ধ শুরু হয়। এটাকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। শিখপক্ষে বিশ হাজার সুসজ্জিত সুশিক্ষিত সৈন্য। আর পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত ও সুলতান মুহম্মদ শাহের বিশ্বাসঘাতকতায় ভগ্নোৎসাহ-প্রায় নয়শো মুজাহিদ। এ ছিল মৃত্যু-অভিসারীদের বহ্নিবন্যায় মুক্তিস্নান। দুর্মদবেগে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'জীবন-মৃত্যু মিশেছে যেথায় মত্ত ফেনিল স্রোতে'। শাহাদত বরণ করলেন সঙ্গীসহ সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল।

আমাদের আজাদী-জেহাদের প্রথম অধ্যায় এখানেই শেষ।

আজাদীর অমর সৈনিক মাওলানা মুহম্মদ আলী একদা বলেছিলেন : মুসলমানের জীবনকাহিনীর বিস্তৃতি মাত্র তিনটি অধ্যায়ে : হিজরত, জেহাদ ও শাহাদত। সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের জীবন এই তিনটি অধ্যায়ের মূর্ত প্রতীক।

বিপ্লবী আহমদউল্লাহ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বণিকের তুলাদণ্ডধারী বিদেশী ইংরেজ জাতি মুসলমানদের তখ্ত্ ও তাজ হস্তগত করে, এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মাত্র সত্তর-আশি বৎসরের মধ্যে সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা নিরঙ্কুশভাবে পাক-ভারতকে নিজেদের সাম্রাজ্যে পরিণত করে।

কিন্তু মুসলমানরা অতি সহজে ইংরেজ শক্তির নিকট নতি স্বীকার করেনি। বাঙলায় মীর কাশিম, অযোধ্যায় শুজাউদ্দৌল্লাহ, মহীশূরে হায়দার আলী ও টিপু সুলতান প্রাণপণে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করলেন এবং পদে পদে তাদের অগ্রগতিতে বাধা দিলেন। টিপু সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন, তবু মান দিলেন না। কেবল মুসলিম শাসকরাই একে একে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হননি, সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানরাও বাণিয়ার জাতি ইংরেজকে প্রীতির চক্ষে দেখেনি। তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলো। ওহাবী আন্দোলন পাক-ভারতীয় ইতিহাসে এক বিপ্লবাত্মক অধ্যায়, এবং এই উপমহাদেশের আজাদীর সংগ্রামে ওহাবীদের প্রাথমিক উদ্যম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতীয় ওহাবীরা জেহাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে, এবং ক্রমাগত ইংরেজ রাজশক্তিকে সশস্ত্র আঘাত হানতে থাকে। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ওহাবীরা আজাদীর যুদ্ধের পরও প্রায় পঁচিশ বৎসর মহারাণীর সাম্রাজ্যে বিপ্লব সজীব রেখেছিলো; এবং একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, বিশ শতকের ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা (Terrorist) তাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মধারার একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলো।

ওহাবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলো সকল শ্রেণীর মুসলমান–চাষী, মুটে, মজুর, দরজী, কশাই, মোল্লা, মওলবী, মায় সরকারী আমলা পর্যন্ত। সরকারী আমলার মধ্যে দফতরী থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মওলবী আহমদউল্লাহ্র জীবনীর উপর আলোকপাত করবো।

আহমদউল্লাহ্র পিতার নাম ছিল মওলবী ইলাহী বখ্শ। পাটনার অন্তর্গত সাদিকপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮০৫ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আহমদউল্লাহ্র জন্ম হয়। পাটনার প্রবীণ বাশিন্দাদের মতে পাটনা শহরের বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটির সদর অফিস যেখানে অবস্থিত, এককালে সেখানে আহমদউল্লাহ্র বাসস্থান ছিল, এবং ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থানটি ওহাবী গুপ্তমন্ত্রণা ও কার্যকলাপের বাঙলা-বিহারের কেন্দ্রস্থল ছিল। আমহমদউল্লাহ্ আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর প্রচুর দখল ছিল। তাঁর পিতা ইলাহী বখ্শ একজন মশহুর আলেম ও সুবক্তা ছিলেন। মশহুর ওহাবীনেতা হযরত সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীর তিনি একজন পাক্কা মুরীদ ছিলেন, এবং নিজের তিন পুত্র

ইয়াহ্য়া আলী ফয়েজ আলী ও আহমদউল্লাহ্কে তাঁর মুরীদ করেন। আহমদউল্লাহ্ প্রথম যৌবনেই ইংরাজ সরকারের শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখের ৩০১ নং হুকুমনামা অনুযায়ী তিনি পাটনায় জনশিক্ষা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

হযরত সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে পাক-ভারতে যে বিরাট মুজাহিদ বাহিনী গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সে আমলের বহু মুসলমান জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন—এমনকি ইংরেজ সরকারের চাকুরির কিংবা খাস কন্ট্রাক্টরগণও গোপনে গোপনে এই মুক্তি-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল ক্রমবর্ধমান শিখ ও ইংরাজ রাজশক্তিকে নির্মূল করে পাক-ভারতে পুনরায় মুসলিম হুকুমাত কায়েম করা। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে যে বিরাট মুজাহিদ বাহিনী শিখদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করে তার মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। এই বিরাট বাহিনীর জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল পাক-ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই—বিশেষতঃ বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে। এই সংগ্রহকার্য চলতো একটা সুনিয়ন্ত্রিত গোপন প্রতিষ্ঠানের মারফত এবং তার কার্যকলাপ এতোই সাবধানে এবং সংগোপনে চলতো যে, ইংরেজ সরকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ১৮৫২ সালের পূর্বে তার সন্ধান পায়নি। এই গোপন প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ও তার সঙ্গে মওলবী আহমদউল্লাহ্র যোগাযোগ কতোখানি ছিল, তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন বাঙলা-সরকারের নিকট মিস্টার র‍্যাভেন্‌স (Revenshaw) ৯-৫-৬৫ তারিখে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তার ১৬২ পৃষ্ঠার নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে :

"১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের কর্তৃপক্ষ একটা ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি হস্তগত করে। হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধরা (মুজাহিদ বাহিনী) শৈল শিখর থেকে ভারতীয় চতুর্থ রেজিমেন্টের (Regiment of Native infantry) সঙ্গে যে একটা গোলযোগ পাকাতে চেষ্টা করেছিলো, তার প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, এই ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হয় পাটনায়, এবং যে চিঠি ধরা পড়ে তাতে জানা যায় যে, সাদিকপুর পরিবারের বহু মওলবী এবং অস্ত্রসজ্জিত বহু কাফেলা তখন সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়েছে। পেশোয়ারের একখানা স্বাক্ষরহীন চিঠিতে জানা যায় যে, মওলবী বিলায়েত আলী, ইনায়েত আলী, ফয়েজ আলী ও ইয়াহ্য়া আলী (আহমদউল্লাহ্র দুই ভাই) এবং দিনাজপুরের জনৈক দরজী মওলবী করম আলী সুরাটের অন্তর্গত সিত্তানায় তাঁবু ফেলেছিলেন, এবং বাদশাহ্ সৈয়দ আকবরের সহযোগিতায় গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি হচ্ছিলেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে, সৈয়দ আকবর সোয়াতের একজন সরকার মনোনীত রাজা ছিলেন। চিঠিতে এইরকম বর্ণনা ছিল : মওলবী বিলায়েত আলীর ভাই মওলবী ফরহাত আলী আযিমাবাদে, মওলবী ফয়েজ আলীর ভাই আহমদউল্লাহ্ ও মওলবী ইয়াহ্য়া আলী আপন আপন বাটিতে বসে নিজ নিজ মহল্লায় অর্থসংগ্রহ করেছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠাচ্ছিলেন। অন্যান্য চিঠি থেকে জানা যায় যে, সৈন্য ও রসদ পাটনা থেকে মীরাট ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্য দিয়ে পাঠানো হতো। এই দু'জায়গায় আলাহিদা এজেন্ট নিযুক্ত থাকত এবং তারা সীমান্তের জেহাদের জন্য রসদ সরবরাহের সব বন্দোবস্ত করতো।

"পাঞ্জাব সরকারের অনুরোধক্রমে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন আলী খাঁয়ের খানাতল্লাশী করে। সে ছিল আহমদউল্লাহ্‌র খানসামা এবং চিঠিপত্র তার নামেই চলাচল হতো। আসলে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খানাতল্লাশীর দু'দিন আগেই পাঞ্জাব থেকে ফেরতা একজন হাকিমের (native doctor) মারফত এ খবরটা জানাজানি হয়ে যায়, তার ফলে পাটনার ষড়যন্ত্রকারীরা সাবধান হয়ে যায় ও তাদের বাড়ীর যাবতীয় চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলে। যা হোক ১৮৫২ সালের ১০ই আগস্ট তারিখের রিপোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণমেন্টকে জানান যে, ওহাবীদের তখন বেশ সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল, এবং মওলবী বেলায়েত আলী, আহমদউল্লাহ্ ও তাঁর ইলাহী বখ্‌শের বাড়িতে জেহাদের জন্য সর্বপ্রকার গুপ্ত মন্ত্রণা হতো, ও সেখান থেকে প্রচারকার্য চলতো। তিনি আরও জানান যে, ওহাবীদের স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তার দরুণ তাঁদের কার্যকলাপের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তাঁর নিকট যায় নি। মওলবী আহমদউল্লাহ্‌র বাড়ীতে ছয়-সাতশো সশস্ত্র লোক ম্যাজিস্ট্রেটের খানাতল্লাশীর বিরোধিতা করতে ও বিদ্রোহের নিশানা তুলতে প্রস্তুত ছিল।

"১৮৫২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল বৈঠকে একটা বিষয় (minute) লিপিবদ্ধ করা হয়—সেটা করা হয় পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের লেখা অনুযায়ী এসব চিঠিপত্রের সম্পর্কে, এবং সীমান্তের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তাও তাতে স্বীকৃত হয়, কারণ তারা বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ওহাবীদের দ্বারা ক্রমাগত উত্তেজিত হচ্ছিলো। চতুর্থ দেশীয় রেজিমেন্টের মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ালীকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয় এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে ১৮৫৩ সালের ১২ই মে তারিখে তার বিচার ও শাস্তি হয়। তখনও মওলবী আহমদউল্লাহ্ এবং পাটনার অন্যান্য অধিবাসীদের নাম পুনরায় সাক্ষ্যপ্রমাণে ওঠে, এবং তাঁদের দ্বারা সীমান্তে রসদ পাঠানো বিষয়ও আলোচিত হয়।

"অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, গভর্নমেন্ট কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন নি, এবং পাটনার ষড়যন্ত্রও নষ্ট করে দেননি। রাজদ্রোহিতার দমন নিশ্চয়ই হতো, আম্বালা-অভিযানে কোন সৈন্যক্ষয় হতো না এবং সরকারী কর্মচারীরা বহু পরিশ্রম ও অহেতুক লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পেতেন, কারণ ১৮৫২ সালের সশস্ত্র রাজদ্রোহী আহমদউল্লাহ্‌ই হচ্ছেন এক 'সামান্য কেতাবওয়ালা ও ১৮৫৭ সালের 'ওহাবী ভদ্রলোক।'

মওলবী আহমদউল্লাহ্ যোগ্যতার সঙ্গে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত পাটনার জনশিক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে কার্য করেন। তারপর সারা পাক-ভারতে আযাদীর আগুন জ্বলে উঠলে পাটনা শহরে বহু মুসলমানকে তদানীন্তন কমিশনার মিস্টার টেইলার ওহাবী সন্দেহে বন্দী করেন। আহমদউল্লাহ্ সাহেবও 'ওহাবী ভদ্রলোক' হিসেবে টেইলার সাহেবের কোপানলে পতিত হন। টেইলারের সন্দেহ হয় যে, তথাকথিত 'সিপাহী বিদ্রোহের; সঙ্গে পাটনার এসব মুসলমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি বন্দীকৃত সমস্ত মুসলমানকে একটা বাঙলোতে নিজের তদারকে আটক রাখেন এবং তারপর পৈশাচিকভাবে দৈনিকহারে কয়েকজনকে প্রকাশ্য ফাঁসি ঝুলিয়ে দেন বাঙলোর সামনের ময়দানে। এই ময়দানটা পাটনা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ও বর্তমানে বাঁকীপুর ময়দান নামে খ্যাত। কিন্তু ওপরওয়ালাদের কানে এ সংবাদ পৌছামাত্র অবিলম্বে অবশিষ্ট

বন্দীদের খালাস দিতে আদেশ দেওয়া হয় ও তার কৈফিয়ত তলব করা হয়। এভাবে সেবার টেইলার সাহেবের হাত থেকে আহমদউল্লাহ্র জীবন রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে অবশ্য এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য টেইলারকে কমিশনারের পদ থেকে অপসারণ করে নিম্নপদে রাখা হয়। তিনি পদত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

আযাদীর বিপ্লব প্রশমিত হলে ইংরাজরা মুসলিমদের উপর সদয় ব্যবহার করে তাদের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করে। এই সময় আহমদউল্লাহ্ ইংরাজ সরকারের কৃপাদৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করেন ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োজিত হন (১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫৭৭ এ নোটিফিকেশন)। কিন্তু তখনও পাটনার প্রধান কেন্দ্রস্থল থেকে মুল্‌কা ও সিত্তানায় রীতিমতো মুজাহিদ ও রসদ সরবরাহ্ চলতো। বলা বাহুল্য, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও আহমদউল্লাহ্ এই ব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা করতেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে বাঙলা-বিহার থেকে মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলতো। তখনও তাঁর বাড়ী ছিল এ ব্যাপারে প্রধান ঘাঁটি। সেখানে প্রতি জুম্মাদিনের মগরেবের নামাযের পর মিলাদের মাহফিল বসতো এবং তার অছিলায় ওহাবীরা জমায়েত হয়ে সফা করতো ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করতো। ওহাবীদের কার্যপদ্ধতি ছিল আশ্চর্য ধরনের। তারা চিঠিপত্রে এক বিশেষ সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতো যার প্রকৃত অর্থ ওহাবী ভিন্ন অন্য কারও বোধগম্য ছিল না। প্রত্যেক সভ্যের একটা বিনামা পরিচয় ছিল। তারা যুদ্ধকে বলতো 'মুকাদ্দমা', মোহরকে বলতো 'লাল-মোতি'। টাকাকড়ি প্রেরণ করা হতো কেতাবের দাম হিসেবে। পরবর্তীকালে খাতাপত্র থেকে জানা যায়, আহমদউল্লাহ্ এক বৎসরেই ছাব্বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন, তাছাড়া কাসেদের মারফত নগদ মোহর কতো পাঠানো হয়েছিল, তার হিসেব পাওয়া যায় না।

সমগ্র বাঙলা ও বিহার প্রদেশে আহমদউল্লাহ্র কর্মঠ ও বিশ্বস্ত গুপ্ত এজেন্ট ছিল। পূর্ব-বাংলার এজেন্ট ছিলেন হাজী বদরউদ্দীন নামক ঢাকার একজন মশহুর চামড়া ব্যবসায়ী। তিনি পূর্বাঞ্চলের সমস্ত অর্থসংগ্রহ্ করে পাটনায় প্রেরণ করতেন ফাগুলাল নামধারী জনৈক ব্যবসায়ীর নাম বরাবর হুন্ডি দিয়ে। কলকাতার মুড়িগঞ্জ মহল্লায় আবদুল জাব্বার নামক একজন এজেন্ট ছিলেন এবং মুকসেদ আলী নামক অন্য একজন এজেন্ট হাইকোর্টে মুখ্‌তারী করতেন। মুখ্‌তার সাহেবের পাটনাতেও একখানা বাড়ী ছিল। যশোর, ২৪ পরগনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ্, রংপুর, মুঙ্গের, ত্রিহুতি, আরাহ্, বকসার বোরস, ইলাহাবাদ, খানপুর, মীরাট প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে আহমদউল্লাহ্র এজেন্ট ছিলেন। একদল অভিজ্ঞ কাসেদ মারফত আহমদউল্লাহ্ ও এজেন্টদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি চলাচল হতো। তাদের মারফতেই সিত্তানায় খবরাখবর আদান হতো।

সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্র থেকে এ তথ্যও সংগ্রহ্ করা যায় যে, আহমদউল্লাহ্ বাঙলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে জেহাদের জন্য যাকাত তোলার বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং এজন্য এক সুপরিকল্পিত পন্থা উদ্ভাবন করে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ্ করেন। একদল সুশিক্ষিত আলেম ও বক্তা নিয়োজিত থাকতেন মুসলমানদিগকে মিলাদ ও ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করতে। মওলবী

আহমদউল্লাহ্ই ছিলেন ১৮৬০ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্ণধার, এবং নিজের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী উচ্চপদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তিনি নিরঙ্কুশভাবে এই আন্দোলন চালাতেন।

পাক-ভারতব্যাপী আজাদীর বিপ্লবে ওহাবী মুজাহিদরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার জন্য এ বিপ্লব ফলপ্রসূ না হলেও মুজাহিদরা দমিত বা ভগ্নোৎসাহ হননি। বরং দ্বিগুণ উদ্যমে তাঁরা নতুন মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সমগ্র বাঙলা প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মুসলমান চাষী মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করতে আহমদউল্লাহ্র বাসগৃহ সাদিকপুরে জমায়েত হতো ও সেখান থেকে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে সিত্তানায় প্রেরিত হতো। এই রকম একটি দলের চারজন বাঙালী মুসলমান আম্বালায় যাওয়ায় পথে ১৮৬৩ সালে কর্ণাল জিলার পাঞ্জাবী-সার্জেন্ট গুজান খাঁর হাতে ধরা পড়ে ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাদের হাজির করা হয়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরকে নিরীহ পথচারী বিবেচনা করে খালাস দেন। দুইমাস পরেই সীমান্তে একটা যুদ্ধ বাধে। তখন ধৃত বাঙালী মুসলমানদের নিকট থেকে গৃহীত তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইতিমধ্যে গুজান খাঁ আপন একমাত্র পুত্রকে সিত্তানায় গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে যে, থানেশ্বরবাসী জাফর খাঁ সীমান্তে মুজাহিদ ও রসদ প্রেরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন। কর্তৃপক্ষ এ সংবাদ পেয়েই জাফর খাঁর বাড়ী তল্লাশী করে ও বহু সন্দেহজনক কাগজপত্র হস্তগত করে। জাফর খাঁ পলাতক হন, কিন্তু আলিগড়ে পাটনাবাসী বহু ওহাবীর সঙ্গে ধরা পড়েন। তারা জবানবন্দীতে প্রকাশ করে যে, তারা সাদিকপুরের ইলাহী বখ্শের গুপ্তচর। তখনই পাটনায় টেলিগ্রাম পাঠানো হয় ইলাহী বখ্শকে বন্দী করতে ও তার খানাতল্লাশী করতে। জাফর খাঁর বাড়ী থেকে যেসব কাগজপত্র কর্তৃপক্ষ হস্তগত করে, তার একটি চিঠিতে মোহাম্মদ শফীকে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল যে, জনৈক কাসেদ মারফত তিনশো ছোটো ও বড়ো দানার একটি তসবীহ এবং ছয়শো সফেদ দানার আর একটি তসবীহ পাটনা থেকে পাঠানো হয়েছে। কিছুদিন পর থানেশ্বরবাসী হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে আম্বালাগামী একটি এক্কাগাড়ী থেকে বন্দী করা হয় এবং তার পিরহানের ভিতর দুটি থলে থেকে পূর্বোক্ত তসবী সংখ্যার সোনার মোহর পাওয়া যায়। এসব তথ্য থেকে কর্তৃপক্ষ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের সন্ধান পায় ও পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রাভেন্শ (T. E. Rovensaw) সাহেবকে এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্তের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করে।

বলা বাহুল্য যে, তদন্ত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদউল্লাহ্ বন্দী হন ও চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspended) হন। র‍্যাভেন্শ সাহেবের তদন্ত অনুযায়ী তাঁর বিচার ও দণ্ড হয়, যদিও সাহেবের রিপোর্ট দাখিল হয় বিচারের পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে। র‍্যাভেন্শ আম্বালা-বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে তদন্তের সূত্র গ্রহণ করেন। এই আম্বালা-বিচার শেষ হয় ১৮৬৩ সালে এবং বিচারের ফলে মোহাম্মদ শফী, ইয়াহ্য়া আলী ও তার ভাই আবদুল রহিম ও ভাইপো ব্যাংকার ইলাহী বখ্শ, পোদ্দার আবদুল গফুর ও আরও পাঁচজনের যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ডাদেশ হয়। ইলাহী বখ্শকে পাটনায় আনয়ন করা হয় এবং তাঁর দীর্ঘ জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আহমদউল্লাহ্ ছিলেন পাটনা কেন্দ্রে ওহাবী আন্দোলনের প্রাণশক্তি।

চার মাস তদন্তের পর র‍্যাভেন্‌স সাহেব আহ্‌মদউল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে প্রাথমিক রিপোর্ট দান করেন ও সাক্ষ্যপ্রমাণের সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করেন। মিস্টার মনোরা নামক জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আহ্‌মদউল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতি আট দফার চার্জ গঠন করেন ও দায়রায় সোপর্দ করেন। মিঃ আইনসাইল (Ainsile) নামক দায়রা জজের এজলাসে সুদীর্ঘ কাল আহ্‌মদউল্লাহ্‌র বিচার হয়। মিঃ ম্যাকেঞ্জী (W. Mkensie) আহ্‌মদউল্লাহ্‌কে চরম দণ্ড ফাঁসির আদেশ দেন। এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপীল দায়ের হয়। মাননীয় বিচারপতি ট্রিভর ও লক (Trevar and G. Lok jj) ১৮৬৫ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে রায় প্রদান করেন এবং ফাঁসির হুকুম পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনাকালে রায়ে এই মত প্রকাশ করেছিলেন :

> "আমাদের বিশ্বাস, পাটনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার যে একটা প্রবল ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের জন্য সাধারণ্যে সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ প্রচার করা হতো, এবং সীমান্তে অজস্র ধারায় মানুষ ও টাকাকড়ি প্রেরণ করা হতো। আমাদের সম্মুখে আরও সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে, এভাবে যেসব লোক প্রেরিত হয়েছিলো তারা সিত্তানায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করেছিলো। থানেশ্বরের মোহাম্মদ জাফর ও আম্বালার মোহাম্মদ শফীর মারফত এসব বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে মোহর ও হুণ্ডী পাঠানো হতো। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, এই আসামী আহ্‌মদউল্লাহ্‌ হামেশাই পাটনার আবদুর রহিমের বাড়ীতে হাজির থাকতো, অথচ সেখান থেকে ক্রমাগত জেহাদ ঘোষণা করা হতো। আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, এই ষড়যন্ত্রের ও তা প্রসারের সবরকম প্রচেষ্টায় আসামির সম্মতি ও জ্ঞান ছিল, এবং যদিও এরূপ সত্য প্রমাণ নেই যে, আসামী কোনও বিশেষ কাজের দ্বারা ষড়যন্ত্রের সহায়তা করেছে, তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে, ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে, এবং তার সঙ্গে আসামীর সংযোগও প্রমাণিত হয়েছে। অতএব তার সহকর্মীরা একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যেসব অপরাধমূলক কাজ করেছে, সে-সব প্রমাণিত হওয়ার দরুণ তার বিরুদ্ধে এসব কাজ তারই দ্বারা সংঘটিত হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের বিশ্বাস যে, আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২১ ধারার দ্বিতীয় অংশ মোতাবেক অভিযোগ যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এরূপ দেখি না যে, আসামীর সহকর্মীরা ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার দরুণ যেরূপ উচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে আসামী তার চেয়েও বেশী কিছু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলো। এজন্য আমরা তার বিরুদ্ধে দায়রা জজের প্রাণদণ্ডের আদেম অনুমোদন না করে এই আদেশ দিলাম যে, তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোক ও তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াফত হোক।"

আহমদউল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিচারের এভাবে যবনিকাপাত হয়। প্রায় দু'শো বছরব্যাপী পাক-ভারতীয় ব্রিটিশ শাসনে আর কোনও ম্যাজিস্ট্রেট রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী ইতিহাসে মেলে না।

সেসন আদালতে আহমদউল্লাহ্‌র ফাঁসির হুকুম ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফতের নির্দেশ দেওয়া হয় ১৮৬৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট ১৩ই এপ্রিল ১৮৬৫ সালের হুকুমবলে ফাঁসির হুকুম রহিত করেন ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। তিনি ১৮৬৫ সালের জুন মাসেই আন্দামানে নীত হন এবং পনের বছরের অধিককালে বন্দী জীবন সহ্য করে ২২শে নভেম্বর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ইয়াহ্‌য়া আলি পূর্বেই আন্দামানে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল, ভ্রাতার পাশেই সমাহিত হওয়া কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর এহেন নির্দোষ ইচ্ছাও পূরণ করেননি।

সাদিকপুর পরিবারের পারিবারিক বাসগৃহটি ছিল মহল্লার বিশিষ্ট স্থানে এবং পাটনায় মশহুর বাসগৃহ হিসেবে কীর্তিত হতো। বাসগৃহটি ভূমিসাৎ করে সেখানে পাটনা মুন্সিপাল বাজার নির্মিত হয়। এই পরিবারেরই অন্যান্য ভূসম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থবলে। কথিত আছে যে, ভূসম্পত্তি নিলাম দ্বারা ১২১৯৪৮ টাকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে একা আহমদউল্লাহ্‌রই অংশ ছিল ৪২১১১ টাকা। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস ছিল যে, যেদিন আহমদউল্লাহ্‌র পরিবারকে বাসগৃহ থেকে একবস্ত্রে উৎখাত করা হয়, সেদিন ছিল পবিত্র ও আনন্দময় ঈদের দিন। আহমদউল্লাহ্ এজন্যে এ শোকগাথা রচনা করেছিলেন ঃ

চুঁ শব-ই-ঈদ রা সেহর করদান্দ্
হামা রা আয মাকান বদার করদান্দ;
মায়া-ই-আয়েশ সাষে-মাতম্ শুদ।
ঈদ-ই-মা শুররা-ই-মুহররম্ শুদ।

'ঈদের আনন্দময় দিন প্রভাত হলো, আমরা সকলেই গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেম। আনন্দের সব উচ্ছ্বাস শোকের রূপ নিল—আমাদের ঈদ মুহররমে পরিণত হয়ে গেল।"

তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র আব্দুল হামিদের শোকোচ্ছ্বাস ছিল :

আহমদউল্লাহ্ বুদ্ মুজরিম-ই-শাহ
তিফলাক্-ই-বেগুনাহরা চে গুনাহ।

'আহমদউল্লাহ্ সরকারের চোখে অপরাধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মাসুম সন্তানরা কী অপরাধ করেছিল?"

এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, সাদিকপুর পরিবারের সুবৃহৎ পারিবারিক কবরগাহটি সরকারী হুকুমে চাষ দিয়ে উৎখাত করা হয় ও হিন্দুদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়।

—০—

www.icsbook.info